পরবাসী

অধীর ঘটক

অভিযাত্রী
১১৬/৪জি, মেঘনাদ সাহা সরণী
কলকাতা—৭০০০২৯

পরিবেশক ঃ
প্রকাশক
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

পরবাসী—অধীর ঘটক

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৬৯
১১৬/৪জি, মেঘনাদ সাহা সরণী, কলকাতা-২৯ থেকে অভিযাত্রীর পক্ষে অরণ্য ঘটক প্রকাশ করেছেন এবং নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস ১৬ মার্কাস লেন থেকে মধুমঙ্গল পাঁজা ছেপেছেন।
প্রচ্ছদ শিল্পী—তুষার সান্যাল।

পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী
পরবাসী

মানিককে—

এই উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সব নামই কাল্পনিক। চরিত্রগুলিও।

—লেখক

লেখকের অন্যান্য বই

ক্যাম্পিং হলিডে
লণ্ডন কলিং
ধূসর স্মৃতির দেশে

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হলেও শীতটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশা, না ধোঁয়াশা তা বলা শক্ত। উত্তর বিহারের এক ব্যস্ত রেল স্টেশন বারাউনী। ব্রডগেজ আর মিটার গেজের কোলাকুলি। বারাউনীর এগার নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা-মান মিস্টার অশোক মিত্র। তিন হাজার বাইশ নম্বর ডাউন মিথিলা একসপ্রেস এলো বলে। সময়টা বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার প্রস্তুতি। স্টেশন চত্বরে লোকজন খুবই কম। কিছুদিন হলো ট্রেন চলছে, তবে খুবই অনিয়মিতভাবে। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বেরোতে চাইছে না। অথবা শীতের ভয়ে সবাই ঘরমুখী।

নভেম্বরের পাঁচটা দিন কেটে গেছে। আগামীকাল ছ'তারিখ। শনিবার। দিন তারিখের হিসেবটাই বারে বারে অশোকের মনকে নাড়া দিচ্ছে। ওর কাছে আজকের দিনটাই সবথেকে বেশী বেদনার। অথবা আনন্দের। ও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবে দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজই ওর বিদায়ের দিন। বিকেলেই বিদায়ের পালা। রামনগর কারখানা থেকে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে যাবে কোলকাতায়। ওখানে যে কি বিশেষত্ব আছে তা সঠিক জানে না। কিন্তু সেই মহানগরী ওকে আকর্ষণ করে। তাকে আঁকড়ে থাকতেই ভালোবাসে। ওখানে ফিরলেই ওর জীবন হবে সমুদ্রের কলকল্লোলের মতো মুখরিত। কি যেন বিস্ময় ওকে হাতছানি দিয়ে আবাহন করে।

পান্থনিবাসের ক্লান্তিকর দিনগুলো কাটিয়ে আজ অশোক এক মুক্ত বিহঙ্গ। স্বাধীনতার স্বাদ কি, তা জানতে হবে। তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করতে হবে মুক্ত জীবনের মাধুর্য। জীবনকে আরো গভীরভাবে অনুভবে করতে হবে। চাই আনন্দ, চাই উত্তেজনা। আর চাই প্রাণ উজাড় করা উল্লাস।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর সেন, ওরফে দেবুদা, ব্রজবাসী দাস, সংক্ষেপে ব্রজদা এবং আরো একজন। নাম তার অরিন্দম সোম। পান্থনিবাসের সিকি ডজন প্রবাসী বাঙালী আজ সমবেত হয়েছে বারাউনী স্টেশনে। অশোককে বিদায় জানাতে ওদের এই আগমন। অরিন্দম সোমের অ্যাম্বেসেডারে চেপেই পাঁচ কিলোমিটার পথ কতিক্রম করে এসেছে অশোক। রামনগর থেকে বিদায় বেলায় মিস্টার সোম ওকে সঙ্গ দিয়েছেন। এই ক্রাইসিসের যুগেও তেল পুড়িয়ে লিফট দিয়েছেন। আন্তরিকভাবে এক প্রবাসী সহকর্মীর বিদায় মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। একখানা ফাইভ-সীটার গাড়ী যখন স্টেশনে যাচ্ছেই সেই সুবাদে ব্রজদাও সঙ্গ নিয়েছে। দেবুদা একা একা কিই-বা করবে পান্থনিবাসে বসে। তাই সেও মিস্টার সোমের দলে যোগ দিয়েছে।

আজই প্রথম এবং শেষদিন এই স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এতোজন সুহৃদের সমাগম হয়েছে। আজ অশোকের বড়ই আনন্দের দিন। অথবা বিষাদের। বিদায় বেলায় বেহাগের সুরকে করুণতর করতে হয়তো ওরা এসেছে। রামনগর থেকে বিদায়ের দিনে ওদের সঙ্গ এবং সাহচর্য অশোককে একাকীত্বের জ্বালা কিছুটা ভুলিয়ে দেয়। স্মরণীয় এই সন্ধ্যায় বরণীয় তিন সহকর্মীর সান্নিধ্য ওকে আনন্দ দেয়। অথবা মনকে আরো বেদনাতুর করে তোলে। তা বলা মুস্কিল। তবুও যেতে হয়। পরিচিত পরিবেশ থেকে অপর এক জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে যেতে হয়ই। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মানুষকে মানিয়ে নিতেই হবে। চলাই জীবনের ধর্ম। আর থেমে থাকাই ছন্দপতন। আসা যাওয়ার অনন্ত প্রবাহে সবাই সামনে এগিয়ে চলছে। আসা-যাওয়ার এই তো খেলা।

হয়তো এটাই জীবনের লীলা। বিদায় বেলায় মানুষ কি দার্শনিক হয়ে যায়? ঈশ্বর জানেন।

অশোকের মন অস্বাভাবিকভাবে ভারী হয়ে উঠেছে। আজ এই মুহূর্তে সবই অদ্ভুত লাগছে। অথচ এই চলে যাওয়ার জন্য কতো কথার বেসাতি। কতো কোলাহল। কলহ এবং হলাহল বিনিময়। বিদায় অবশেষে সংকেত ঘোষণা করেছে। অশোক চলেছে নতুন এক জায়গায়। রামনগরের মায়া তেমন নেই। কারখানা জীবনের মোহ গেছে কেটে। শুধু আছে অভিজ্ঞতার নানা অধ্যায়। জীবনের সঞ্চয়। পথের পাথেয় সেই অভিজ্ঞতার মনি মুক্তোগুলো। মূল্যবান মনিমুক্তোগুলো ওর একমাত্র সম্বল। লুকানো আছে অন্তরের অন্তস্থলে। চিরদিন হয়তো তা অম্লান থাকবে। ভবিষ্যতের পথে এই সম্বলই ওকে সাহায্য করবে। জীবনের লেনদেনে যোগান দেবে অভিজ্ঞতার নানা ঘটনা। ও মনের অন্যমনস্কতায় আজ বিভোর।

হঠাৎ খেয়াল হলো দাঁড়িয়ে আছে বিহারের এক রেল স্টেশনে। ট্রেন আসবে, সংরক্ষিত আসনে উঠবে এবং বারো ঘণ্টার ব্যবধান পৌঁছে যাবে স্বদেশে। প্ল্যাটফর্মে ব্রজদা তার আপন ভঙ্গিতে গল্প করে চলেছে মিস্টার সোমের সঙ্গে। দেবুদা সেখানে নিরলস শ্রোতা। অশোক সবার মাঝে থেকেও কেমন যেন নিঃসঙ্গ। বিরাট জনতার মাঝে একান্তই আলাদা।

লাউড স্পীকারে ঘোষিত হলো—মিথিলা একস্প্রেস আরো দুঘণ্টা দেরীতে চলবে। ট্রেন নির্দিষ্ট সময়েই চলছিল। কিন্তু মজঃফরপুরের কাছে মণ্ডল কমিশনের বিরোধিতায় 'রেলরোকো' আন্দোলন চলছে। তাই সূর্যাস্তের আগে সেখান থেকে ট্রেন ছাড়া নিরাপদ নয়। সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে। রেল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, অন্ধকার হলে সব বিদ্রোহীরাই ঘরে ফিরে যাবে। দিবালোকেই যত আন্দোলন। যত আস্ফালন। এই আন্দোলনের প্রচার রাতের অন্ধকারে দেখবে কে? সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তাই আন্দোলনকারীরা ঘরে ফিরবে। জড়িয়ে পড়বে ঘুমের জালে। সত্যিই, এই মণ্ডল কমিশনকে কেন্দ্র করে

প্রধান মন্ত্রী ভি-পিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে এখানকার যুব সমাজ। শুধু যুবসমাজই বা কেন? বিহারের স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত এই প্রতিবাদের শরিক হয়েছে। ওদের বক্তব্য অতি সহজ। সাধীনতালাভের চল্লিশ বছর পরও এ কী বন্দোবস্ত! একটা সাধারণ চাকরীর প্রতিযোগিতায় যেখানে হাজারো লোকের ভীড় সেখানে আবার সংরক্ষণের বন্দোবস্ত।

স্থানীয় যুবকের দল একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যত তাদের অন্ধকার। পড়াশুনা করেই বা কি হবে? সব চাকরী ভাগাভাগি হবে ব্যাকওয়ার্ড আর ফরোয়ার্ড সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভোটের দেবতা অলক্ষ্যে বসে হাসেন। পুরো ব্যাপারটাই রাজাসাহেবের সাজানো। দুর্বল সরকারকে টিকে থাকতে হলে এ ধরণের ভেল্কি দেখাতেই হয়। কিন্তু ছকে কোথায় যেন ভুল থেকে গেছে। রাজনীতির দাবা খেলায় ভুল চাল দিলেই কিস্তি মাত। মণ্ডল কমিশনের নামে তাই সারাদেশে কমোশন। কতো যুবক যে আগুনে আত্মাহুতি দিল তার হিসেব নেই। রেল সম্পতির যে কি পরিমাণ ক্ষতি হলো সে বিষয়ে রাজাসাহেবের চিন্তা নেই। গদি বাঁচাতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর মসনদে থাকতেই হবে। শুধুই ক্ষমতার মোহ। শাসনের নামে দুঃশাসন। দেশবাসীর উপকার অপেক্ষা নিজের অহংকারই বড়। এর পরিণতি কোথায়? রাজাসাহেব কি চলেছেন অনিদ্দিষ্টের পানে। জনসাধারণের দুর্ভোগ, দুর্গতি এবং চরম দুর্দশার খবর কি তাঁর কানে পেঁছোবে না? মজঃফরপুর চিরদিনই বিপ্লবী। বিপ্লবের বীজ একদিন অঙ্কুরিত করেছিল মেদিনীপুরের সেই ডানপিটে গোঁয়ার ছেলেটি। স্বদেশীর নামে একটি স্কুলের বালককে যদি শাসক হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করানো যুক্তিযুক্ত হয় তবে এদের আন্দোলনেই বা দোষ কি? স্থানীয় নেতাদের যুক্তি খণ্ডন করা মুস্কিল। সেদিনের ক্ষুদিরাম আজকের শহীদ। আজকের আন্দোলনকারীরা ভবিষ্যতের শাসক হবে এটাও স্বতঃসিদ্ধ। ক্ষুদিরামের যুগ ছিল বিপ্লবের যুগ। সে বিপ্লব ইংরেজ বিতাড়নের জন্য। আর আজকের আন্দোলন শুধুই আত্মরক্ষার।

পরাধীনতার শৃংখল মোচন আর স্বাধীন ভারতবর্ষে মন্ডল কমিশনের তান্ডব লীলা কি সমপর্যায়ের ? জনসাধারণের এই যে বিপত্তি তা কিসের জন্য ? কমিশন কি গোষ্টীবিশেষের প্রগতির উদ্দেশ্যে ? অথবা রাজনীতিকরা দাদাদের ফয়দা লোটার ফর্মুলা। শুধু মজঃফরপুর নয়। অশান্ত হয়ে উঠেছে সমগ্র হিন্দী বলয়। তবে কি সেখানেই জাতপাতের একাধিপত্য ? শুধু তাই নয়। সারা দেশ আজ উত্তাল। যুবশক্তি ক্ষেপে গেছে। আসন সংরক্ষণ বনাম আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই এখন তুঙ্গে !

বারাউনী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বপ্ন নগরী। উত্তর বিহারের এক রুক্ষ গ্রামের বুকে আধুনিক শিল্প নগরী। শিল্প-সভ্যতার পথ ধরে এসেছে অনেক অভিশাপ। সন্ধ্যার পর জায়গাটা অন্য রূপ ধারণ করে। মিস্টার সোমের গাড়ীটি পার্ক করা আছে স্টেশনের বাইরে। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। অথচ কখন ট্রেন আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। শীতকালের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মিস্টার সোম একটু বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। বলা তো যায় না কখন কি হয় ? আচ্ছা চলি অশোকবাবু, গুড বাই বলে তিনি বিদায় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রজদাও অনুসরণ করলো তাঁকে। কখন ট্রেন আসবে তা বোঝা যাচ্ছে না। আর ট্রেন এলে অশোক চলে যাবে। তাই ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষা করার কোন মানে হয় না। মহাজ্ঞাণী, মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেবুদাও প্রস্থান করলো।

তিন বঙ্গসন্তান আতংকে অথবা আরামের কথা ভেবে বিদায় নিয়েছে স্টেশন থেকে। চলে গেছে প্ল্যাটফর্মের বাইরে। হয়তো ফিরেই গেছে জিরো মাইল। আজ শনিবার। কি যেন একটা ডিসুম্ ডিসুম্ হিন্দী ছবি আছে টিভিতে। ওটা মিস্ করা যাবে না। পান্থনিবাসের নিঃসঙ্গ জীবনে ওই মার-কাটারী ছবিই তো অন্যতম আকর্ষণ। সোম সাহেবের গাড়ীর গতি হয়তো অনেকটা বেড়ে গেছে। কতটুকুই আর রাস্তা। বড়জোড় পাঁচ কিলোমিটার। লেভেল ক্রসিং বন্ধ না থাকলে পনের মিনিটের ড্রাইভিং। অথচ এই পাঁচ কিলোমিটার পথই একদিন মনে

হয়েছিল জীবনের দীর্ঘতম সফর। অশোক জীবনে প্রথম বারাউনী রেল ষ্টেশনে পৌঁছেছে। ষ্টেশনে নেমে সে খুব অসহায় বোধ করেছিল। একদা লণ্ডনবাসী অশোক হঠাৎ কেন যে সার্বজনিক সার কোম্পানীতে চাকরী নিলো তা কেউ জানে না। চাকরী যে লোভনীয় নয় সে কথাও সে জানে। মাস মাইনে যৎ সামান্য। কাজ আরো নগন্য। সেই নগন্য কাজ যে কতো জঘন্য হতে পারে তা সে পরবর্তী জীবনে অনুভব করেছিল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। কনিষ্ঠতম জনসংযোগ অফিসারের চাকরী নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে মোহ ছিল। ওর মধ্যে ছিল সমাজকে সেবা করার অদম্য আগ্রহ। শুধু অর্থের পরিমাপে কাজের মর্যাদাকে হেয় করতে পারে নি। অশোকের জীবন-ছকের এই যে নাটকীয় পরিবর্তন তার অন্তরালে ভাগ্যের কোনো ভূমিকা ছিল কি? ঈশ্বর জানেন।

মিথিলা এক্সপ্রেস আসতে এখনো অনেক দেরী। আজ রাতে সে ট্রেন আদৌ আসবে কিনা তাও বলা মুস্কিল। চারিদিক ধোঁয়াশায় ঘেরা। বারাউনী ষ্টেশনে অশোক একা দণ্ডায়মান। পাশাপাশি অপেক্ষমান আরো অনেক যাত্রী। সবারই মনের চিন্তা মিথিলা এক্সপ্রেস আসবে তো? সমবেত যাত্রীর মাঝেও সে সম্পূর্ণ একা। বিরাট জনতামাঝে নিঃসঙ্গ এক পথিক। স্মৃতির দুয়ার খুলে সে দেখতে পায় আজকের এই বিদায় নাটকের প্রস্তুতি পর্ব। সে আজ থেকে দু-দশক, প্রায় দুটি যুগের আগের কথা।

অশোক মিত্র নিতান্তই সাধারণ এক ছাত্র। পড়াশুনায় মোটামুটি মনোযোগী। তবে বিরাট স্বপ্ন ছিল মনে। মনের কল্পনায়, শুধু ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে সে খেলেছিল এক ঝুঁকির খেলা। কোলকাতার ছকু খানসামা লেনে অত্যন্ত গোবেচারী অশোক তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এম-এ পাশ করে কি করা যায় এইসব চিন্তা গভীরভাবে ভাবার আগেই সুযোগ একটা এসে গেল। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো। স্বদেশে যার ভাগ্যে মাস্টারী জুটবে কিনা তাতেও ছিল সন্দেহ তার কাছে বিদেশে যাবার সুযোগ এসে গেল। তারপর সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা।

এবং দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। দেশ আমার দেশ! সে দেশ তাকে সততই টানতো। যে আবহাওয়ায় সে ছোট থেকে বড় হয়েছে সেই পরিচিত পরিবেশ তাকে আকর্ষণ করতো। তাই সাজানো বাগানকে ফেলে রেখে সে চলে এলো নিজের দেশে। কল্পনায়, মোহে অথবা শুধুই খেয়ালে সে প্রত্যাবর্তন করলো মহাভারতের দেশে।

তারপর সে এক নতুন জীবন। স্বাধীনতার পর ভুখা ভারতবাসীর মুখে অন্নের যোগান চাই। প্রয়োজন পর্যাপ্ত শস্যের। প্রতিটি মুখে অন্নের চাহিদা। সেই চাহিদা মেটানোর জন্য চাই প্রচুর শস্য ফলানো। শুধু গতানুগতিক পদ্ধতিতে লাঙলের চাষে যে শস্য ফলবে তাতে কি মিটবে কোটি কোটি মানুষের ক্ষুধা? স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজী দেশকে শিল্পে উন্নত করাব পরিকল্পনা নিলেন। গড়ে উঠল নানাবিধ শিল্প। আধুনিক ইনডাস্ট্রি। কিন্তু সব শিল্পের আগে চাই অন্নসমস্যার সমাধান। মার্কিনী দয়ায় চিরদিন একটি স্বাধীন দেশ বাঁচতে পারে না। সবার আগে চাই প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য দুমুঠো খাবার। আর সেই খাবারের খোঁজেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পণ্ডিত নেহেরু। এই প্রধান সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রয়োজন কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি। চাই উন্নতমানের বীজ, প্রচুর পরিমাণে সার। আর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষবাস।

নেহেরুজী তখন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্ক। তিনি যা বলবেন তাই হবে কার্যে পরিণত। তাঁর আশীর্বাণী যেন দেবতার আদেশ। পাশ্চাত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত নেহেরু মানেই ব্রিটিশ ধাচের এক স্বপ্নের ভারতবর্ষের ছবি। সেখানে থাকবে না গরিবী। থাকবে না চোরা চালনকারী তথা ভেজালকারী লোক। খাদ্যে ভেজাল মেশানো জঘন্যতম অপরাধ। সেই অপরাধীকে ধরতে পারলে সব থেকে নিকটবর্তী ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পেটানো হবে।

নেতাজীর রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনা। সেই বিপ্লবী নেতার সত্যিই কি মৃত্যু হলো? অথবা রাজনৈতিক নির্বাসন! কেউ জানে না।

নেহেরুজীর প্রবল প্রতাপ। কেউ বলতে সাহস পায় না। যুক্তি যেন তাদের মন থেকে কেউ কেড়ে নিয়েছে। ভারতবাসীর স্মৃতি থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস মুছে গেলেন। শুধু বাঙালীর অন্তরে তিনি বেঁচে রইলেন। সারা বছরের ব্যস্ততায় সময়ের বড় অভাব। তাই ২৩শে জানুয়ারীকে ছুটির দিন ঘোষণা করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হলো। তিনি স্মরণীয় হয়ে রইলেন সেই ছুটির দিনের প্রভাতফেরীর সঙ্গীতে। ভেঙ্গেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোর্তির্ময় তোমারই হউক জয়! অপর এক বঙ্গ শার্দুল শ্যামাপ্রসাদ। বাপ কা বেটা। শের কা বেটা শের। পার্লামেণ্টে বেশ গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে ফেল্লেন। ভারত বিভাগের অন্তরালে কার হাত? কার স্বার্থে এই বিভাজন? বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী নেতার চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে পড়লেন। বাঙালী ইমোশনাল। কিন্তু ইমোশনের সঙ্গে পলিটিক্সের সম্পর্ক আদায় আর কাঁচকলায়। ভাবাবেগে তিনি সত্য ছবিটি তুলে ধরলেন। সত্যকথা চিরদিনই অপ্রিয়। তিনি সবার শত্রু হয়ে গেলেন। শ্যামাপ্রসাদের দাবী ছিল পঞ্জাবের মতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের সরিয়ে আনতে হবে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে। প্রতিটি বাস্তুহারাকে দিতে হবে সম মর্যাদা। কিন্তু এ ভূ-ভারতে তাও কি কখনো সম্ভব? বাঙালীর ভাবাবেগ দিল্লীর মসনদ স্পর্শ করতে অক্ষম। আসলে ভারতবর্ষ হবে হিন্দী ভাষাভাষী এবং হিন্দুস্থানীদের। সেখানে বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের স্থান কোথায়? ওদের মর্যাদা পূর্ণ বসবাসের সুযোগ দেওয়া মানেই স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা বিফল। ১৯০৫ সাল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ব্রিটিশদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি তো শাসন-তন্ত্রে পরিক্ষিত সত্য। হ্যারোতে পড়া নেহেরুজী একজন সোখীন রাজনীতিবিদ। মহামান্য মতিলালের আদরের পুত্র ব্রিটিশদের এই কৌশল ভালভাবেই জানতেন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষে নেহেরুজীর কথাই আইন।

রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন। নেহেরুজীর গড়া আইন অমান্য করে শ্যামাপ্রসাদ প্রবেশ করলেন কাশ্মীরে। কাশ্মীর কি ভারতের

অঙ্গ নয় ? তবে কেন বন্দী করা হলো শ্যামাপ্রসাদকে ? উত্তর জানা নেই। অথবা প্রশ্ন করার মতো বুকের পাটা নেই সাংসদদের। নেহেরুজীর প্রবল প্রতাপ। শ্যামাপ্রসাদ মৃত্যু বরণ করলেন বন্দীদশায়। কি তাঁর রোগ, কে করলো চিকিৎসা কেউ জানলো না। মৃতদেহ বিমানযোগে উড়িয়ে নিয়ে আসা হলো কোলকাতায়। তারপর চোখের জলে প্লাবিত কোলকাতার রাজপথ হলো সিক্ত। শ্যামাপ্রসাদ বিদায় নিলেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের শোকমিছিলের পর এমন শোক-মিছিল আর হয়নি। দিল্লী থেকে চিরতরে বাঙালী প্রতিনিধি বিদায় নিলেন। শ্যামাপ্রসাদকে বাঙালীরা ভোলে নি। কোলকাতা কর্পোরেশন একটা রাস্তার নামকরণ মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করেছে। আর সব পরিচয় মুছে গেছে বাঙালীর অন্তর থেকে।

স্বাধীন ভারতে চাই নতুন নতুন শিল্প। কলকারখানা। আধুনিক ভারতের রূপকার পণ্ডিতজী পরিকল্পনা নিলেন। দেশের প্রতিটি প্রান্তে কারখানা গড়ে তুলতে হবে। ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন দেশে এই কারখানাই হবে আধুনিক ভারতের মন্দির। শিল্পের প্রতিষ্ঠা মানেই শিবের প্রতিষ্ঠা। কারখানাই হবে জনগণের মন্দির। গড়ে উঠলো ইস্পাত কারখানা। গড়ে উঠলো সার কারখানা। সবই সার্বজনিক কারখানা। এই কারখানা ভারতবাসীর। প্রতিটি নাগরিক এর মালিক। সেই শিল্পের শ্রমিক সম্প্রদায় হলো ভারতীয় জনসাধারণ। নেহেরুজী স্বপ্ন কি সফল হয়েছিল ? হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ মাধ্যমে গড়ে উঠলো যে কারখানা তার উৎপাদন কোথায় ? শুধুই অর্থ-ব্যয়। ব্যয়, না অপব্যয় ! জনসাধারণের অর্থে গড়ে ওঠা কার-খানায় শুধুই কি শ্রমিকের হুমকি। আজ চাকা বন্ধ, তো কালকে ঘেরাও। সবই কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন মতো সাজানো নাটক। চাকরিতে নিয়োগ মানেই নিয়ম বহির্ভূত কাজ। কারখানা পরিচালনার স্টাইল রাজকীয়। একেবারে জমিদারের সুর। আর জমিদারী মানেই উমেদারী তথা তাবেদারী। তাই কর্মকুশলতার সার্বজনিক সংজ্ঞা হলো ঢিলেমী। যে ব্যক্তি আখের গোছাতে ব্যস্ত এবং অভ্যস্ত সেই চালাক। কর্তৃপক্ষের পেয়ারের লোক।

সার্বজনিক সার কারখানায় অশোকের একটা চাকরী জুটে গেল। জনসংযোগের কাজ। কর্তৃপক্ষের জয়ঢাক পেটানোর দায়িত্ব।

সে এক নাটকীয় ব্যাপার! লণ্ডনের উইক এণ্ডগুলো কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে উঠছিল অশোকের। সোম থেকে শুক্রবার কাজের ব্যস্ততায় কেটে যায়। দিনগুলো খুবই ছোটো। তার ওপর শীতের দাপট। সময়কে আয়ত্বে রাখতে আর শীতকে বশে রাখতেই দিনগুলো কেটে যায়। শনি রবিবার বিশ্রামের একটানা ব্যবস্থা। খাওয়া দাওয়া এবং নাওয়া। সপ্তাহে একবার স্নান করতেই হয়। কিছুটা সময় এইভাবে কেটে যায়। তারপর অফুরন্ত সময়। একটানা অবসর। অবসর মানেই অবান্তর চিন্তার আনাগোনা। বয়সটা তখন ত্রিশের কোঠায়। কেমন যেন এক অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়লো। তবে কি কখনো দেশে ফেরা হবে না? বিদেশ বিভুঁই-এ পড়ে থাকতে হবে। পঁচে মরতে হবে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। অশোক সোনার বাংলাকে ভীষণ ভালোবাসে। তবে কি বিপদের দিনে, প্রয়োজনের মুহূর্তে আত্মীয় বন্ধু একটু পাশে দাঁড়াবে না? বিপদে দেবে না সান্ত্বনা! চিন্তার এ এক বিচিত্র ক্ষমতা। উই পোকার মতো কেমন নীরবে দংশন করে চলে। বাইরে থেকে এতটুকু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ভেতর ভেতরে শতছিদ্রাবস্থা। বইয়ের তাকে সাজানো পুস্তকমালা। সুন্দর রঙিন মলাট। জ্বল জ্বল করছে প্রতিটি টাইটেল। কখন যে উইপোকা ভেতরে ঢুকে সব শেষ করে রেখেছে তা কেউ জানে না। মানুষের মনের মধ্যেও চিন্তাকীটের একই প্রভাব। নীরবে, নিঃশব্দে দংশন করে চলেছে। অবিরাম অক্লান্তভাবে। অশোকের মনে চিন্তার এই বীজ বপন করেছিল ওর ধর্মপত্নী কাবেরী।

বয়সটা যখন যৌবনের মধ্য গগনে তখন অশোকের জীবনে সুযোগ এসে গেল। দেশে ফেরার সুযোগ এসে গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। নাটকীয়ভাবে সব ঘটে গেল একেকটি পর্ব। সার্বজনিক সার কারখানায় জনসংযোগের কাজ। বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হয়েছিল দ্য ইংলিশম্যান পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণে।

অল্ডউইচে ভারতীয় হাইকমিশনের রিডিংরুমে বসে পত্রিকাগুলো নাড়াচাড়া করছে অশোক। হঠাৎই চোখে পড়লো বিজ্ঞাপনটা। ও পেশায় শিক্ষক হলেও নেশা সাংবাদিকতায়। তাই কখনো একটু অবসর পেলেই চলে আসে স্ট্রান্ডে। ওখানেই ইণ্ডিয়া হাউজ। ভারতীয়দের কাছে এ হোম অ্যায়োয়ে ফ্রম হোম। সেদিন হয়তো দ্য ইংলিশম্যানের সেই বিজ্ঞাপনটিই অশোকের কাছে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ব্ল্যাক হর্স রোডের বাড়ীতে ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল স্মিথ করোনা যন্ত্রটিকে নিয়ে। কয়েক মিনিটেই এক টুকরো কাগজে অবয়ব পেল চাকরীর এক দরখাস্ত। এবং নিমেষেই তাকে পাঠিয়ে দিল বিমান ডাকে। সবথেকে আশ্চর্য ব্যাপার হলো সেই চিঠির উত্তর এলো। অঘটন আজো ঘটে। নিশ্চয়ই অঘটন বলতে হয় এই ইণ্টারভিউকে। লক্ষ লক্ষ বেকারের দেশে অশোক কি করে সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পেল? তারপর শর্ট নোটিশে বিমানযাত্রা, ইণ্টারভিউ এবং অবশেষে চাকরীর একটা অফার। ঘটনা গল্পের মতো শোনালেও তা নিখাদ সত্যি। নাটকের দৃশ্যগুলো অতি দ্রুতবেগে ঘটে গেল।

মিথিলা একস্‌প্রেস্‌ সত্যিই কি আসবে? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে বারাউনীর বুকে। স্টেশন চত্বরে অনন্যোপায় যাত্রীর ভীড়। সবাই কি যাত্রী? না হতেও পারে। কেউ হতো দালাল অথবা ছিনতাইবাজ। প্ল্যাটফর্মের আলো কখনো জ্বলছে, আবার কখনো নিভে যাচ্ছে। তখন শুধুই অন্ধকার। রামনগরের পান্থ নিবাসে অন্ধকার নেই। সেখানে পর্যাপ্ত আলো। সেখানে আলোর কতোই না অপচয়। এখানে আলোর খুবই প্রয়োজন। অথচ তা নেই। গোবি সাহারার বুকে বসে চেরাপুঞ্জির কথা ভেবে কি লাভ?

ব্রজদা হয়তো এতক্ষণে পান্থনিবাসের পনের-নম্বর ঘরে তার সেই বহুব্যবহৃত ডোরাকাটা লুঙ্গিতে নিজের নিম্নাঙ্গ ঢাকতে ব্যস্ত। অন্তর্বাসের বালাই নেই। শুধু পিতৃদত্ত সম্পত্তি দুটোকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস। হাতে সেই চার-মিনারের অলংকার। মুখ থেকে বের হচ্ছে ফুক ফুক করা

ধোঁওয়া। সোম সাহেবের ঘরে তখন টিভি পর্দায় বম্বের লারে-লাপ্পা সঙ্গীত তরঙ্গ। ইতিমধ্যে দেবুদাও হয়তো এসে গেছে। সন্ধ্যায় সংক্ষিপ্ত স্নানান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ পটে ধূপারতি শেষে সোম সাহেবের ঘরে আসর জমবে। অশোক মিত্র আজ নেই। আলোচনাটা ত্রিভুজ ফর্মুলায় চলবে। আজকের এই বিদায়ের দিনে, বিষাদের ক্ষণে টিভির নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকাই ভাল। অশোকের বিদায় দিনে টিভির পর্দাই পরম বন্ধু। তৎসহ সঙ্গীত তো আছেই— ঝুমারে, ঝুমারে। চুমা দে, চুমা দে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিকল্পরূপে এই গান এক আধুনিক অবতার। অবতার নয়, অসুরের অত্যাচার বলাই ভাল। কানের পর্দাকে কাঁপিয়ে সে এক ভয়ংকর শব্দ-সঙ্গীত। পলিউশন অথবা শব্দ-দূষণ! তবুও তো সময় কাটানোর এই ইডিয়ট বক্স সবাইকে জব্দ করছে। মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

বারাউনী স্টেশনে কোনো টেলিভিশনের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু অশোকের মনের পর্দায় তখন ছবি হয়ে ফুটে উঠছে সেইসব দিনের স্মৃতি। সেই ভরা যৌবনের উন্মাদ আনন্দেঘেরা জীবনে নানা ঝুঁকি নেবার দুঃসাহসিক অভিযান। বিলেতের সুখী জীবন। প্রাচুর্যে, প্রাণ-চাঞ্চল্যে মুখরিত প্রতিটি দিন। ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই। বাড়ী-গাড়ী-ফোন অথবা ফ্যান-ফোন-ফ্রিজের উপপরণে সুসজ্জিত জীবনে আত্মমগ্ন থাকার কথা অশোকের। তদোপরি আছে স্ত্রী-পুত্রের সান্নিধ্য। ক্লান্ত দিবাশেষে সুমধুর মিলনের আকর্ষণ। হোম, সুইট হোম বলতে তো এই ধরণের জীবনকেই বোঝায়। কিন্তু ওকে কি ভূতে পেল? বিরাট বিচিত্র জীবন ছেড়ে মাত্র ছ-শ টাকা মাস মাইনের খিতমতগারী। ক্ষুদে এক জনসংযোগের চাকরী নিয়ে দেশে ফেরা। এ যেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের কাহিনী।

অশোক চিরদিনই নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যের মনোভাবকে তেমন মর্যাদা দেয়নি। আসলে ওর মনে আছে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। ইচ্ছাশক্তির প্রবল প্রতাপে জীবনে বহু সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে। সেই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই একদিন সে

বিলেতের মাটিতে পা রেখেছিল। সত্যিই, মানুষের মনোবল তাকে গিরিশৃঙ্গে তুলে দিতে পারে। ইচ্ছার কি প্রচণ্ড ক্ষমতা। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অশোক। সে বেশ ভালভাবেই জানতো তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সবই প্রাচীন যুগের মতই অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবুও রামকান্ত মিস্ত্রি লেনের মেসে বসে অশোক স্বপ্ন দেখছে। সে স্বপ্ন অতীতে অবগাহন নয়। সে স্বপ্ন কল্পনানির্ভর আগামী কালের। গতানুগতিক জীবনে ওর আস্থা নেই। সে জীবনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাও নেই। চাই পরিবর্তন। চাই জীবনের বৈচিত্র্য। তাই কার্শিয়াঙের গোথেলস্ স্কুলের চাকরী ছেড়ে সে পাড়ি দিয়েছিল নিরুদ্দেশের দেশে। যাত্রা তার সুখকর না হলেও গন্তব্যস্থল তার কাছে এনেছিল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। স্বদেশের সমস্ত আত্মীয়বর্গ, বন্ধু-বান্ধবীরা যখন ওকে নিয়ে নানা আলোচনায় মুখর তখন সে লণ্ডনের পথে একজন চলমান পথিক। পথকে অবলম্বন করেছিল সে। পথই তাকে টেনে নিয়ে গেছে সামনের দিকে। পেছনে তাকানোর সময় ছিল না। জীবনের চলার পথে কখনো বা পরাজিত হয়েছে সে। কিন্তু কখনো হয়নি পর্যুদস্ত।

লণ্ডন থেকে সোজা চলে এসেছিল বিধাননগর সার কারখানায়। সার্বজনিক সার কোম্পানীর কনিষ্ঠ জনসংযোগ অফিসার সে। অশোক মিত্র, জুনিয়ার পাবলিক রিলেশানস্ অফিসার - এই হলো তার পরিচয়। ভারতীয় হয়েও ভারতে প্রথম চাকরী। সেদিক থেকে সে নিজদেশে পরবাসী। যে চাকরীতে সে প্রথম যোগদান করলো সেই চাকরীর ইণ্টারভিউ দেবার অভিজ্ঞতাও বেশ নাটকীয়। হাতে তার টেলিগ্রাফিক ইণ্টারভিউ লেটার। অশোকের মনে তখন শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের দ্বিধা। 'টু বী, অর নট টু বী'র জিজ্ঞাসা তাকে ঘিরে ধরলো। বয়স অনুযায়ী ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয় তখন কি উপায়? মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে যদি কুড়িতে বুড়ী বলে ধরা হয় তবে ছেলেদের চাকরীর ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশেই

প্রতিযোগিতার শেষ। তারপর সব অন্ধকার। চাকরীর বাজারে মন্দা। সমাজের দর্পণে অপদার্থ। অসহায়ত্ব শুরু হয় ঠিক তখন থেকে। অশোক স্থির করে নিয়েছে। সুযোগ ছাড়লে চলবে না। দেশে ফেরার এটাই একমাত্র পাসপোর্ট। এটাই তার ফার্স্ট অ্যান্ড ফাইন্যাল চান্স।

অনেক কষ্টে অশোক সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিল। সুদূর বিদেশে স্ত্রী পুত্রকে রেখে সে মাত্র চোদ্দ দিনের একটি সফরসূচী নিয়ে দেশে এসেছিল। হাতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের টিকিট। যাতায়াতের উভয় সফরই কনফার্মড। তাই সংক্ষিপ্ত মালপত্তর নিয়ে হীথরো বিমান বন্দরে উপস্থিত। কিন্তু বিধি বাম! প্রথম বাঁধা একটু ধাঁধার মতো মনে হলো। ওয়াইল্ড-ক্যাট স্ট্রাইক! হঠাৎই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ধর্মঘট। কি একটা দাবীর জন্য কর্মবিরতি। ওদের সব ফ্লাইট বাতিল। আর বিমান বাতিল মানেই যাত্রাভঙ্গ। এখন উপায়? আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রীর কতকগুলো সুবিধাও আছে। সঙ্গে নামী কোম্পানীর দামী টিকিট থাকলে যে কোনো বিমানে ভ্রমণ করা যায়। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের টিকিট নিয়ে অশোক এয়ার ইন্ডিয়ার সম্রাট শাজাহান জাম্বোতে সীট পেয়ে গেল। গন্তব্যস্থল দিল্লীর পালাম। তারপর ডোমেস্টিক ফ্লাইটে দমদম। কিন্তু পালামে নেমেই যত বিপত্তি। সব যাত্রীর ব্যাগেজ এসে গেছে। অশোকের সুটকেস্ আসেনি। এই যে এমন একটা ঘটনা, একজন যাত্রীর মাল আসেনি সে ব্যাপারে কারো মাথা ব্যথা নেই। এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মীরা ওকে তেমন পাত্তাই দিচ্ছে না। একজন প্যাসেঞ্জার লণ্ডন থেকে পালামে নেমে আবিষ্কার করলো তার ব্যাগেজ আসেনি। লস্ট ইন ট্রানসিট। যেখানে হাজারো লোকের ভীড় সেখানে হতেই পারে এমন অঘটন। তবে তার বিকল্প ব্যবস্থাও চাই। অশোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে উর্দিপরা বিমান কর্মিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। তারা সবাই বেশ স্মার্ট। এসব ছোটখাটো অনুরোধে সাড়া দেবার সময় নেই তাদের। অবশেষে এক বিমান বালিকার সাহচর্যে দিল্লীর আকবর হোটেলে থাকার হোটেলে থাকার

বন্দোবস্ত হলো। যতদিন তার সুটকেস্ না আসছে ততদিন সে থাকতে পারবে এয়ার ইণ্ডিয়ার খরচে। ফাইভ স্টার হোটেলের সেবায় তার লোভ নেই। তাকে যেতে হবে কোলকাতায়। এবং সেখান থেকে বিধাননগর। ঠিক দুদিন পরই বিধাননগর সার কারখানায় তার ইণ্টারভিউ।

দিল্লীতে একদিন সরকারী অতিথি হিসেবে ছিল অশোক। তারপর কোলকাতায় এসেছিল একবস্ত্রে। ব্যাগেজের জন্য প্রতীক্ষা করলে তাকে ওখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করতে হতো লণ্ডনে। যে শীতবস্ত্র পরে রওনা হয়েছিল সেই বস্ত্রেই আটত্রিশ ডিগ্রীর গরমে কোলকাতায়। তারপর একদিনের অর্ডারে মেড টু মেজার পোষাকে বিধাননগর গমন। এত বাধা বিপত্তি সত্বেও চাকরীটা তার জুটে গেল। ইণ্টারভিউ বেশ জমে উঠেছিল। বোর্ডের প্রতিটি মেম্বারই কথা চায় অশোকের সঙ্গে। ও'রা ভাবতেই পারছেন না এই থার্ড গ্রেড ইনডাস্ট্রিতে কেন আসতে চাইছে সে। ওঁদের একটাই কৌতূহল, সব প্রাচুর্য ছেড়ে অশোক কেন হঠাৎ দেশে ফিরতে চাইছে। সার্বজনিক কোম্পানীতে কিসের মোহ? যে অর্থ ব্যয় করে সে এখানে ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে সে খরচ তুলতেই তো দু বছরের মাইনে শেষ হয়ে যাবে। তবে কেন? অনেক দ্বিধা, সংশয় এবং আলোচনার পর সিলেকশন বোর্ডের সবাই ওকে নির্বাচন করলেন। বেতন প্রতি মাসে ছ'শ টাকা। অল ইনক্লুসিভ। সর্বসাকুল্যে ঐ টাকায় ওকে মানিয়ে নিতে হবে। কাজ জনসংযোগের। কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ লোক চাইছিলেন। কিন্তু কেন যে অশোককে নির্বাচন করলেন তা ঈশ্বর জানেন। সার্বজনিক কারখানায় প্রায় সবাই ঘষেটি বেগম। ঘষে ঘষে প্রমোশন পেয়েছে। কর্তৃপক্ষ চাইছেন নতুন রক্তের সঞ্চালন। তাই এই নিয়োগ। ঘষেটি বেগম কথাটি শুনে অশোক প্রথমে একটু চমকে গিয়েছিল। ওর চমক ভাঙ্গালেন ফিনান্স ম্যানেজার নটবর সিংহ। তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন এই সাংকেতিক ডেসিগজেশনের মানে।

এই কোম্পানীতে সরাসরি অফিসার খুব কমই আছে। বিশেষ

করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্টে অত শিক্ষিত লোকের দরকারই বা কিসের ? কারখানা পরিচালনা করবে টেক্নোক্র্যাটরা। আর তাদের ফাই ফরমাস খাটার জন্য প্রয়োজন কেরাণীবাবু। তাই কনিষ্ঠ কেরাণী অথবা স্টেনো টাইপিস্ট থেকেই সবাইকে প্রমোট করা হয়। যে কেরাণী প্রথম জীবনে কোনো বড় কর্তার বাজার সরকার ছিল তার পদোন্নতির অধিকার সর্বাগ্রে। এর ওপর আছে তিন বছরের ইয়ার্ড-স্টিক। কোনোরকমে ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে তিনটি বছর কাটাতে পারলেই হল। প্রমোশন রোখে কে ? অশোককে কর্তৃপক্ষ গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করতে চান। এই বিরাট কেরাণীবাবু বাহিনী এবং শিল্পজগতের তথাকথিত টেকনোক্র্যাট-দের মাঝামাঝি এক বাফারের কাজ হবে তার। গবেষণাগারের নতুন অতিথি অশোক। আসলে কর্তৃপক্ষ দেখতে চাইছেন এই ধরণের একটা পরীক্ষা শিল্পে কাজ করে কিনা ? বিশেষ করে কাজটা যেক্ষেত্রে জনসংযোগের। তাঁরা ভেবে দেখেছেন. লে লে বাবু ছে-আনার কনিষ্ঠ জনসংযোগ অফিসারকে দিয়ে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই। যে লোক ছ'হাজার পাউণ্ডের কাজ ছেড়ে ছ'শ টাকায় নাক-খত্ দিতে প্রস্তুত তাকে দিয়ে সব কাজ করানো সম্ভব। অশোক কারখানার ওয়ার্কার আর ম্যানেজারের মাঝে শক্-অ্যাবজর্ভারের কাজ করবে। ওকে নির্বাচন এবং নিয়োগের অন্তরালে কর্তৃপক্ষের যে পরিকল্পনা আছে তা বুঝতে ওর অনেক সময় লেগেছিল। কোনো মেম্বার সে রহস্য বুঝতে দেননি। শুধু জেনারেল ম্যানেজার আচারিয়া সাহেব সব কমিটি মেম্বারকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, ওয়েল জেণ্টলম্যান। উই ওয়াণ্ট টু রিক্রুট নিউ ব্লাড। আই থিংক মিস্টার অশোক মিট্রা হ্যাজ দ্য কোয়ালিটিজ টু ফীট ইন।

আজও মনে পড়ে সেদিনের সেই কথোপকথন। স্পষ্ট মনে পড়ে আচারিয়া সাহেবের সক্রেটিস সুলভ সেই জ্ঞানী মন্তব্য। বিধাননগর থেকে কোলকাতায় ফিরে প্রথমেই স্ত্রী কাবেরীকে এস-টি-ডিতে সংবাদটি পরিবেশন করেছিল অশোক। একদিকে বিলেতের প্রাচুর্য এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা, অপরদিকে বিধাননগরে পরিমিত আয়ের জীবন। কোনটা গ্রহণ করবে সে ? সাতদিনের

মধ্যেই মতামত জানাতে হবে কর্তৃপক্ষকে। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। অশোক তখন স্বদেশে ফেরার জন্য বেপরোয়া। একেবারে উন্মাদ। দেশে ফিরতেই হবে। বিনা স্বদেশী ভাষা, মেটে কি আশা? প্রবাসের দিনগুলো আলোকিত হলেও তেমন আমোদের নয়। জীবনে সুখ কখনো ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সবার সাহচর্যে, সংস্পর্শে এবং শুভেচ্ছায় যে প্রাপ্তি তাই তো পরম তৃপ্তির। তাতে সর্বসুখ, অপার আনন্দ। দীর্ঘ প্রবাসজীবনে কোথায় যেন এক সূক্ষ্ম বেদনা চিন চিন করে অন্তর কুরে বেড়ায়। কাবেরীকে টেলিফোনেই সংসার গোটানোর ইঙ্গিত দিয়েছে সে। ও প্রান্ত থেকে শুধু একটি শব্দ ভেসে এসেছিল, কবে আসছ ফিরে?

অশোক সার্বজনিক সার কারখানায় জনসংযোগের কাজই গ্রহণ করেছিল। মাইনে অতি সাধারণ। কোনো ভদ্রলোককে বলার মতোও নয়। মাত্র এই কয়েকটা টাকার জন্য জীবনে কেউ এমন ঝুঁকি নেয়? অশোক দুঃসাহসের কাজ করেছে। এই সাহসই ওকে লণ্ডন ত্যাগের দৃঢ়তা দেখিয়েছে। নতুন পরিবেশে ঝাঁপিয়ে পড়ায় অনেক ঝামেলা আছে। সার্বজনিক কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে সে তিন মাস সময় চেয়েছিল। একটা পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলায় অনেক ঝঞ্ঝাট। বিদেশে সবকিছু গুটিয়ে দেশে ফেরার তাগিদে এবং নতুন চাকরীতে যোগদানের জন্য সময়ের প্রয়োজন। নতুন কর্তৃপক্ষ অশোকের অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছে। সেজন্য সে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। রীতিমতো কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল পরিশীলিত এক পত্রে। অত্যন্ত বিনয়ী ভাষায় বক্তব্য রেখেছিল সে। কেন তার প্রয়োজন সময়ের? সে তো বেকার যুবক নয়। বিদেশের সংসার গুটিয়ে দেশে ফেরা চারটেখানি কথা নয়। চিঠি পেয়ে ওর ভাবী বস্ দয়ালসাহেব দারুণ খুশী। হবে, ওনার হবে এই কাজে প্রতিষ্ঠা। যোগাযোগের ভাষা যার দখলে, মানুষকে কথার মাধ্যমে মুগ্ধ করার কৌশল যার করায়ত্ব তার পক্ষেই জন-সংযোগ অফিসার হওয়া শোভা পায়। দয়াল সাহেব অশোকের অনুরোধ পত্রের প্রত্যুত্তরে এইসব কথাগুলো লিখেছিলেন। অশোক

তখনো জানতো না দয়াল সাহেবের কথার মধ্যে কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা। সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়ে অবশেষে দেশের মাটিতে সে নেমেছিল। অনেক আশা, সার্বিক সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সম্বল করে সে বিধাননগর কারখানায় যোগদান করেছিল। জনসংযোগ আধিকারিকের পদে প্রথম হাতেখড়ি এই সার কারখানার আঙিনায়। লণ্ডনের ফ্রিজিং পয়েণ্ট টেম্পারেচার থেকে হঠাৎই বিধাননগরের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর গরমে তার পরীক্ষা শুরু। স্থানীয় আবহাওয়ার উষ্ণতা অথবা কর্মস্থলের উত্তেজনা কোনটা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ঈশ্বর জানেন!

বিধাননগর শিল্প নগরী। লক্ষ লোকের জনবসতিতে একদা যা ছিল বনে ঘেরা গ্রাম আজ তা শিল্প শহর। কোলকাতা থেকে কতটুকুই বা দূর। মাত্র একশ' ষাট কিলোমিটার দূরে, মহানগরীর বাইরে সে এক মহা কর্মক্ষেত্র। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের শিল্পনগরী। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমি। লৌহশিল্প প্রথম এবং প্রধান হলেও অন্যান্য আরো বত্রিশটি শিল্প গড়ে উঠেছে এই পরিকল্পিত শহরে। প্রতিটি শিল্পকে নিয়েই বিধাননগরের গৌরব। অশোক মিত্র প্রথমদিন কাজে যোগদান করে লক্ষ্য করলো সার্বজনিক সার কারখানায় কাজ অপেক্ষা অকাজের দিকে ঝোঁক বেশী। প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে যে কারখানার প্রতিষ্ঠা, অনেক সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা যে কারখানার দিকে তাকিয়ে আছে চাতকের মতো সেখানে চিমনী থেকে ধোঁয়া বের হয় না। বাক্ সর্বস্ব কর্তৃপক্ষ বনাম কর্মবিমুখ কর্মীদের এক কবির লড়াই প্রতিদিনের ঘটনা। আন্দোলন, আলোড়ন আর স্লোগান মুখরিত কারখানা প্রান্তর। কর্তৃপক্ষের কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। আমাদের দাবী মানতে হবে নইলে গদী ছাড়তে হবে ইত্যাদি স্লোগানে কারখানার পরিবেশ মুখরিত। হাতে লেখা পোস্টারে 'জবাব চাই, জবাব দাও' ধ্বনি উচ্চারিত। অফিসের পরিবেশ বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' চিৎকারে যখন সব কর্তব্যবিমুখ মজদুর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে আসে তা দেখলে মহামান্য মার্কস্ সাহেবও মূর্চ্ছা যেতেন। প্রথমদিনের এই আন্দোলনের মহড়া শুনে

অশোক বেশ চমকে গিয়েছিল। ওর মনে পড়লো ১৯৪৬ সালের সেই দাঙ্গার কথা। সে আন্দোলনের অথবা মিছিলের সুরও ছিল এমনই ভয়ংকর। সেই জিগীরে ছিল বিপদের সুর।

সার্বজনিক সার কারখানা বিধাননগরের নবজাত শিশু। কিন্তু সেই সদ্যজাত শিশুরই কি দুর্দান্ত প্রতাপ! সে শিশু দাঁত হবার আগেই কামড়াতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে জনসংযোগ বিভাগ যেন স্যাণ্ডউইচের স্টাফিং। দু-স্লাইস পাঁউরুটির মধ্যে নরম কিছুটা মাখন। একদিকে কর্তৃপক্ষ, অপরদিকে মজদুর সংঘ। মধ্যিখানে জনসংযোগ আধিকারিক। পাবলিক রিলেশান্স অফিসার, ওরফে পিয়ারো। উভয়পক্ষের পিঠ ঠেকানো আছে এই ব্যাটা পিয়ারোর গায়ে। দু-দলের চাপ সহ্য করার জন্যই এই আধুনিক বন্দোবস্ত। ইনডাস্ট্রী উইদাউট এ পিয়ারো যেন শিবহীন যজ্ঞ। একদিকে মজদুরের দল কোনো কাজ করবে না, অন্যদিকে মহামান্য এনজিনীয়ারগণ বড়ো বড়ো আদর্শের বক্তৃতা দিয়ে যাবে। আর সেইসব অকেজো কথা রেখে-ঢেকে পত্রিকা-ওয়ালাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। বেশ জটিল কাজ এই জনসংযোগ বিভাগের।

অশোক ভেবেই পায় না কোন্ দিক সামাল দেবে। এতো মিথ্যা, এতো ফাঁকি ঢাকতে গেলে অমাবস্যার সংজ্ঞাটাই বদলে দিতে হয়। সামনে সমস্যার পাহাড় এবং তা দেখে সে যেন সাগরজলে পড়লো। তবে ওর ভাগ্য ভালো। দয়াল সাহেবকে বস্ হিসাবে পেয়েছে। মিস্টার মহিমারঞ্জন দয়াল, সংক্ষেপে এম. আর. ডি, একজন ঝানু পিয়ারো। জনসংযোগের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিজের ঝুলিতে নিয়ে যোগদান করেছেন এই কারখানায়। পাবলিক রিলেশান্সে ওস্তাদ দয়াল সাহেব অশোকের শিক্ষাগুরু। কারখানায় এক ছটাক উৎপাদন না হলেও সাংবাদিকদের কেমন করে খবরের খোরাক যোগাতে হয় সে কৌশল তাঁর নখদর্পণে।

মিস্টার মিট্রা। ডোণ্ট ওয়ারী। একদম ঘাবড়াবেন না। আপনি এখন ইণ্ডিয়াতে। এখানে সততা, কাজের আগ্রহ দেখাবেন না। শুধু দেখে যান এবং নিজের, স্কিন বাঁচানোর জন্য একটা ফন্দি

এঁটে রাখুন। আই মীন, অলওয়েজ কীপ অ্যান একস্‌কিউজ রেডী। দয়াল সাহেব আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন এদেশে সিন্‌সিয়ারিটি, এফিসিয়েন্সির কোনো মর্যাদা নেই। তাই যদি থাকবে তবে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে মাত্র ছ'শ টাকার অফার দেয়। এই কোম্পানীর ড্রাইভারগুলোর প্রতিমাসের ওভারটাইম এর চেয়ে অনেক বেশী। এই যে ক্ষুদে এনজিনীয়ার সব ঘুরে বেড়াচ্ছে এরাই হলো ভবিষ্যতের জেনারেল ম্যানেজার। আপনার আমার সবার কর্তৃপক্ষ। ওদের কথাই হবে বেদবাক্য। ওরাই সভাসমিতিতে ভাষণ দেবে। দার্শনিকের মতো কথা বলবে। সে ভাষণ অবশ্য লিখে দিতে হবে আমাদের। ওদের সুন্দরী স্ত্রীরা নানা অনুষ্ঠানের ফিতে কাটবে। সেই ফিতে কাটার ছবি তুলতে হবে। ফটোগ্রাফারের বন্দোবস্ত করতে হবে আমাদের। সেই ছবির কপিগুলো মেমসাহেবের বাংলোয় পেঁছে দিতে হবে। সেই ছবির বিল যখন পে করতে হবে তখন জেনারেল ম্যানেজারই মন্তব্য করবেন, ব্যয় সংক্ষেপ করুন।

আজকের অর্ডার হলো—ইকনোমিক অস্টারিটি। অথচ ওভারটাইম চলছে সমান তালে। সার্বজনিক কারখানা হলো ওভারটাইমের মহাসমুদ্র। এই মহাসমুদ্র থেকে কয়েক ঘটি জল তুলে নিলে সমুদ্রে কি জলের ঘাটতি দেখা দেবে? এ হলো ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান। যতদিন আছে অশোকস্তম্ভ ততদিন থাকবি শ্রমিকের দম্ভ। সারাদিন বিড়ি ফুঁকে, বাড়ীতে, মানে কোম্পানীর কোয়ার্টারে, গরু-মোষ, হাঁস-মুরগীর পোলট্রি তত্ত্বাবধান করেও আটঘণ্টা ওভারটাইম বাঁধা। মিথ্যা ও-টির টাকায় মাইনের প্যাকেট পুরতে হলে গাওনা একটু গেয়ে রাখতেই হয়। চোরের মায়ের বড়ো গলা। দয়াল সাহেব সকাল এগারোটার টি-ব্রেকে অশোককে বুঝিয়ে বলেন, মিস্টার মিট্‌রা, কিচ্ছু ভাববেন না। সব গা সহা হয়ে যাবে। সময়ের আস্তরণে লোকে পুত্রশোক ভুলে যায়। বুঝলেন তো, টাইম ইজ দ্য বেস্ট হীলার! আপনি আপনার বিলিতি কায়দায় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। আদর্শ, নীতি, এথিকস্‌ সব ভুলে যান। প্র্যাক্‌টিস্‌ মেক্‌স আ ম্যান পার্ফেক্ট।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইউ উইল বী অলরাইট ইন ডিউ কোর্স।

অশোকের মনে তখনো ফাঁকি দেওয়ার মন্ত্রটি বাসা বাঁধেনি। সদ্য বিলেত থেকে এসে আদর্শ, নীতি এবং কর্তব্যপরায়ণতার কথাই তার মনে সদা জাগ্রত। তখনো দেশের জন্য, দশের জন্য উপকার করার প্রবৃত্তি মনে-প্রাণে অনুরণিত। সমাজে-সংসারে বৃদ্ধ দাদুরা যেমন নাতিদের কাছে গল্পের মাধ্যমে নাতবৌয়ের সঙ্গসুখের সুর-সুরি দেয় অভিজ্ঞ দয়াল সাহেবও তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিহাস পড়ে শোনাতে ব্যস্ত। তিনি যোগ্য শিষ্য পেয়ে গেছেন। কিছুতেই থামতে চান না। বুঝলেন মিস্টার মিট্রা, এটা বিলেত নয়। দেশটা ভারতবর্ষ। এখানে বাঁচতে হলে স্থানীয় রীতি-নীতি মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। বী আ রোমান হোয়েন ইউ আর ইন রোম। অশোক বারে বারেই জানতে চায় তবে কি করে সাংবাদিকদের খুশী রাখা যায়? পাঁচশ' কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ম্যানেজাররা পেট্রোল পুড়িয়ে কারখানা আর টাউনশীপে যাতায়াত করছে। শ্রমিকেরা মোটা অংকের ও-টি নিয়ে বাড়ীতে ফ্যান-ফোন-ফ্রীজ ব্যবহার করছে। অনেকে আবার গ্যাস-আভেন, ভি-সি-পি পর্যন্ত কিনেছে। জেনারেল ম্যানেজার বিমানে যাতায়াত করছেন। অথচ কারখানায় উৎপাদন নেই। উৎপাদনের ঘরটি একেবারে শূন্য। এই নগ্ন-সত্যকে কিভাবে চাপা দেওয়া সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে দয়াল সাহেব বলে ওঠেন, নো প্রব্লেম। সাংবাদিকরাও মানুষ। আজ তারা ঘটনাচক্রে অথবা মামার জোরে কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করছে। সে কাজ আপনিও করতে পারতেন। শুধু গ্রহের ফেরে আমাদের বৃত্তির পরিবর্তন। বেশ রসিয়ে এবং তির্যকভাবে তিনি বলে চলেন তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কাহিনী।

সংবাদপত্র হলো প্রতিদিনের নানা ঘটনাবলীর বিবরণ। সমাজকে বাদ দিয়ে এই মাধ্যম অর্থহীন। সাংবাদিকরাও সামাজিক জীব। চাকরী বজায় রাখতে হলে সংবাদ সংগ্রহ করতেই হবে। আর আমরা, এই জনসংযোগের বাবুরা, সেই সংবাদ সরবরাহ করে থাকি। কারখানার পিয়ারো সাংবাদিকদের অত্যন্ত পেয়ারের।

জানেন না, ভারতের এক প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের কি বলেছিলেন। তাঁর মতে, নিউজ ক্যান বী বট্ ওভার আ বট্‌ল অফ ড্রিংকস। আমাদের একহাতে খাবার, অপর হাতে খবর। সাংবাদিক আর অগ্রদানী ব্রাহ্মণের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। অথবা অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য আছে উভয়ের প্রকৃতিতে। নিজের প্রাপ্য পেলেই সে সন্তুষ্ট। দয়াল সাহেবের মতে একজন বিজ্ঞ জনসংযোগ আধিকারিকের কাজ হবে মিডিয়াম্যানদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা। দেশের বড়ো নেতা হতে গেলে যেমন চাই কয়েকজন মাস্‌লসম্যান তেমনি প্রতিষ্ঠিত পিয়ারো হতে চাইলে দরকার কয়েকজন মিডিয়াম্যান। পেশী শক্তি আর পেশাশক্তি দুটোরই প্রয়োজন জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে। পিয়ারোদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে এইসব তথাকথিত বন্ধুদের খাইয়ে, পরিয়ে, সময় মতো ভেট দিয়ে বরাবরের বন্ধুত্বে আবদ্ধ রাখা। একবার নেশা ধরিয়ে দিলে চিরদিনের গোলাম। পিয়ারো যা বলবে তা পরের দিন খবরের কাগজে জায়গা জুড়ে বসবে। বড়ো বড়ো ইনডাস্ট্রির পিয়ারো হলো এক একজন নামী তান্ত্রিকের মতো। তন্ত্রবলে সব সাংবাদিককে বশ করে রাখাই তার কাজ। সম্পর্কটা হবে ভগবান আর ভক্তের। তবে কে যে কখন ভক্ত, আর কে কোন পরিস্থিতিতে ভগবান তা বলা বারণ।

সংবাদপত্রের পাঠক এক বিচিত্র জীব। পত্রিকার ওপর তাদের পরম শ্রদ্ধা। প্রতিটি খবর যেন আমিনিয়া হোটেলের মুখরোচক খাবার। ছাপার অক্ষরে যা প্রকাশিত হলো তাই সত্য এবং বাইবেলের বাণী। এ ব্যাপারে লণ্ডনের দ্য টাইমস্ পত্রিকা তো বিশ্বসভায় দলিলের মর্যাদা পেয়ে থাকে। টাইমস্ বলেছে মানেই খবরটি প্রায় লিখিত দলিলের মর্যাদায় ভূষিত হলো। দয়াল সাহেব বিশেষভাবে অশোককে স্মরণ করিয়ে দেন বিধাননগর কথাটি।

আমরা আছি কোলকাতার বাইরে বিধাননগরে। আমাদের খবর ছাপা হবে কোলকাতার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায়। এখানকার খবর কোনোদিনই লিড-স্টোরি হবে না। তারপর ক' সেণ্টিমিটার জায়গা দেবে তা নির্ভর করছে নিউজডেস্কের বাবুদের ওপর।

ওদের মেজাজ এবং মর্জির ওপর বিধাননগরের রিপোর্টাররা নির্ভরশীল। তাই শুধু স্থানীয় রিপোর্টারদের নয়, তোয়াজ করতে হবে রাজধানীর কেষ্ট বিষ্টুদেরও। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাছেই বিশেষভাবে স্মরণাপন্ন হতে হবে। নিয়ম করে এবং নিয়মিতভাবে সেলাম জানিয়ে আসতে হবে নিউজ ডিপার্টমেণ্টে। বারো মাসের তের পার্বণে তিথি নক্ষত্র মেনে পুজো দিতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে গিফ্‌ট-প্যাকেট। আজ নিউ ইয়ার্স ডে, তো কাল বাংলা নববর্ষ। আজ একজিকিউটিভ ডায়েরী তো তিনমাস পর কোম্পানীর গেস্ট হাউজে সপরিবারে নিমন্ত্রণ। কোম্পানীর রয়েছে সুন্দর, সাজানো অতিথিশালা। সেখানে আছে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কেয়ার-টেকার। শুধু ইন্টারকামে বলে দিলেই হলো। ওরা সব ব্যবস্থা করে রাখবে কোম্পানীর খরচে। সাংবাদিকরা তখন সম্রাট। সম্রাট সম্বর্ধনায় আধুনিক পিয়ারোরা বেশ পটু। শিল্প প্রতিষ্ঠানের অতিথিশালায় সব বন্দোবস্ত সব সাজ সরঞ্জাম রাখা আছে কেবল লেবার কমিশনারের মনোরঞ্জন আর সাংবাদিক বন্ধুদের মানভঞ্জনের উদ্দেশ্যে। বুঝলেন মিস্টার মিটরা, সব জেনে যাবেন অল্পদিনের মধ্যে। কারখানার জনসংযোগ আর কিছুই নয়। শুধু সাংবাদিক আপ্যায়ন। অতিথি আপ্যায়নের নামে জেনারেল ম্যানেজার সহ সব বিভাগীয় প্রধানের ঢালা কক্‌টেল পার্টি। ফলোড বাই ডিনার। সাংবাদিক বন্ধুরা খুশী হবেই। এ যেন শিষ্যগৃহে গুরুর আগমন। বর্তমান যুগে এইসব সাংবাদিক গুরুই কোম্পানীর ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পারে। তাই তাদের পদসেবা থেকে পাদোদকপানে সর্বশান্তি, স্বর্গীয় সুখ।

এ যুগে মিডিয়াম্যানরাই কুলশ্রেষ্ঠ। পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড। সত্যিই, কামান অপেক্ষা কলমের ওজন বেশী। তাই তো এই শিবের ব্রত। বিশেষ করে, সার্বজনিক সার কারখানায় জন-সাধারণের অর্থে এই পুজো বেশ ভালই হয়। উৎপাদন অপেক্ষা উপাদানের প্রাধান্য এখানে। কর্তৃপক্ষ আমাদের মতো সাদা-পোষাকের পুলিশ রেখেছে শুধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। পিয়ারোকে কারখানার সব খবর রাখতে হবে। প্রয়োজনে

কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিতে হবে। আবার দেখতে হবে কোথাও যেন কোনো বেফাঁস কিছু প্রকাশিত না হয়।

খবরের কাগজের লোকদের বিশ্বাস নেই। সব সুবিধা গ্রহণ করেও হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিতে ওরা ওস্তাদ। তাই চাই প্রতিদিনের যোগাযোগ। চাই তাদের সান্নিধ্য এবং সহযোগিতা। সখ্যতায় যেন কখনো ভাঁটা না পড়ে। খবর নেই তো কিসের ভয়? খাবার তো আছে। জি-এম সাহেবের ঢালা অর্ডার, ফর রিপোর্টার, নো রেস্ট্রিকশান। অস্টারিটি ড্রাইভ! সে তো ইন্দিরাজীর ক্যাচ্-ফ্রেজ। যদি মনে প্রাণে সব নেতাই ব্যয় সংকোচে বিশ্বাস করেন তবে কি প্যাকার প্লেনে চাপিয়ে বুলেট প্রুফ গাড়ী আনা হতো ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে। আর নেতা সফরে আসছেন তাই লক্ষ সিপাহীর সন্ত্রস্ততা। নিরাপত্তার নামে সাধারণ লোকের নির্যাতন। সবই শো! রাজা বিদায় নিয়েছেন। রেখে গেছেন রাজতন্ত্র। ইংল্যাণ্ডের রানীর সফরসূচী নির্ধারণ করে ওয়েস্ট মিনস্টার। স্বাধীন দেশের নেতারা দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যও ব্যবস্থা করেন বিশেষ বিমানের। সত্যিই, সেলুকাস। কী বিচিত্র এই ভারতবর্ষ! দয়াল সাহেব স্টেট একস্‌প্রেসের ধোঁওয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে যাচ্ছেন জনসংযোগ আধিকারিকের কাজ কি। আর নবাগত অশোক যেন আচার্যের মুখে মন্ত্র শুনছে। কোন দেবতার কি মন্ত্র। কোন্ ধরণের পুজো, কি হবে তাঁর ভোগ!

বিধাননগরের দিনগুলো বেশ ভালই কাটছে। অশোকের বস্ দয়াল সাহেব দয়ালু লোক। বিশেষ করে তাঁর সাব অর্ডিনেটের ওপর বেশ একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জেনারেল ম্যানেজার আচারিয়া সাহেব একজন নামকরা কেমিক্যাল এনজিনীয়র। তবে শিল্পে রসায়ন বিদ্যার প্রয়োগ অপেক্ষা ব্যক্তিগত জীবনে একজন রসিক লোক। অদ্ভুত তাঁর বাংলা-প্রীতি। জন্ম মহারাস্ট্রে হলেও কর্মস্থল বঙ্গে। এই বংগাল তাঁর বিশেষ প্রিয়। ততোধিক প্রিয় বাঙালী রমণী। অশোকের একদম ভালো লাগে না ভদ্রলোকের চাল চলন। অনেক আচরণই কেমন যেন সন্দেহজনক। চীফ এনজিনীয়র ধীরেন মহাজন ওঁর ভীষণ ফেবারিট। ওর ওপর একটু বিশেষ নজর, অতিরিক্ত স্নেহ। স্নেহ, না দুর্বলতা বলা তা

মুস্কিল। সন্ধ্যায় অফিসার্স ক্লাবে ব্যাড্মিণ্টন খেলার আকর্ষণে সব টেক্নোক্র্যাটরাই সমবেত হয়। এ ব্যাপারে একেবারে ব্রিটিশ এটিকেট।

সন্ধ্যায় ক্লাবে আগমন মানেই সস্ত্রীক। যাদের স্ত্রীরা বিগত যৌবনা তারা ষোড়শী কন্যাকে সঙ্গে করেই আসে। খেলার পার্টনার একজন চাইই। দয়াল সাহেব বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শুধু দেখে যাবেন মিস্টার মিট্রা। কীপ আইজ ওপেন। বাট নেভার ওপেন য়ুয়োর লিপস্। এ হলো শিল্প শহর। ইনডাস্ট্রিয়াল টাউনশীপ। আর শিল্পসভ্যতার এক বিশেষত্ব হলো ক্লাব-লাইফ। কারখানার জীবন খুবই যান্ত্রিক। কর্মীদের জীবনও যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। শুধু স্বার্থ আর প্রয়োজন। যে অপারেটারের কাজ করছে সে ভাবছে কবে চার্জ-ম্যানের পোস্ট জুটবে। আজ যে জুনিয়ার এনজিনীয়র সে ছক কষছে জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ার দখল করতে কত বছর লাগবে। তাই শুধু প্রতিযোগিতা। কেরিয়ার তৈরীর জন্য শুধুই প্রতি-যোগিতা। এক ধরণের র‍্যাট-রেস্। সন্ধ্যার অফিসার্স ক্লাব অনেকের কাছেই সুযোগের এক অভিনব পথ। কক্টেল, ডিনার পার্টির নামে কতোজনের যে ঘরের চাবি বদল হয়ে যায় সে খবরই বা কে রাখে? জনসংযোগের লোক হলে সে খবরও রাখতে হয়। বিশেষ করে বস্ যদি ভোগী হন তবে তাঁর চাহিদা মেটাতেই হবে। পিয়ারোকে তাই খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়। বিগ্-বসের চোখ কোথায়, কোন্ অ্যাংগেলে রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আর তাঁর চোখের টেলিস্কোপিক লেন্স কাকে ক্লোজ-আপে আনছে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতেই হয়। সবই ভগবানের ইচ্ছা। অথবা তাঁর লীলা। একজন যদি ভোগী হয়, অপরকে তখন ত্যাগী হতেই হবে। এ যেন একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সুবিধা মতো পত্নী বিনিময় অথবা বিনিয়োগ ভবিষ্যতের কর্মজীবনকে উজ্বলতর করে তুলবে সে হিসেব কষা আছে এনজিনীয়র সাহেবদের।

মনোরমা মহাজন তিন সন্তানের জননী। বয়স মধ্য গগনে। চীফ এনজিনীয়র সাহেবের বিবাহিতা স্ত্রী। এক নম্বর ধর্মপত্নী এবং

গৃহকর্মে নিপুণা। বিশেষত্ব আরো আছে। বয়স মধ্যাকাশে বিচরণ করলেও যৌবনকে আস্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। পোষাকের চাকচিক্যে এবং প্রসাধনের সৌকর্যে এখনো অনেককেই মাতাল করে দিতে পারে সে। ক্লাবে মনোরমা দেবী সবারই মধ্যমণি, মক্ষিরাণী। সে যদি ইচ্ছা করে কোথাও চাড় ফেলে, তবে অবশ্যই বেশ বড়ো সাইজের রুই-কাতলা বড়শীতে তুলবে। এ ব্যাপারে তার তুলনা নেই। অদ্ভুত মাদকতা তার চাহনীতে। আচারিয়া সাহেব কেমন যেন বিচলিত হয়ে ওঠেন মনোরমাকে দেখলেই। মিসেস্ আচারিয়া স্বামীর এই খাব-খাব ভাব একদম সহ্য করতে পারেন না। ক্লাবেও আসেন না। আচারিয়া সাহেবের স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করে না। স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার হলেন কোম্পানীর সর্বেসর্বা। তাঁর ইচ্ছাই আদেশ। তাঁর হাসিতেই ফাঁসি।

হঠাৎই ক্লাব রুমের ইণ্টারকাম ফোনটা বেজে উঠলো। অ্যামোনিয়া প্ল্যাণ্টে কি যেন একটা ট্রাব্‌ল দেখা দিয়েছে। এক্ষুণি চীফ এনজিনীয়রকে যেতে হবে সাইটে। ডাক পড়লো মহাজন সাহেবের। এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সপোর্ট পুলের গাড়ী এসে হাজির। জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশ, প্ল্যাণ্ট চালু হওয়ার পর যেন সে সাইট ছেড়ে ফিরে আসে। এদিকে সমস্যা দেখা দিল মনোরমাকে নিয়ে। অত বড়ো বাংলোতে সে একা একা কি করে থাকবে? নিশুতি রাত। বিপদের কতো সম্ভাবনা। দু-হাজার স্কোয়ার ফুটের বাংলোতে শুধু একজন প্রাণী। ছেলেমেয়েরা সবাই হস্টেলে। আর কাজ পাগল স্বামী পড়ে আছে সাইটে। প্রডাকশন শুরু হলে ফিরবে টাউনশীপে। এতো দীর্ঘ রাত কতোই না নির্জন নিঃসঙ্গ লাগবে মনোরমার। তাকে সঙ্গ দেবার জন্য আচারিয়া সাহেব বেরিয়ে পড়লেন। কারখানায় যাওয়ার নাম করে মহাজন সাহেবের খিড়কি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন তার বাংলোতে। মিসেস্ মহাজন একা আছে। ইণ্টারকামে আগেই প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। খিড়কী দরজা তথা শয়নকক্ষের দরজা খোলাই ছিল। সেদিক থেকে কোনো অসুবিধা হয়নি তাঁর। সে যাই হোক, সাব অর্ডিনেটের সুবিধা-অসুবিধায়, সুখে-দুঃখে জেনারেল ম্যানেজারকে একটু স্যাক্রিফাইজ করতেই হয়। আচারিয়া সাহেব বেশ তৃপ্ত পান

এই ধরণের আত্মত্যাগে। আত্মত্যাগ না বলে আত্মতৃপ্তি বলাই ভাল।

নিঃসঙ্গ রমণীকে সঙ্গ দেওয়া পুরুষের কর্তব্য। আর সেই তৃপ্তির তোওফা পায় চীফ এনজিনীয়র মিস্টার মহাজন। খুব শর্ট নোটিশে তাকে যেতে হয় পশ্চিম জার্মানীতে। কাজটা খুবই জরুরী। কি একটা কমপ্রেসার শিপ্‌মেণ্ট হবে ওখান থেকে। শিপ্‌মেণ্টের আগে একজন এনজিনীয়রকে সব বুঝে নেওয়া ভাল। গ্লোবাল টেণ্ডারের কাজ। ওয়ার্ক অর্ডারে এই চুক্তিই করা আছে। ইনস্‌পেকশন বিফোর শিপ্‌মেণ্ট। কর্পোরেট অফিস টেলেকস্‌ করেছে, সেণ্ড মিস্টার মহাজন টু হামবুর্গ। কমপ্রেসারের ওয়ার্কিং শিডিউলটা ভাল করে বুঝে নিয়ে যেন মাল জাহাজে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। আচারিয়া সাহেবও চান মিস্টার মহাজন এ দায়িত্ব পালন করুক। একটা ফরেন অ্যাসাইনমেণ্ট তো আর যাকে তাকে দেওয়া যায় না।

মিস্টার মহাজন হামবুর্গ পেঁছেছে যথাসময়ে। মাত্র দু-দিনের কাজ। তারপরই দেশে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু ওর পেঁছানোর পরদিন থেকে হঠাৎই পোর্ট অথারিটি স্ট্রাইক ডাকলো। মহাজন সাহেব যেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধর্মঘটকে পকেটে পুরে নিয়ে গেছে। হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্‌ টু-ডে, দ্য ওয়াল্ড থিংকস্‌ টুমরো্য। ইনডাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট। ওয়ার্ক-অর্ডারে একটি ক্লজ ছিল। শুধু শিল্পে অশান্তি দেখা দিলে ডেলিভারীর দিন পিছিয়ে যেতে পারে। বেশ ভালোই হলো। একেবারে সোনায় সোহাগা। একে তো ফরেন ট্যুর, তার ওপর দীর্ঘদিন বাধ্যতামূলক প্রবাসে থাকার সুবাদে বেশ মোটা অংকের ডেইলী অ্যালাউন্স। তাও আবার বিদেশী মুদ্রায়, ডয়েচ্‌ মার্কে। ডয়েচ্‌ মার্ক বিশ্বের বাজারে কুলীন মুদ্রা। ডলারের সহোদর বলা যেতে পারে এই মার্ক বাবাজীকে। তার উত্তাপই আলাদা। মিস্টার মহাজন অ্যামোনিয়া প্ল্যাণ্টের কমপ্রেসার শিপ্‌মেণ্ট করিয়ে দেশে ফিরলো। প্রায় চারমাস পর।

মিস্টার মহাজন এবং মনোরমার একমাত্র কন্যা টুয়া। সে থাকে

কোলকাতার এক ছাত্রীনিবাসে। সঙ্গীতে ভীষণ ঝোঁক। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রাচ্য সঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে তার গবেষণার বিষয়। ডক্টরেট করবে মিউজিকে। তাই নানা সম্ভাবনার শহর কোলকাতায় থাকা। মাঝে মাঝে মাতৃদর্শনে অথবা অর্থের প্রয়োজনে বিধাননগরে আসে। এবারেও সে এসেছে। বাবা বিদেশে তাই বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে যাবে এখানে। দুই দাদা থাকে উত্তর প্রদেশের আই-আই-টি শহরে। বাড়ী আসে খুব কম। ফোর্থ ইয়ারে বুন্দেলশহর, না কোথায় যেন ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে আছে। মা একা একা থাকে। তাই এবার এক সপ্তাহ কাটিয়ে যাবার পরিকল্পনা। প্রতি সন্ধ্যায় আচারিয়া সাহেব খোঁজ নিতে আসেন। এবং বেশ অনেকটা সময় কাটিয়ে যান মনোরমার সঙ্গে। টুয়া সব বুঝতে পারে। তবুও মায়ের নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে চেষ্টা করে।

সেদিন ছিল মনোরমার মান্থলি শাটডাউনের দিন। নারী হয়ে জন্মেছে পৃথিবীতে। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধিতা চলে না। আচারিয়া সাহেব আফিম খোঁরের মতো নেশাগ্রস্ত। সময় মতো নেশার বস্তু না পেলে কেমন যেন অসহায় বোধ করেন। নেশার কোনো বিকল্প নেই। নেশার সময় বিশেষ বস্তুটি চাইই। টুয়া অসতর্কতা বশতঃ আচারিয়া সাহেবের সঙ্গী হয়ে যায়। সেদিনের নৈশখেলার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সে। মা মনোরমার কোনো উপায় নেই। তার দেহের যন্ত্রটিকে অন্তত তিন-চারদিনের জন্য বিশ্রাম দিতেই হয়। আচারিয়া সাহেবের ঐ এক দোষ। নিজের কারখানা মাসের পর মাস শাট্-ডাউন। তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ ব্যক্তিগত যন্ত্রটিকে সদ্ব্যবহারের জন্য খুবই কর্তব্যপরায়ণ। এখানে ইউনিয়নের হামলার ভয় নেই। ষড়রিপুর তাড়নায় সে যন্ত্র সক্রিয় রাখতেই হয়। একবার টুয়ার স্বাদ পেয়ে মনোরমার দিকে আর তাকাতেও চান না তিনি। মনোরমা যে অভিযোগ করবে সে সৎসাহসও নেই।

মিস্টার মহাজন যখন পকেটভর্তি ডয়েচ-মার্ক আর ব্যাগভর্তি ফরাসী পারফিউম নিয়ে বাড়ী ফিরলো তখন সবাই আয়ত্বের বাইরে। সে দেখতে পেল স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার তার বাংলোর নৈশরক্ষী।

কি আর করা যায়? চাকরী তো করতে হবে এবং সে চাকরী এই জেনারেল ম্যানেজারের অধীনে। তাই পাহারাদারকে শাসন করার মানসিক শক্তি পেল না। পাহারাদার হানাদারের ভূমিকায় বেশ পাকাপাকিভাবে সেখানে খুঁটি শক্ত করে নিল। টাউনশিপের কেউ মুখ ফুটে বলতে পারে না কোম্পানীর থানাদার কি করে হানাদার হলো। প্রকৃতিই হয়তো পুরুষকে আকর্ষণ করেছে। আর মহাজন সাহেবের লম্বা বিদেশ সফর সেই ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়ক হয়েছে। সবই ঈশ্বর জানেন।

সার্বজনিক কারখানায় উৎপাদন নেই। টাউনশীপে জোর উত্তেজনা। মজদুর মহল খেপে উঠেছে। এ কী খেলা চলেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। একমাত্র সার কারখানার দিকে চাতকের মতো চেয়ে আছে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের চাষীরা। অথচ কারখানায় সার তৈরী হচ্ছে না। ব্যাটা জি-এম ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে। টাউনশীপের মধ্যে মাগীবাজী করছে। সংঘবদ্ধ কর্মীরা তা হতে দেবে না। কিছুতেই হতে দেবে না এই অন্যায় কাজ।

শালা আচারিয়া কো মারো আছাড়—বলে চিৎকার করছে লাল-ঝাণ্ডাবাহী সব কমরেডরা। জেনারেল ম্যানেজারের হাত-পা ভাঙ্গার কোনো ইচ্ছা নেই ট্রেড ইউনিয়ন দাদাদের। তারা এই কারখানার এক নম্বরকে মেরে ফেলতে চায়। পাকড়াও করো পলিটিক্যাল লীডারকো। স্থানীয় নেতা সদানন্দ সিং তো আগেই রেগেছিলেন আচারিয়া সাহেবের ওপর। এবার সেই ক্রোধে হলো ঘৃতাহুতি। লাল-পতাকার সঙ্গে ইউনিয়ন দাদারা উপস্থিত হলো নেতা দাদার কাছে। এই লাল ঝাণ্ডাই যে আচারিয়া সাহেবের কর্মজীবনে ডাণ্ডা হয়ে মাথায় পড়বে তা তিনি কল্পনাও করেননি। বাঙালী নিরীহ ছাঁপোষা সম্প্রদায়। ওদের একটু ধমকি, একটু হুমকি দিলেই অনুগত থাকবে। একথাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন বিধান-নগরে আসার পর থেকে। এখানকার শ্রমিকেরা এক জেনারেশনের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার। ওরা বুঝবে কি করে কর্তৃপক্ষের কৌশল। কিন্তু সদানন্দদা হলেন দিল্লীর দরবারে একেবারে ওপর মহলের লোক। বিধাননগরে বসেই একটি মাত্র এস-টি-ডি। বেচারা

আচারিয়াকে বদলী করিয়ে ছাড়লেন অন্ধ্রের গুন্টুর কারখানায়। খাও এবার তেলেগু-মার। এই না হলে নেতা। লোকে মানবে কেন? কমরেডরা টাউনশীপের পথে পথে বাজী ফাটিয়ে বিজয় উৎসব করলো। থ্রী চীয়ার্স ফর সদানন্দদা! হীপিপ……

দয়াল সাহেব সার্বজনিক কারখানার মুখ্যজনসংযোগ আধিকারিক। চীফ পাবলিক রিলেশানস্ অফিসার। অভিজ্ঞ লোক। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে জানেন। জি-এম সাহেব হঠাৎই বদলী হয়ে যাচ্ছেন অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর কারখানায়। তাড়াতাড়ি একটা বিদায় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করতে হয়। এটা জনসংযোগেরই কাজ। এক রাজা বিদায় নিচ্ছেন। বাট লঙ্ লীভ দ্য কিং। রাজার মসনদ অমর, অক্ষয় এবং অব্যয়। যুগে যুগে তাই তো রাজার জয়গান। জনগণ রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করে ঈশ্বরের কাছে।

আচারিয়া সাহেবের বিদায় সম্বর্ধনার পরিকল্পনা একটা করতেই হবে। এবং তা স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে। ডাক পড়লো সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মদনচন্দ্র মাহাতোর। সে আবার আরেক ঘষেটি অফিসার। একদা বিহারের এক কারখানায় কনিষ্ঠ কেরাণীর ভূমিকায় কাজে যোগদান। তারপর অভিজ্ঞতার অংক কষে এবং সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করে ওকে দেওয়া হয়েছে প্রমোশন। ঘষে ঘষে পদোন্নতি, তাই ঘষেটি স্যার। ওকে স্যার বলে সম্বোধনা না করলে গোসা হয়। অশোকের কানে মাঝে মাঝেই এ অভিযোগ এসেছে। একদিন সে স্বচক্ষে দেখেছে, দয়াল সাহেবের কাছে হুইস্পারিং টোনে বলছে।

বুঝলেন দয়াল সাহেব, দিনে দিনে অফিসারের মর্যাদা কমে এলো। আজকাল পুঁচকে অফিসারগুলো নতুন জয়েন করেই বসকে ডাকে মিস্টার বলে। হতো আমাদের সময়। স্যার বলে সম্বোধন না করলে সি-আর, মানে কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট, খারাপ হয়ে যেতো। অশোক কিছুতেই বুঝতে পারে না। এতে দোষের কি আছে? একজন শিক্ষিত লোক অপর এক ভদ্রলোককে মিষ্টার বলে সম্বোধন করছে। এতে শালীনতার অভাব কোথায়? দয়াল সাহেব অতি ধীরে ওকে বুঝিয়ে বলেন।

বুঝলেন মিস্টার মিট্রা, এটাই হলো ইনডাস্ট্রিয়াল কাল্চার। সব

কাল্‌চারেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কারখানার সংস্কৃতিতে স্যার বলে সম্বোধন করাটা অনেকটা ইষ্টদেবতা জপের মতো। দেবতাকে কেউ রুষ্ট করতে চায় না। ছেড়ে দিন ওসব প্রসঙ্গ। এখন আমাদের প্রধান কাজ জি-এমকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো। মিত্রের বিদায় বেদনাদায়ক। কিন্তু শত্রুর বিদায় অবশ্যই আনন্দদায়ক। আচারিয়া সাহেব আমাদের কোনো উপকার করেন নি। তবুও পিতার মৃত্যুতে পুত্রকেই মুখাগ্নি করতে হবে। এটাই চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। আপনি আর দেরী করবেন না।

প্লীজ কল মিস্টার মাহাতো। ওকে ডাকুন শীগগীর। ফেয়ার-ওয়েলের ব্যাপারে ও একজন একস্‌পার্ট।

শ্রীমান অশোক মিত্র দয়াল সাহেবের অনুগত সহকর্মী। কাল বিলম্ব না করে উপস্থিত হলো সিনিয়ার এ-ও মিস্টার মাহাতোর ঘরে। অশোককে দেখেই তার ব্যস্ততা বেড়ে গেল। ব্যস্ততার ভান অশোক বুঝতে পারে।

একস্‌কিউজ মী প্লীজ, দয়াল সাহেব আপনাকে ডাক্‌ছেন। ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

দয়াল সাহেবের সঙ্গে মাহাতোর খুবই ঘনিষ্ঠতা। অশোক লক্ষ্য করেছে দিনে বেশ কয়েকবার সে ওদের ঘরে আড্ডা দিতে আসে। পিয়ারো সাহেবের কল্‌ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাজির তাঁর অফিস ঘরে। অশোকও সেখানে উপস্থিত। পাশাপাশি চেয়ারে বসে। মদন মাহাতো কিছুতেই মুখ খুলছে না। কিসের যেন আড়ষ্টতা। দয়াল সাহেব ব্যাপারটা অনুভব করলেন। তাঁর ইশারায় অশোক ঘরের বাইরে চলে এলো চায়ের বন্দোবস্ত করতে। মাহাতো চা-পানান্তে নিজের ঘরে ফিরে চলে যাওয়ার পর অশোক তার বস্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিল।

আচ্ছা মাহাতো সাহেবের এই ইতস্ততার কারণ কি ?

ব্যাপারটা কিছুই না। দয়াল সাহেব বলতে শুরু করলেন। উনি একটু র‍্যাংক-কনশাস্‌। স্কেল মেনে চলেন। আপনি দু-স্কেল নীচের অফিসার, তাই জুনিয়ার অফিসারের সামনে কোনো পরামর্শ করতে অনিচ্ছুক। কোম্পানীর একটা ডেকোরাম আছে তো!

দয়াল সাহেব অনর্গল বলে চলেন এই র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইলের প্রজন্মের কথা। এদের কৃত্রিম আত্মসচেতনতার নানা কাহিনী।

পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে কোন্ এক অজ পাড়া গ্রামে ওর জন্ম। খুবই সাধারণ ঘরের ছেলে। পুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ না করে আফ্রিকার কোথাও জন্মালেও পারতো। গাত্রবর্ণে ভারতীয়ের তেমন কোনো লক্ষণ নেই। তখন পুরুলিয়া বিহারের অন্তর্গত। তাই আধা বাঙালী আধা বিহারী মিস্টার মাহাতো বাইলিঙ্গুয়াল। হিন্দী আর বাংলার সংমিশ্রণে তার ভাষা এক অভিনব হিন্দুস্থানী। কথার সুরে আদিবাসীর টান। অনেক কষ্টে ম্যাট্রিক পাশ করে পাশেই এক সার কারখানায় চাকরী জুটে গেল। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। কনিষ্ঠ কেরাণী হলেও শর্ট-হ্যান্ড, স্টেনোগ্রাফী ওর রপ্ত ছিল। সেই অভিজ্ঞতা ওর জীবনে আশীর্বাদের মতো কাজ দিল। বড় বড় সাহেবদের ডিক্টেশন নেওয়া, সময় মতো চিঠি টাইপ করে দেওয়া। শুধু তাই নয়। এই চিঠির গোপনীয়তা রক্ষায় ওকে বিগ বসের সামনে হাজির হতে হতো। অল্প সময়ের মধ্যেই মদন মাহাতোর ভাগ্যটা খুলে গেল। বাঘা বাঘা সব এনজিনীয়র ওকে ডাকে। কাজ দেয়। মাহাতোও নব উদ্দমে সবাইকে সন্তুষ্ট করে। বৎসরান্তে সি-আরে সবাই একস্‌সেলেণ্ট মন্তব্যসহ সই করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই মাহাতো জুনিয়ার অফিসার বনে গেল। ওর কাছে তাই চাকরী জীবনে র‍্যাংকটাই সবথেকে বড়ো। কোন্ অফিসার কোন্ গ্রেডে কাজ করে সেটাই তার প্রথম পরিচয়।

অশোক মনে মনে ভাবে, ব্যাটা কেলে ভূত, হয়েছে সাহেব। কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝাই যাচ্ছে। সার্বজনিক কোম্পানীর ভবিষ্যৎ আবহাওয়া কেমন হবে তা পরিমাপের জন্য মাহাতোর মতো ব্যারোমিটারই যথেষ্ট। এরা এক একটা স্যাম্প্‌ল। অশোক কিছুতেই বুঝতে পারে না দয়াল সাহেবের মতো সত্যি-কারের শিক্ষিত লোক এখানে কেন এলো।

ইংরেজরা শাসনযন্ত্রে সর্বদাই নবরক্তের সঞ্চার করতো। এবং সেই ট্রান্সফিউশন অফ নিউ ব্লাড আমদানী করা হতো প্রার্থীর পেডিগ্রী

দেখে। শোনা যায়, লণ্ডনে পুলিশের চাকরীতেও নাকি একই পদ্ধতি মেনে চলে ব্রিটিশরাজ। প্রার্থীর বংশ মর্যাদা দেখে পুলিশে চাকরী। কেননা পুলিশকে হতে হবে অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। জনসাধারণের সঙ্গে ভদ্রভাবে বাক্য বিনিময় করতে হবে। তারা হবে রাজার অনুচর। রাজার প্রতিনিধি। চলনে বলনে রাজকীয় আভিজাত্য দেখাতেই হবে। সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে সহানুভূতির সুরে। যেদেশে পুলিশের হাতে কোনো অস্ত্র নেই, এমনকি একটি লাঠিও নেই, আত্মরক্ষার জন্য তাদের অস্ত্রই হলো সদ্ব্যবহার। সমাজে শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশকে অমায়িক হতেই হবে। কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

ব্রিটিশরা চলে গেছে পাততাড়ি গুটিয়ে। রেখে গেছে স্বাধীনতার অভিশাপ। সবার সমান অধিকার। আদিবাসী থেকে শুরু করে সমাজের নীম্নবর্ণের সবাইকে বসাতে হবে সমাজের ওপর তলায়। তাও হবে আইন করে। ভালবেসে নয়। ভয় দেখিয়ে। মদন মাহাতো কি কর্তৃপক্ষকে ব্ল্যাকমেইল করেছে? না শুধু দর্শনেই সবার সমবেদনা কুড়িয়েছে। ওর আবার বিশেষত্ব হলো আচারিয়া সাহেবের সঙ্গে ভীষণভাবে ঘনিষ্ঠ। কে জানে, এরাই বড় কর্তাদের ইনফর্মার কি না? সার্বজনিক কোম্পানীতে দহরম মহরমও একটি আর্ট। এক ধরনের শিল্প। দয়াল সাহেবের মুখেই অশোক শুনেছে কি করে মদন মাহাতো সিনিয়ার এ-ওতে প্রমোশন পেয়েছে। একদম ফ্রম পভার্টি টু পাওয়ার। আঙুল ফুলে কলাগাছ।

আচারিয়া সাহেব পেশায় টেক্‌নোক্র্যাট হলেও অ্যাডমিনি-স্ট্রেশন ভাল বোঝেন। যে কারখানায় পাকা মাল, মানে এণ্ড প্রডাক্টস্‌, তৈরী হয় না সে কারখানার জি-এমকে একটু ডিপ্লোম্যাট হতেই হয়। কুটনীতির সাহায্যে অথবা অধস্তন কর্মচারীর পুজো পেয়ে তিনি বেশ ভোগী হয়ে উঠেছেন। ওঁর বড্ড আলুর দোষ। কারখানায় উৎপাদন হোক, আর নাই হোক, সারাদিন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ঝামেলা তো আছেই। সেইসব নেতাদের

সম্ভাষণের রীতি, সম্বোধনের ভাষা নার্ভ সিস্টেমকে বেশ সক্রিয় রাখে। সেই টেনশন্‌ রিলাকস্‌ করার জন্য চাই পর্যাপ্ত প্রোটিন। প্রয়োজন অ্যানিম্যাল প্রোটিনের। ও'র নারীমাংসে অরুচি নেই। ওটা ও'র প্রতিদিনের পথ্য। সাহেবের গাড়ীতে, যে গাড়ীতে তিনি সচরাচর যাতায়াত করবেন, কোনো মিরর থাকলে চলবে না। গাড়ীর ড্রাইভার শুধু সামনে তাকিয়ে গাড়ী চালাবে। ভুলেও যেন সে আয়নায় পেছনের ট্র্যাফিক লক্ষ্য না করে। বিশেষ করে জেনারেল ম্যানেজার সাহেব যখন লম্বা সফর করবেন তখন এটা তার মেনে চলতেই হবে।

বিধান নগর থেকে ধানবাদ যাবেন তিনি। অফিসের কাজে। প্রোগ্রাম সব ঠিক। কোন্‌ ড্রাইভার যাবে আর সাহেবকে রাতে সঙ্গ দেবার জন্য কাকে বলা হয়েছে ইত্যাদি দেখার দায়িত্ব থাকে মদন মাহাতোর ওপর। পরদিন ভোরে যাত্রা শুরু। তাই আগেরদিন অফিস আওয়ার্সের পর ডাক পড়লো মাহাতো সাহেবের।

ক্যা মাহাতোবাবু, সব ঠিক হ্যায়? দেখো ভাই, ড্রাইভিং সীটের সামনে কোই মিরর না রহে। গিয়া দফে ও শালা মণ্ডল বহুত বেইমানী কিয়া। ইউনিয়ন লীডার লোক কো সব বাতা দিয়া। ইস্‌ দফে সব পাক্কা বন্দোবস্ত হোনে চাহিয়ে। আচারিয়া সাহেব তাঁর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন মাহাতো-বাবুকে। সে তখন বিগলিত হয়ে সাহেবকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দেয়। তাঁর কোনো ভয় নেই। এবারের সারথীও নতুন, সঙ্গীও নতুন। আর আয়নাতে ছবি ওঠার কোনো সমস্যাই নেই। জি-এম স্পেশালে ভিউইং মিরর খুলে রাখা হয়েছে। গাড়ীর উইণ্ডো পুরোটাই মেঘ-কাঁচে আবৃত।

সাহেবের সফরের সব বন্দোবস্ত মাহাতো নিজে দেখে। তার তদারকিতে কোনো ত্রুটি নেই। মদন মাহাতো জানে আচারিয়া সাহেব শুধু জি-এম নন, এক টুকরো জেম। ইনডাস্ট্রিতে জি-এম হলেন ভগবান। সকাল-সন্ধ্যায় সময় মতো সেলাম দিলে অনেক উপকার। সাহেবের তুষ্টিতে অনেক প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দীর্ঘ-

দিনের অভিজ্ঞতায় মদনচন্দ্র জেনে গেছে জি-এমের তৃপ্তি মানেই তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। নবাগত অফিসারের কাছে গাম্ভীর্যের অভিনয় করতেই হয়। পদমর্যাদার মোহ, ঠাণ্ডা ঘরে বসার অহংকার তো শুধু অশোকের মতো জুনিয়ারদের দেখানোর জন্য। না হলে নবগতরা মানবে কেন?

দয়াল সাহেব তাঁর সাবলীল ভঙ্গিতে বলতে শুরু করেন আধুনিক শিল্পে সমঝোতার কথা। ম্যানেজার এবং ম্যাসেঞ্জারের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য থাকবেই। ঈর্ষা, লোভ, আক্ষেপ নিয়েই মানুষের জীবন। এসব কিছুকে চাপা দেবার জন্য সমঝোতার প্রয়োজন আছে। অশোক অক্লান্তভাবে বসের কথা শুনে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই সে দয়াল সাহেবের অভিজ্ঞতার আলোকে বিধাননগরকে চিনতে শুরু করেছে। অনেকটা চিনেও নিয়েছে। ভদ্রলোকের শুধু পাবলিক রিলেশনস্‌ই নয়, ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্সেও গভীর জ্ঞান। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আরম্ভ করে প্রায় ডজন খানেক শিল্পে কাজ করেছেন। অবশেষে সার্বজনিক কোম্পানীতে থিতু হয়ে বসেছেন। এখান থেকে অবসর নিতে চান। অত্যন্ত বিনয়ী এবং গুণী। কিন্তু তবুও তাঁর ভাগ্যে চীফ পাবলিক রিলেশানস্‌ অফিসারের পর কিছু জোটে নি।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করার পর সম্মানীয় অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে কেন যে জনসংযোগের চাকরীতে ঢুকলেন তা তিনি নিজেও জানেন না। এই কাজে তখনকার দিনে অতি সাধারণ লোককে বসানো হতো। বিগ্‌বস্‌কে ওম্যান অ্যাণ্ড ওয়াইন সরবরাহ করার জন্য শিক্ষিত পিয়ারোর দরকার নেই। তাই দেখা যেতো একদা যে ছিল গেস্ট হাউজ কীপার পরবর্তী জীবনে সেই অলংকৃত করেছে পিয়ারোর চেয়ার। কাজ তো শুধু কর্তৃপক্ষের খিতমতগারী করা। এ সফিস্টিকেটেড ইরাণ্ড বয় অফ দ্য নাম্বার ওয়ান। সমাজে হয়তো এমনই হয়। সবই রাশিচক্রের ফল। ভাগ্যের পরিহাস। গ্রাম্য প্রবাদে তাই হয়তো বলে, অতি বড়ো সুন্দরী না পায় বর আর অতি বড়ো ঘরণী না পায় ঘর।

দয়াল সাহেব সবাইকে সাহায্য করেন। প্রতিদানে সবাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে। তিনি একবার আচারিয়া সাহেবকে সখেদে বলেছিলেন, স্যার। এইসব গতকালের চ্যাংড়া ছোকরাগুলো একটা এনজিনীয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে এই কারখানায় ঢুকছে আর দেখতে দেখতে চীফ এনজিনীয়ার। আজকের জেট কালকের জি-এম। আমাদের শিক্ষার কি কোনোই মূল্য নেই ?

উত্তরে তিনি বল্লেন, ইউ সী মিস্টার দয়াল। এ হলো ইনডাস্ট্রি। এবং এখানে টেক্‌নোক্র্যাটদের মর্যাদা দিতেই হবে। অন্যরা ফালতু। একজন পিয়ারো চলে গেলে কারখানা চলবে। কিন্তু একজন টেক্‌নোক্র্যাট গোসা হলে সব উৎপাদন মার খাবে। তাই এখানে ওদের দাবড়ানি সহ্য করতেই হবে। দয়াল সাহেব উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করে নিয়েছেন। সবই জেনে গেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো মোহ নেই। আচারিয়া সাহেবের কথাগুলো নগ্ন হলেও সত্য। এবং তিনি তা মেনে নিয়েছেন। সেই সব কথাগুলোকে ঋষির বাণী বলে ধরে নিয়েছেন। তাই নিজের চাহিদা, অধিকার এবং এক্তিয়ার সম্পর্কে সতত সতর্ক থাকেন। একেবারে আনকোড়া বিলেত ফেরৎ অশোককে পেয়ে তাঁর খুবই আনন্দ। অনেকদিন পর একজন সত্যিকারের ছাত্র পেলেন। বন্ধু এবং অভিজ্ঞ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে তিনি প্রস্তুত। পরবর্তী প্রজন্মকে এইসব অভিজ্ঞতার কথা না বললে তারা শিখবে কোত্থেকে।

বুঝলেন, মিস্টার মিট্‌রা। এরা সব স্তাবকের দল। সস্তায় বাজীমাৎ করতে চায়। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না। এর আখের ভাল হয় না। বাইবেলের বাণীটি সর্বদা মনে রাখবেন, টু দাইসেলফ, বী ট্রুথফুল। আত্মানাং বিদ্ধি! নিজে সংযত থাকুন, নিজেকে জানুন। বেশ ভাল করে জানুন নিজেকে। শুধু দেখে যান। জেনে যান। কিন্তু খবরদার, মুখে প্রকাশ করবেন না। তবেই আপনি সুখী লোক। দয়াল সাহেব অনর্গল প্রবাহে বলে চলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

অফিসার্স ক্লাবের কক্‌টেল পার্টিতে বেশ হৈ চৈ। দিল্লীর কর্পোরেট অফিস থেকে এসেছেন সব হোমরা-চোমরার দল। সবই ভি-আই-পি। চেয়ারম্যান মিস্টার রাঘবন, ডাইরেকটর প্রডাকশন মিস্টার দেবদুলাল দত্ত আর জেনারেল ম্যানেজার পার্সোন্যাল কৃষ্ণকান্ত ভগৎ। ভগৎসাহেব আত্মভোলা ত্যাগী লোক। পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। অপরদিকে দেবদুলাল, সরি দত্তসাহেব, হলেন পয়লা নম্বরের ভোগী। ভোগ করতে ভালবাসেন। কর্মজীবনে অবসর নেবার সময় হয়ে এলো তবুও লোভ তাঁকে আঁকড়ে রেখেছে। এখনো কোথাও যুবতী মহিলা দেখলে মনটা ছুঁক ছুঁক করে।

সমাজের সর্বত্রই এক ইকনোমিক থিয়োরী কাজ করছে। চাহিদা এবং সরবরাহের এক অভূতপূর্ব সম্পর্ক। সব কারখানাতেই দু-একজন নবাগত এনজিনীয়র আছে যারা সস্ত্রীক দেখা করতে চায় বিগবসের সঙ্গে। ওরা আগেই জেনে গেছে, জীবনে কেরিয়ার তৈরী করতে হলে এমনটি করতেই হয়। তাছাড়া কোন স্ত্রী চায় না তার বর অল্প সময়ে সবাইকে টপকে উঁচু পোস্টে প্রমোশন পায়? অনেকটা সেই ক্ষুধিত সিংহের গল্পের মতো। সারা বনে অত্যাচার করা অপেক্ষা প্রতিদিন একটি করে পশু উপহার দিলে দোষ কি? ডেপুটি চীফ এনজিনীয়রের স্ত্রী মিসেস সর্বাধিকারী দেবদুলাল সাহেবের সঙ্গে রাত কাটিয়েও সেবার বলেছিল তার ভার্জিনিটির গল্প। স্বামীকে সে দিব্যি রেখে বলেছিল সে রাতের ঘটনা। গ্যারাণ্টি দিয়ে বলেছিল, রাতটা দীর্ঘ হলেও তার কোন দৈহিক ক্ষতি হয়নি। আসলে বুড়োর ক্ষমতাই নেই। ওঁর শুধু উলঙ্গ বাসনা। লালসার সীমা রসনায়। তবুও ট্যুরে এলে প্রতিরাতের জন্য চাই এক একটি উড়ন্ত পাখী। এই কারখানার স্বামীগুলোও যেন কেমন হাদা হয়ে গেছে। সাহেব খুশী হলে কর্মজীবনে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। আউট অফ টার্ন প্রমোশন এবং তৎসহ ফরেন ট্যুর অতি সাধারণ ব্যাপার।

দেবতার চরণে সেবাদাসীর ভূমিকায় অভিনয় করতেই হয় অনেক মহিলাকে। ব্যাপারটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তার ফল পাওয়া

যাবে আগামীদিনের উজ্বল এক অধ্যায়ে। মন্দ কি? আসলে পুরো ব্যাপারটাকে যারা স্পোর্টিভলী নেবে তারা জীবনকে উপভোগ করবে প্রাচুর্যে এবং পদমর্যাদার আরাম কেদারায় বসে।

অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারী অশোক মিত্র। একেবারে স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজারের মনোনীত প্রার্থী। জনসংযোগ আধিকারিকের প্রধান কাজ সেতুবন্ধন করা কর্তৃপক্ষ আর কর্মচারীর সঙ্গে। অথবা কোম্পানী এবং জনসাধারণের মধ্যে। সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোম্পানী ছ'শ টাকার বিনিময়ে পুষছে একজন ইয়েসম্যান। একটি জো-হুজুরের বাচ্চা। অশোকের ওপর দায়িত্ব রয়েছে দিল্লীর বড়কর্তাদের আপ্যায়ন করার। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় পরিবেশন থেকে শুরু করে ডিনার শেষে শয়নকক্ষে শুভরাত্রি জানানো তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

এই নেশার আসরেই মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় হলো অশোকের। ভদ্রলোক অনেকগুলো বিদেশী কোম্পানীতে সেলস্ ম্যানেজারের কাজ করেছেন। এবার এসেছেন সার্বজনিক সার কোম্পানীতে। মার্কেটিং ডিভিশনের আঞ্চলিক প্রধান। রিজিওন্যাল ম্যানেজার। এদেশের এটাই হলো বৈশিষ্ট্য। যে কারখানায় চলছে বন্ধ্যাত্ব, উৎপাদনের কোনো লক্ষণ নেই অদূর ভবিষ্যতে তার জন্যও চাই বিপণের বিশেষজ্ঞ।

সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ঠিকই বলে। সার্বজনিক কোম্পানীগুলো সরকারের জারজ সন্তান। বাবা থাকা সত্ত্বেও শাসন ক্ষমতা নেই তার হাতে। পার্লামেন্টের এম-পিরা হৈ হৈ করে উঠবেন। বাঁচাও বাঁচাও রব উঠে যাবে চারিদিকে কোথাও কখনো কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে। সবাইকে বাঁচাও। কর্মচারীকে বাঁচাও, তার অন্যায় আবদার শোনো। আবার শিল্পকেও বাঁচাও। শুধু মার দেশকে। নেহেরুজী কি এই দুর্দশার কথা ভেবেই সরে পড়েছেন পৃথিবী থেকে। তাঁর সামনে সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে তা তিনি নিশ্চয়ই চাইতেন না।

যে প্রতিষ্ঠানের বিক্রি করার মতো কোনো মাল নেই তার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে একজন মার্কেটিং ম্যান। সেই ম্যানেজারের

জন্য চাই হিমশীতল ঘর, বাতানুকুল গাড়ী এবং পোঁ ধরার জন্য একজন প্রচারবিদ। পাবলিসিটি অফিসার। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি তৈরী, যাকে বলে ইমেজ বিল্ডিং, এবং জনসংযোগ তথা ব্যক্তিত্ব প্রচারের নিমিত্ত চাই একজন স্মার্ট পিয়ারো-কাম-পাবলিসিটি অফিসার। সে প্রেসে মিডিয়াম্যানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে তার বস্‌কে। হিয়ার ইজ আওয়ার আর-এম, রিজিওন্যাল ম্যানেজার অফ বেঙ্গল। প্লীজ মীট মিস্টার গুপ্টা। অফিসার্স ক্লাবে প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই সে উঠেপড়ে লেগে গেছে অশোককে তাঁর ডিপার্টমেণ্টে বদলীর জন্য। এবং অবশেষে সে সত্যিই বিপণন বিভাগে যোগদান করলো। মিস্টার গুপ্টা হলো তার বস্। বিধান নগর কারখানার এক কনিষ্ট পিয়ারো রাতারাতি হয়ে গেল বিপণন বিভাগের পাবলিসিটি অফিসার। সার্বজনিক সার কোম্পানীর প্রচারবিদ।

*　　　*　　　*

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের শাহেন শা', দ্য জেনারেল মার্কেটিং ম্যানেজার। মিস্টার বিমল গঙ্গোপাধ্যায়। জি-এম মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায়, ওরফে গাঙ্গুলী সাহেব খুবই ব্যস্ত এবং বাক্-সর্বস্ব লোক। বক্তৃতা দিতে ভালবাসেন। সেই বক্ বক্ শোনার জন্য প্রয়োজন শ্রোতার। তাই তিনি মাসের মধ্যে আঠারোদিন ট্যুর করেন। রুটিন মাফিক বিধাননগরেও তাঁকে সফর করতে হয়। মানকরে তাঁর মামার বাড়ী। গ্রামটি জি-টি রোডের ওপর না হলেও এক কিলোমিটার ভেতরে এবং বিধান-নগরের পথে। মামাবাড়ীর আর্কষণে আর কর্তব্য প্রতিপালনের তাগিদে বিধাননগরের সফরসূচী একটু ঘন ঘন হয়। আর সেই সফরসূচী উইক এণ্ডে হলে আরো ভাল।

সপ্তাহান্তে কোম্পানীর কাজ এবং অকাজের ব্যস্ততার পর বিশ্রাম। অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের করের টাকায় কারখানার প্রতিষ্ঠা। সেই একই উৎস থেকে মার্কেটিং ম্যানেজার তথা জেনারেল ম্যানেজারের পেট্রোলের খরচ

উঠে আসে। তবুও তার হিসেব চাই। প্রতিটি খরচের নিখুঁত হিসেব দেখাতে হবে কাগজে-কলমে। তা দেখার জন্য আছে শ্যেনদৃষ্টি সম্পন্ন হিসেব-পরীক্ষক। ভবিষ্যতের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়াতে তাই প্রয়োজন সব যাতায়াতের সঙ্গে একটা অফিসিয়াল বিজনেস্ জুড়ে দেওয়া। গাড়ীর যাতায়াতের লগ-বুকটি যেন ছবির মতো থাকে। ড্রাইভার কর্মকারকে এ ব্যাপারে অনেক ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কর্মকার বিশ্বস্ত ড্রাইভার। সে সাহেবকে সদা নিরাপদে পেঁছে দিতে প্রস্তুত। সে জানে জি-এম সাহেবের ঘন ঘন বিধাননগর সফর মানেই কয়েক শ' লিটার পেট্রোলের ব্যবহার। যত পেট্রোল ব্যবহার হবে গাড়ীতে ঠিক সেই অনুপাতে গলিত সোনা প্রবেশ করবে তার পকেটে। যেখানে আছে প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা সেখানে নিমকহারাম হওয়া শোভা পায় না। মানকরে গাঙ্গুলী সাহেবের মামার বাড়ী। জি-টি রোড ধরে কতটুকুই বা পথ। কোলকাতা থেকে খুব বেশী হলে দু'শ কিলোমিটার। সকালে চা পান করে রওনা দিলে বিধাননগরের মাধুরীলতায় পেঁছতে মাত্র তিন ঘণ্টা। মাধুরীলতা গেস্ট হাউজেই ব্রেকফাস্ট। পুরো পথটাই অফিসিয়াল খরচে। আর খানাপিনা, তাও সার্বজনিক কোম্পানীর ঘাড় ভেঙ্গে।

গাঙ্গুলীসাহেবের মানকর সফরকে অফিসিয়াল করার জন্য বিধাননগরে একবার বুড়ি ছুঁতেই হয়। এখানেই বসেন আর-এম্। আর-এম্ অফিসে পেঁছেই তিনি ডেকে পাঠালেন অশোক মিত্রকে। নবাগত মিস্টার মিট্রাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন গুপ্তসাহেব।

স্যর, মীট আওয়ার নিউ পিয়ারো মিস্টার মিট্রা। খাস বিলেত থেকে পড়াশুনা করে দেশে ফিরেছে। অ্যান আইডিয়াল ম্যান অফ কমিউনিকেশন।

বাঃ বাঃ বেশ। লুক্স ভেরী স্মার্ট। গাঙ্গুলীসাহেব পরিচয়ের প্রথম পর্বেই সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন ওকে। অথবা এটা তাঁর ডিপ্লোমেসী কিনা তা অশোক বুঝতে পারলো না। এবার কাজের প্রসঙ্গ। জি-এমরা সর্বদাই কাজ পাগল হন। নাকি কাজের ভান করেন তা বলা মুস্কিল।

তিনি বল্লেন, মিস্টার মিট্রা। আই ওয়াণ্ট টু মীট দ্য প্রেস। প্লীজ অ্যারেঞ্জ।

গাঙ্গুলীসাহেবের এটাই বিশেষত্ব। তিনি সব সাব-অর্ডিনেটকে অর্ডার করেন। অনুরোধের সংজ্ঞা তাঁর জানা নেই। সব অফিসারই তাঁর অধস্তন। তাই তুমি বলার অধিকারও তাঁর আছে। স্টাইলটা পুরোপুরি জমিদারের। ইনডাস্ট্রিতে জি-এম যদি রাজা হন তবে ক্ষমতা বলে সব কর্মচারীই তাঁর প্রজা। প্রজা মানেই নীচু একটা সম্প্রদায়। ওয়ার্কিং ক্লাশ। তুই তোকারীর সম্পর্ক। অশোকের কাছে এই ব্যাপারটা, বিশেষ করে সম্বোধনের ইঙ্গিতটা, খুবই বিসদৃশ লাগে। সে যখন দেখলো বিপণন বিভাগের অন্যান্য সবাই গাঙ্গুলীসাহেবকে ভয় পায়, সমীহ করে তখন পুরো ব্যাপারটাই ধাতস্থ করে নিল।

গুপ্টা সাহেব ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মিস্টার মিট্রা, ডোণ্ট ওয়ারী। আসলে জি-এম সাহেব এসেছেন ভাগ্নীর বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে। যাবেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। সেই পোড়ামাটির দেশে, টেরাকোটার দেশে। সঙ্গীতের যাদুকর যদু ভট্টের শহরেই ভাবী জামাই থাকে। স্বনামধন্য সংস্কৃতির শহর থেকেই তিনি পাত্র নির্বাচনের মনস্থ করেছেন। পাত্রের খোঁজেই বিষ্ণুপুরের ভ্রমণসূচী। আর যাত্রাপথে মাঝখানে এই সাময়িক উৎপাত। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। ঘাড় থেকে এ ভূত নামাতে হবে। যে করেই হোক, একটা পুজোর ব্যবস্থা করুন।

শর্ট নোটিশে প্রেস কনফারেন্স করা কি চারটেখানি কথা? অশোক মনে মনে ভাবে, কি করা যায়? একি কোলকাতা যে টেলিফোনেই সব যোগাযোগ হয়ে যাবে। বিধাননগরের রিপোর্টাররা হলো পার্ট টাইম জার্নালিস্ট। কেউ হয়তো টেলেকস্ অপারেটার, আবার কেউ স্কুল মাস্টার। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, গাড়ী পাঠিয়ে সবাইকে একত্রিত করা কঠিন কাজ। আর-এমের ঢালা নির্দেশ, মেক ইট আ ওয়াকিং লানচ অ্যাণ্ড টক। দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে তাঁরা আসবেন। একটু খানাপিনার বন্দোবস্ত না থাকলে কিসের আকর্ষণ?

অশোক উত্তরে জানালো, তথাস্তু! তবে তাই হোক। লীভ ইট উইথ মী।

উদ্দেশ্য এবং উপলক্ষের মধ্যে নিরন্তর লুকোচুরি খেলা। গাঙ্গুলীসাহেবের মূল উদ্দেশ্য মীট দ্য প্রেস, না ওটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র তা বলা মুশ্কিল। অশোক অনুমান করলো তাঁর সেই বিধাননগর সফরকে অফিসিয়াল করার জন্যই একটা সাংবাদিক সম্মেলনের নাটক। নাটককে দর্শকের কাছে বাস্তবায়িত করতে হলে একটু আড়ম্বর করতে হয়। কৃত্রিম আড়ম্বরই তো অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তিনি বেশ ভাল জানেন বিধাননগর থেকে যে ডেস্‌পাচ যাবে তা কোলকাতার নিউজ ডেস্কেই পড়ে থাকবে। সেখানেও ধরাধরি। দাদা-মামা পাতানোর এক চক্র। সর্বত্র ক্যাচ্‌ থাকা চাই। একাজ তিনি কোলকাতার ঝাউতলা লেনের অফিসে বসেই করিয়ে নিতে পারেন। এজন্য সেখানে রয়েছে কাসিম মিঞা। এ ধরনের প্রেস কভারেজে সে একস্‌পার্ট। কোলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে, প্রয়োজনবোধে পদস্পর্শ করেও কয়েক সেণ্টিমিটার নিউজ সে বের করে দেবে। এজন্য কেয়াতলা গেস্ট হাউজের সাতাশ নম্বর ঘর সর্বদাই খালি রাখা হয়। কখন কোন্‌ রিপোর্টারের প্রয়োজন হবে তা ঈশ্বর জানেন।

সাংবাদিকদের সুখ-সুবিধা এবং প্রয়োজনের কথা ভেবেই গাঙ্গুলী সাহেব কাসিমকে অ্যাপয়েণ্ট করেছেন। ওর অন্য কোন কাজ নেই। অফিস আওয়ার্সে সবার সঙ্গে গল্পের মাধ্যমে খোঁজ রাখা কোথায় কি হচ্ছে। এবং যথা সময়ে সেইসব খবর বসের কানে তোলা। অপরদিকে বস্‌কে নামকরা এক ম্যানেজারের মর্যাদা কিভাবে দেওয়া যায় তার নানা ফন্দিফিকির করা ওর প্রধান কর্তব্য। গাঙ্গুলীসাহেবের স্পষ্ট নির্দেশ, দেখো বাবা কাসিম। কোনো সংবাদপত্রে যেন কোনো কেচ্ছা প্রকাশিত না হয়। যে দেশে চিঠিপত্র কলামে একটা মতামত ছাপাতে হলে খবরের কাগজের দাদা ধরতে হয় সেখানে তিন চার সি-এমের স্পেস পাওয়া ভাগ্যের কথা। জি-এম মিস্টার গাঙ্গুলী এসব ভালই জানেন। তবুও

জি-এম ইজ জি-এম। স্টাফের কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য একটু শো দেখাতেই হয়। তা না দেখালে ওরা মানবে কেন? পিয়ারোকে দিয়ে হঠাৎ এক প্রেস কনফারেন্স করানো তাঁর বিশেষ কায়দা। কায়দা দেখানোর ফয়দা তাঁকে তুলতেই হবে। তাঁর হুমকিতে অথবা ধমকানিতে সাব-অর্ডিনেটগুলো একটু নড়েচড়ে বসুক। সার্বজনিক কোম্পানীর জি-এমকে এধরনের ভড়ং দেখাতেই হয়। সাংবাদিকদের কাছে এ তাঁর সবিনয়ে অভিনয়।

মাধুরিলতা গেস্টহাউজে বিশাল কর্মযজ্ঞ। মার্কেটিং ডিভিসনের জেনারেল ম্যানেজার সাংবাদিক সম্মেলন করছেন। বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি নেই। খানাপিনার অঢেল ব্যবস্থা। আছে মনপসন্দ ড্রিংকস্। কেউ আছেন চীলড বীয়ারের ভক্ত, আবার কেউ বা স্কচ্ হুইস্কিতে তুষ্ট। সাংবাদিক সম্মেলনের এটাই হলো গণেশ পুজো। গাঙ্গুলী সাহেবের প্রেস কনফারেন্স পর্বতে মূষিক প্রসবের রূপ নিল। দেখা গেল মাত্র তিনজন স্থানীয় সাংবাদিক এলো। তাদের মধ্যে আবার দুজন লিট্ল ম্যাগাজিনের প্রতিনিধি। বাংলায় লেখে।

আরে, বাংলায় খবর পড়বে কে? কর্পোরেট অফিস দিল্লীতে ক্লিপিং পাঠানোর জন্য প্রয়োজন ইংলিশ ডেইলীর কাটিং। অশোক কিছুতেই জি-এম সাহেবের রুচিমতো বন্দোবস্ত করতে পারেনি। ব্যবস্থা হয়েছে তিরিশজনের। কিন্তু কোম্পানীর মাননীয় অতিথি মাত্র তিনজন। তবুও মানরক্ষা। এতো শর্ট নোটিশে তিনজনকে হাজির করা গেছে তাই বা মন্দ কি?

প্রথমে পানীয় সেবনের পর আলাপ এবং অবশেষে দু-একটি অফিসিয়াল কথা। যে কারখানায় এখনো প্রসব বেদনা ওঠেনি তার আবার উৎপাদন কাহিনী। জি-এমও ভয়ে ভয়ে মেপে ঝেপে কথা বল্লেন। আসলে বলার মতো তেমন কোনো খবরই নেই। তবুও লোকজন ডাকতে হয়। জেনারেল ম্যানেজারের অস্তিত্বের কথা সবাইকে জানাতে হয়। বেচারা পিয়ারোকে জন-সংযোগ তথা মিডিয়া সংযোগের আদিখ্যেতা দেখাতে হয়। কুজোরও ইচ্ছে হয় চিৎ হয়ে শুতে। সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত

কথাবার্তার পর চর্বচোষ্য সবকিছুর সদ্ব্যবহার হলো। আহারান্তে পত্রিকাবাবুদের ডেরায় পেঁছে দেবার জন্য হাক ডাক। এবং গাঙ্গুলীসাহেবও বিষ্ণুপুরের দিকে এগোতে থাকেন। সূর্য ডোবার আগেই সেখানে পেঁছতে হবে। ব্যারেজ পার হলেই বরজোড়ার জঙ্গল। জায়গাটা তেমন সুবিধার নয়। মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে ডাকাতি হয়। তাই সন্ধ্যার আগেই গন্তব্যস্থলে পেঁছে যাওয়া নিরাপদ। এদিকে গুপ্তসাহেবও ভাবছেন, বিদেয় হোক আপদ। কেটে যাক বিপদ।

গাঙ্গুলীসাহেব কোলকাতায় ফিরে তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারী মিস্টার ধরকে ডেকে পাঠালেন। পরমুহূর্তেই ডেকে পাঠালেন ডক্টর বিকিরণ ভট্টাচার্যকে। বিকিরণ সাহেবকে সামনে বসিয়ে জি-এম সাহেব ডিক্টেশন দিলেন ধরকে।

ফ্রমঃ জি-এম, এম-ডি, ক্যাল।

ফরঃ মিস্টার গুপটা, আর-এম, বেঙ্গল।

টেলেকস্ মেসেজে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, সেণ্ড মিস্টার অশোক মিট্রা, পি-আর-ও, টু ক্যালকাটা। ইমিডিয়েট।

হঠাৎই টেলেকস্ পেয়ে বিধাননগরের সবাই চমকে গেল। আশ্চর্য হওয়ার কথাও বটে। অশোক সম্প্রতি যোগদান করেছে বিপণন বিভাগে। ওর আবার কি দোষ দেখলেন জি-এম সাহেব। ডেকেই বা পাঠালেন কেন? নানা মুখে নানা জল্পনা কল্পনা। পরদিন ভোরে কোল্ডফিল্ড একস্প্রেসে অশোক রওনা দিল রাজধানী শহরে। কোলকাতায়। এ হলো ওর জীবনের প্রথম ভ্রমণসূচী। কোম্পানীর খরচে, আরামে এবং আয়াসের সেই যাত্রা।

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে সোজা ঝাউতলা লেনের অফিসে। অশোক প্রথমেই দেখা করলো গাঙ্গুলী সাহেবের সঙ্গে। পকেটে আছে পরিচয় পত্র, জি-এমের টেলেকস্ কপি। জি-এম সাহেব তখন ইন্টারকামে কথা বলছিলেন। ও প্রান্তে তাঁর নেক্সট ম্যান ডক্টর ভট্টাচার্য, বিকিরণ ভট্টাচার্য। ওঁর সঙ্গেই কথা হচ্ছিল বিপণন বিভাগের প্রচার পরিকল্পনা নিয়ে। সামনে দণ্ডায়মান

অশোক। ওকে দেখে বিকিরণসাহেবকে ডেকে পাঠালেন তাঁর চেম্বারে। অশোক তখন প্রমাদ গুণছে। কোথায় কি ভুল হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে তা কে জানে ?

বিকিরণসাহেব তখন অশোকের পাশে দাঁড়িয়ে। হাতের ইশারায় দুজনকেই বসতে বললেন বস্। উভয়ের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে সামনের দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তারপর শুরু করলেন।

বুঝলে হে বিকিরণ। আমি এই ছেলেটির কথাই বলেছিলাম। বেশ স্মার্ট। কর্মতৎপর পিয়ারো। অল্প সময়ের নোটিশে এক মনোজ্ঞ সাংবাদিক সম্মেলন করিয়ে দিল। তাও আবার বিধান-নগরের মতো অজ পাড়াগায়ে। আমাদের এখানে, আই মীন কোলকাতায়, ওকে নিয়ে এলে কেমন হয় ?

কিন্তু স্যর, এখানে তো আধডজন পিয়ারো রয়েছে। অন দ্য টপ অফ দ্যাট, আরো একজনকে নিয়ে আসা কি ঠিক হবে ? ডকটর ভট্টাচার্য বলে গেলেন এক নিঃশ্বাসে।

আরে ছাড়ো ওদের কথা। একেবারে অপদার্থ। গাঙ্গুলীসাহেব বলে চলেন, ওরা কিচ্ছু কাজ জানে না। শুধু ব্যস্ত আছে অফিস পলিটিকস্ নিয়ে।

বিকিরণসাহেব বসের এই উক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তবুও কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। মিষ্টার মিট্রার বদলীর অর্ডার সেইদিনই টাইপ হয়ে গেল। একই চিঠিতে দুনম্বর প্যারাগ্রাফে দ্বিতীয় আদেশ। কাশিম মিঞার অর্ডার। হি ইজ ট্রানসফারড ফ্রম ক্যালকাটা টু বিধাননগর। অশোক সেই অর্ডার হাতে নিয়েই বিধাননগর ফিরে এলো। কিন্তু গুপ্তসাহেব ওকে ছাড়তে নারাজ। তিনি ওকে রিলিজ করতে অনিচ্ছুক। কোথায় যেন এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। গুপ্তসাহেবও ঝেড়ে কাশছেন না। তবে অশোককে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, একটু ধৈর্য ধরুন।

রিজিওন্যাল ম্যানেজার গুপ্তসাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন অশোককে। হঠাৎ বদলী এবং তার জায়গায় কাশিম মিঞার আগমণ এসব

তিনি পছন্দ করেন না। গুপ্তসাহেব ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেন।

সরি, মিষ্টার মিট্রা, আপনাকে ছাড়া যাবে না। গাঙ্গুলীসাহেব কোলকাতা থেকে এসটিডিতে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন মিত্রাকে এখন ছাড়া যাবে না। ওর অনেক অসুবিধা। মিসেস মিত্রা আছে ম্যাটার্নিটিতে। ওর চার চারটি শিশু সন্তানকে দেখার কেউ নেই। আসলে ব্যাপার কি জানেন? সবই জি-এম সাহেবের গিমিক। কাশিম হলো বড়ো সাহেবের খুব কাছের লোক। পেয়ার কা আদমী। কসবায় বাড়ী করার সময় গাঙ্গুলীসাহেবকে প্রভূত সাহায্য করেছে কাশিম। জি-এমের বাড়ী তৈরীর তদারকির জন্যই তো ওর চাকরী। নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করে ওকে ঢোকানো হয়েছে বিপণন বিভাগে। সর্বঘটে কাঁঠালী কলা পিয়ারো হিসেবে ওর কাজ। ওর প্রধান কাজ ছিল সাহেবের বাড়ী তৈরীর তদারকি করা। কোথায় ইট, সিমেণ্ট পাওয়া যায়, কতো সস্তায় বালি-সুরকি কেনা যায় এইসব কাজের তদ্বির করা ছিল কাশিমের চাকরী। ইন ফ্যাক্ট, কসবাতেই ছিল ওর ক্যাম্প অফিস।

বিপণন বিভাগে কাজ করার এই এক সুবিধা। দশটা-পাঁচটায় হাজিরা খাতায় সই করার ঝামেলা নেই। অফিসাররা নিজেদের পকেটে রাখে অ্যাটেণ্ডেন্স কার্ড। এবং মাস অন্তে তা জমা দেয় অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেন্টে। কবে, কোথায়, কি কাজ করলো তা কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। কাশিমের পা চাটা স্বভাব ছিলই। কসবায় গাঙ্গুলীসাহেবের নায়েবগিরি করে ওর অনেক সুবিধা হলো। বাড়ীর কনস্ট্রাকশন শেষ আর ওর হাতে প্রমোশনের অর্ডার। এসব আগে প্রাইভেট কোম্পানীতে হতো। জমিদারীতেও দেখা যেতো। সার্বজনিক কোম্পানীতেও হচ্ছে। এ হলো এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব। জেনারেল ম্যানেজার্স প্রেরোগেটিভ। অশোক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রশ্ন করেছিল।

তা কি করে সম্ভব? একজন জনসংযোগ অফিসার হয়ে বসের ব্যক্তিগত হুকুম তামিল করলো? অশোকের স্পষ্ট মনে পড়ে

ইণ্ডিয়া হাউজের রিডিংরুমে সে ইংলিশম্যান পত্রিকায় দেখেছিল, ক্যাণ্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ ফ্লেয়ার ফর রাইটিং। বাড়ী তৈরীর সাইটে বসে থেকে কাশিম প্রমোশন পেল ? লেখালেখির ব্যাপারটা তবে কি সবই বুজরুকি।

গুপ্তসাহেব বল্লেন, তাতে কি আছে ? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এই প্রতিষ্ঠানের এটাই তো এক অন্ধকারময় অধ্যায়। জি-এমরা সখে অথবা নিজের সুখের জন্য ইচ্ছা করলেই এ ধরণের দু-একটি পদের সৃষ্টি করতে পারেন। সেই পদে কে বসবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তাঁর খেয়ালের ওপর। প্রমোশন, মানে বিভাগীয় পদোন্নতি, তো অতি সাধারণ ব্যাপার। গুপ্তসাহেব যেন নাটকের মনোলগ করে গেলেন। অশোককে কোলকাতায় পাঠানো সম্ভব নয় সেই বক্তব্য রাখতেই গাঙ্গুলী সখা কাশিমের পর্বটি নিয়ে এলেন। অশোক তখনো বুঝতে পারছে না কাশিমের বিধাননগর আসা, বা না-আসার অন্তরালে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। আসলে গুপ্ত-সাহেব মনেপ্রাণে চান না যে কাশিম মিঞা বিধাননগরে রিপোর্ট করুক।

জীবন নাটকে কিছু কিছু ঘটনা হঠাৎই ঘটে যায়। গুপ্ত সাহেবের বেলাতেও তাই হলো। অশোকের বদলী, কাশিমের বিধাননগর ভীতি এসবের চাপান উতোর চলাকালীন একদিন এক চিঠি পেলেন গুপ্ত সাহেব। কর্পোরেট অফিসের নির্দেশ তাঁকে যেতে হবে গুয়াহাটি। বদলী হলেন বটে কিন্তু সহসা বিদায় নিলেন না। ঝাউতলা অফিস থেকে ট্রাংককল, টিপি এম্ বার্তা লেগেই আছে।

গাঙ্গুলী সাহেবের এক জিজ্ঞাসা। গুপ্ত, তুমি কবে যাচ্ছ আসামে।

সেখানে তখন বঙ্গালখেদা আন্দোলন চলছে। কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী বিদেশী বর্জনের তথা বিতাড়নের নামে নিপীড়ন চালাচ্ছে বঙ্গসন্তানের ওপর। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম অনুপ্রবেশ-কারীকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর নামে চলছে এক তোলপাড় কাণ্ড।

বহু বছরের বাসিন্দা প্রকৃত আসামবাসীকে আন্দোলনের নামে আক্রমণ চালাচ্ছে অ গ প বিপ্লবী বাহিনী। বিতাড়িত আসামীদের একমাত্র অভিশাপ তারা বাংলাতেও কথা বলে। আসাম আসামীদের স্লোগানে বহু বঙ্গপুঙ্গব নিজদেশে পরবাসী। আসাম যখন আগুন নিয়ে ক্রীড়ায় মত্ত ঠিক তখনই গুপ্ত সাহেবের বদলীর হুকুম এলো। একি তাঁর পরীক্ষা, না বিতাড়িত হওয়ার ইঙ্গিত? বিধাননগর তাঁকে ছাড়তেই হবে। স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজারের অর্ডার। সেই আদেশ অবমাননা চলবে না। অর্ডার মাস্ট বী অনারড।

সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বিপণন বিভাগকে আরো সতেজ, সক্রিয় এবং শক্তিশালী করতে হবে। দিল্লীর সরকার চাষীদের উপকারের জন্য নানা পরিকল্পনায় ব্যস্ত। নেতারা জেনে গেছেন আসল ভোটব্যাংক হলো ভারতের গ্রামে। সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গাঙ্গুলী সাহেব এক সেলস্ স্ট্র্যাটেজী দেখালেন। পূর্বাঞ্চলের দোর গোড়ায়, কৃষকের ঘরে ঘরে সার পেঁছে দেবার জন্য চাই আরো কর্মঠ যুবকের। এইসব যুবকেরা হবে কৃষিবিদ তথা সমাজ সেবক। দেশে নির্বাচনের আগে ভাওতা দিয়ে গাঙ্গুলীসাহেব তিন ডজন পোস্ট মঞ্জুর করিয়ে আনলেন দিল্লী থেকে। এই ছত্রিশটি পোস্টই থাকবে আর-এম বিধাননগরের অধীনে। জি-এম সাহেবের বাড়ীর রাঁধুনী থেকে আরম্ভ করে ভাগ্নীর গৃহ শিক্ষক সবাই লাইন দিয়ে অপেক্ষমান। শিকে ছিঁড়লো বলে। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরী মানেই সারা জীবনের আয়াসের আয়োজন। কোনো পরিশ্রম নেই, নেই কোনো দায়িত্ব। কাজে নেই কোনো ঝুঁকি। আর বিপদ যদি বা দেখা দেয় তবে রয়েছেন বিপদভঞ্জন গাঙ্গুলী সাহেব। মাস গেলেই এক গোছা অশোক স্তম্ভ। ঐ অশোক স্তম্ভই তো কর্মজীবনের দম্ভ।

বাঁধ সাধলেন গুপ্ত সাহেব। ওঁর সোজা কথা—আমার রাজত্বে কাজ করবে, আমার অধীনে থাকবে অথচ আমার কোনা মতামত থাকবে না। লোক নিয়োগ করবে জেনারেল ম্যানেজার। ঝাউতলা অফিসের আধিপত্য সহ্য করবো না। তাও কি কখনো

হয়? সাব অর্ডিনেটের কথা মতোই যদি অফিস চালাতে হয় তবে জেনারেল ম্যানেজারের প্রয়োজন কি? বেশ কিছুদিন ঝাউতলা বনাম বিধাননগরের বাক্য বিনিময় হলো। মান, অভিমান, মন কষাকষি সবই চলছে। ইতিমধ্যে কোলকাতা থেকে এক ডজন নব্যযুবক অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার নিয়ে উপস্থিত আঞ্চলিক কার্যালয়ে। অবশেষে সিক্সটি ফরটি অনুপাতে একটা রফা হলো গাঙ্গুলী সাহেবের সঙ্গে। জি-এম মিস্টার গাঙ্গুলী ব্যাপারটাকে হজম করতে পারলেন না। অসীম তাঁর ক্ষমতা। বাংলা বিহার উড়িষ্যা তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চলের একচ্ছত্র ভূপতি তিনি। একজন বখাটে আর-এমকে বদলী করা তাঁর কাছে নস্যিতুল্য ব্যাপার।

বৃন্দাবন ঘোষ, ওরফে বিজি, বিধাননগর আঞ্চলিক অফিসের সেলস্ ম্যানেজার। গাঙ্গুলী সাহেব বিজিকে তাগিদ দিচ্ছেন চার্জ বুঝে নেওয়ার। গুপ্তকে যত তাড়াতাড়ি তাড়ানো যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু মিস্টার গুপ্ত নিতান্তই নির্বিকার। বদলীর চিঠি পকেটে পুরে তিনি জি-এমকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

স্যার রিজিওনটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। বৃন্দাবনকে দায়িত্ব দেবেন না। ও হলো এক পাঁড় মাতাল। ময়নাগুড়ির এরিয়া ম্যানেজার মেজর কাপুর প্রতি সপ্তাহে বোতল পাঠায় ওর কাছে। একজন ক্যুরিয়ার শুধু এই কাজই করে। বৃন্দাবনের আবার সিকিম-রাম ভীষণ পছন্দ। খাস গ্যাংটকের মাল না হলে ওর সন্ধ্যাটাই অন্ধকার। পুরো টাউনশীপে ওকে মালবাবু বলে ব্যঙ্গ করে। ঐ রকম এক মাতালের হাতে সে কিছুতেই চার্জ দেবে না। গুপ্ত সাহেব প্রতি সপ্তাহে একবার কোলকাতায় ট্যুর করেন আর গাঙ্গুলী সাহেবকে ভজানোর ফন্দি আঁটেন।

জি-এম এইসব অভিযোগ শোনেন এবং মাইকেলমধুসূদনের ভঙ্গিতে বলেন, বুঝলে বিকিরণ। আমার হলো উভয় সংকট। ওই যে লোকে বলে না—ভাগ্যবতীর দুটি পুত্। একটি বাঁদর, আরেকটি ভুত। আমারও সেই দশা।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের গো-স্লো ফর্মুলায় তিনটি মাস কেটে গেল। গুপ্ত সাহেব কখনো ছুটি নিয়ে, আবার কখনো ট্যুরে থেকে

নব্বইটি দিন কাটিয়ে দিলেন। দিল্লী থেকে সতর্কবাণী এসেছে। আসাম মাস্ট বী ম্যানড। গুয়াহাটিতে এখনো লোক যায়নি কেন? টেক অ্যাক্শন।

নেহেরুজী পরিকল্পিত সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে নেহেরু স্টাইল। কাশ্মীরে গণ্ডগোল। মুস্কিল আসান লালবাহাদুরজী। বিধান-নগরে সমস্যা তবে পাঠাও বিকিরণকে। বরফ গলাতে অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে ওঁর। আবার কাটা ঘায়ে প্রলেপ দেবার ক্ষেত্রেও পারদর্শী। অবশেষে ডক্টর বিকিরণ ভট্টাচার্য এলেন বাঁদর ও ভূতের লড়াই থামাতে। বিকিরণ সাহেব জুলিয়াস সীজারের কায়দায় ভিনি ভিসি ভিডি করলেন। বিধাননগর এলেন, গুপ্ত সাহেবকে দেখলেন আর তাঁর হৃদয় জয় করলেন। তিনি প্রকৃত কূটনীতিকের ভূমিকায় ছক কষে দেখালেন গুপ্ত সাহেবই পরবর্তী জেনারেল ম্যানেজার। বিপণন বিভাগের ত্রাতা হবেন তিনি।

গাঙ্গুলী সাহেব শিগগীরই চলে যাচ্ছেন দিল্লীর কর্পোরেট অফিসে। বৃন্দাবন প্লেসে তাঁর জন্য চেম্বার তৈরী হচ্ছে। পরবর্তী ডি-এম্, মানে ডাইরেকটর মার্কেটিং হবেন তিনি। তাই মাত্র দু-তিন মাসের একটা স্টপ্-গ্যাপ্ করতে হবে গুপ্ত সাহেবকে। ওখানে তিনি যাবেন শুধু মা কামাখ্যার আশীর্বাদ সংগ্রহ করতে। তাছাড়া সমগ্র পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা, আদিবাসীর আদিম শোভা দেখতে দেখতেই তিনমাস কেটে যাবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে এই স্টপ্-ওভার অ্যাট গুয়াহাটি হবে তাঁর কর্মজীবনের সবথেকে সুমধুর পর্ব। তার পরই কোলকাতার ঝাউতলা লেনের পয়লা নম্বর। সমগ্র পূর্বভারতের শাহেন শা। বিকিরণ সাহেব তাঁর কাছে আগামীদিনের ঘটনাগুলোকে স্বপ্নের তুলি দিয়ে এঁকে দিলেন।

গুপ্ত সাহেব রাজী। গাঙ্গুলী সাহেবের ওপর আক্রোশ থাকলেও আশা তাঁকে ভবিষ্যতের এক মোহনীয় জগতে নিয়ে গেল। বিকিরণ সাহেব যেন হঠাৎই দেবদূতের মতো আবির্ভূত হয়ে দৈববাণী শুনিয়ে গেলেন। গুপ্ত সাহেবের প্রস্থান মানে বৃন্দাবন ঘোষের প্রতিষ্ঠা।

বৃন্দাবন ঘোষ হলেন বাংলার আঞ্চলিক প্রধান। বিজি সাহেবও সেলস্ লাইনের লোক। কেনা বেচায় এবং ডীলারের মাথায় টুপী পরাতে ওস্তাদ। বিপণন পরিকল্পনায় পারদর্শী। অংকে আর্যভট্ট। দীর্ঘদিন বিপণন সংস্থায় কাজ করে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজী রেখেছেন নখদর্পণে। তবে দোষ মাত্র একটি। আর সবই তাঁর প্লাস পয়েণ্ট। কোনো ডীলার যদি ড্রিংকস্ অফার করে তবে তিনি কাদা। ওঁর আবার বিশেষ ব্র্যাণ্ডটি চাই। গতানুগতিক স্কচ্-ভদ্কায় অরুচি। শুধু জিনে ভক্তি। এক বোতল গর্ডন হলো তো কোথায় লাগে জনি ওয়াকারের ব্ল্যাক লেবেল। ঐ জিন দিয়েই তাঁকে জিতে নেওয়া যায়। তাঁর মন-পসন্দ্ জিনের বরাতটা আগেই জানিয়ে রাখে সেলস্ অফিসাররা। ওরা জানে, বিজি সাহেবের খাদ্যে অনীহা। উনি সলিড একদম পছন্দ করেন না। শুধুই তরলে ভাসতে চান। ঐ তরলেই সব ক্যালোরীর যোগান দেয়। সঙ্গী হিসেবে একটা সেদ্ধ ডিম আর কয়েক টুকরো ফিঙ্গার-চিপ্স হলেই যথেষ্ট। তবে জিন চাই পুরো বোতল। বোতলই ওঁর বিবেক, বোতলই ওঁর বন্ধু!

গুপ্ত সাহেব চলে গেলেন গুয়াহাটিতে। বৃন্দাবন ঘোষ হলেন বঙ্গের অধীশ্বর। সার্বজনিক সার কোম্পানীর আঞ্চলিক অধিকর্তা। রিজিওন্যাল ম্যানেজার। পদবীর সঙ্গে এলো পদমার্যাদার লোভ। আরাম তথা নানা আনুষঙ্গিক উপকরণ করলো অনুসরণ। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের এই এক বিশেষত্ব। কোন্ অফিসার কোন্ মাপের অথবা কোন ধাপের তা বোঝা যাবে তার সফরসূচীতে। সে ট্রেনের কোন শ্রেণীতে যাতায়াত করে, বাড়ীতে গাড়ী আসে কিনা এসব হলো তার মর্যাদার এক একটি অঙ্গ। বিজি সাহেব ছিলেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। প্রমোশন পেয়ে ট্রেনে উঠলেই এয়ারকণ্ডিশনড ক্লাশ। ফার্স্ট ক্লাশে বর্ধমানের নিত্যযাত্রীর অশোভন আচরণ সহ্য করা যায় না। ওদের উপদ্রবটা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ফার্স্ট ক্লাশের যাত্রীদের মর্যাদা দিতে জানে না। চেয়ারের হাতলে এসে বসবে। সেখানে জায়গা না থাকলে চেয়ারকারের ছোট্ট টেবিলে পা তুলে বসবে। শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝে চারমিনারের

ধোঁওয়া ছাড়বে ফুক্ ফুক্ করে। একেবারে যাত্রীদের নাকের ডগায়।

দেশ এখন স্বাধীন। আজাদ সবার জন্মগত অধিকার। তুমি বাবা কোম্পানীর পয়সায় ফাস্টো-কেলাশ হাকাচ্ছ তাই বলে যারা পকেটের পয়সায় মান্থলী টিকিট কেনে তারা কেউ ফালতু নয়। বরং তারাই সাহায্য করছে সরকারকে। ওরা সবাই জানে এরা সবাই ফকটিয়া বাবু। ভর্তুকী নেওয়া কোম্পানীর পয়সায় ফার্স্ট ক্লাশে চেপে মেজাজ দেখানো শোভা পায় না। বর্ধমানের সব নিত্যযাত্রীই জেনে গেছে বিধাননগরের কোটায় যারা যাতায়াত করে তারা সবাই ফুটোকার্ত্তিক। বিজি সাহেব রিজিওন্যাল ম্যানেজারের চেয়ারে বসে প্রথমেই ডাকলেন দিকপতি দাসকে। জুনিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিস্টার দাস জানে বস্ কি বলতে চাইছেন। সাহেবের মুখ খোলার আগেই সে বলে ফেলে।

স্যার। অনেক চেষ্টা করেও আপনার জন্য এ-সির টিকিট পাই নি। আমি লোক পাঠিয়েছি অ্যাসানসোলে। সেখানকার কোটায় টিকিট কাটবে। যদি ওখানেও না পায় তবে চলে যাবে ধানবাদ। ধানবাদের কোটায় এ-সি টিকিট পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আপনি কিছুছু ভাববেন না। আগামী কাল কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে আপনি অবশ্যই যাচ্ছেন কোলকাতায়। আর তা অবশ্যই বাতানুকুল কামরায়। ফাস্টক্লাশের ভীড় আপনার সহ্য হবে না।

বিপণন বিভাগে চাকরী অথচ ভ্রমণ নেই একথা ভাবাই যায় না। ভ্রমণেই আনন্দ, ঘুরে বেড়াতে কে না চায়? আর ভ্রমণ, মানে ট্যুরই, হলো আয়ের একমাত্র উপায়। ট্যাক্স ফ্রী ইনকাম। বিজি সাহেব ব্যস্ত থাকেন ট্যুর নিয়ে। যে ক'দিন হেড-কোয়াটার্সে থাকেন খুবই ব্যস্ত তিনি। সে একটা বিরাট নাটক। সবাই ব্যস্ততার অভিনয় করছে। সাহেব তাঁর চেম্বারে দু-মিনিট অন্তর কাউকে, না কাউকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। কখনো ঘরের বাইরে জ্বলছে ডু-নট-ডিস্টার্বের সংকেতবাহী লাল আলো। আর প্রায় প্রতিদিনই যাচ্ছেন ট্যুরিস্ট লজে, লানচে। আর-এম অফিসে ভিজিটিং অফিসার দু-একজন থাকবেই। তারা বস্‌কে লানচের

নিমন্ত্রণ করছে। ওরা বেশ ভালভাবেই জানে বিজি সাহেবের খাদ্যে অনীহা। তবে তরলে বিগলিত। বস্‌কে বিগলিত দেখতে কোন্ অধঃস্তন কর্মচারী না চায়?

লানচের পর অফিসে ফিরে কোনো কাজই হয় না। বিজি সাহেব তখন অচৈতন্য অবস্থায়। কখনো সিক্ হয়ে পড়েন। নিজের চেম্বারে বসেই বমি করে ফেলেন। সে এক নোংরা পরিস্থিতি। অফিসের বস্ মাল খেয়ে মাল বমন করছেন। ঘরের দুর্গন্ধ এয়ারফ্রেশনারের গন্ধকে পরাজিত করে সবার নাকের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। মেঝেতে পাতা কার্পেট ভিজে গেছে সাহেবের বমিতে। কিছুই বলার নেই। দিকপতি দাসের তখন দ্বৈত ভূমিকা। ডুয়াল রোলে সে ভালই অভিনয় করে। একদিকে বস্‌কে খুশী করার জন্য নিজেই টেবিল থেকে বমি মুছে ফেলছে। আবার ঘরের বাইরে এসে য়ুনিয়ন নেতাদের বলছে, আপনারা কিছু একটা করুন। এ একেবারে অসহ্য। যত সব মাতাল এসে জুটেছে এই কোম্পানীতে।

নেতারা চুপ। তারা জানে সবই। কিন্তু বলার কিছুই নেই। বিজি সাহেব হলেন গাঙ্গুলী সাহেবের পেটুয়া। তাদের সবার চাকরী হয়েছে দু-নম্বর লাইন ধরে। শুধু গাঙ্গুলী সাহেবের কৃপায়। এসব ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ঠিক হবে না। নেতারাও এক একটি পাপেট। সুতো রয়েছে জি-এমের হাতে। তিনি যেমন নাচাবেন তেমনি তারা নাচবে। ওদের বক্তব্য, বিজি সাহেব মাতাল হলেও বদ নয়। জমিদার নন্দনের বাঈজী নেশা আর মার্কেটিং অফিসারের মদ্যপান একটা স্ট্যাটাস সিম্বলের ব্যাপার। টাউনশীপের অনেকেই জানে, বৃন্দাবন ঘোষ মাতাল। তবে অন্য কোনো ভাইস্ নেই। অন্য কোনো পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শুধু জীবনের প্রথমেই যা ঘটে গেছে সে মাসুল তাঁকে বহুদিন বহন করতে হয়েছে।

বৃন্দাবন ঘোষ তখন সেভেন-ও-সেভেন তেল কোম্পানীর জাঁদরেল সেলস্ ম্যানেজার। শিলিগুড়িতে পোস্টিং। বিরাট বাংলো, প্রচুর মাইনে আর তৎসহ নোকর নোকরাণী আয়ার সার্ভিস। কিন্তু

মুস্কিল হলো বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বউটা বিয়িয়ে বসলো। পুত্র সন্তান প্রসব করেই অলকা ঘোষ আবিষ্কার করলেন বুকে তার মাতৃদুগ্ধের বদলে বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। নবজাতক পুত্রের দেখাশোনার জন্য এলো আয়া।

স্থানীয় চা বাগানের এক ডাক্তারবন্ধু পাঠালো রমলাকে। রমলা মদেশীয়া সম্প্রদায়ের লোক, ধর্মে খ্রীস্টান। সেবায় তার অদ্ভুত আনন্দ! বিজি সাহেবের বাড়ীর কালচারের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিল। ওকে দেখে সঠিক বয়স বলা মুস্কিল। তবে যৌবন যেন ঢলে পড়েছে সর্বাঙ্গে। পুত্রের দেখাশোনা এবং কচিৎ কদাচিৎ সাহেবের ছেটোখাটো দু-একটা ফাই ফরমাস করাই ওর কাজ। রোগ নির্ণয়ের পরই অলকাদেবী চলে এসেছেন কোলকাতায়। বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার আশায়। তিনমাসের জন্য আছেন সেখানকার নার্সিংহোমে। ক্যানসার এমনই রোগ যার নিরাময় শুধু দৈবের হাতে। ক্যানসার ডিটেকশন সেণ্টার কাম নার্সিং হোমটি সবার বিশেষ পরিচিত। সবাই চেনে, জানে এবং দূর দূরান্ত থেকে রোগীরা আসে এই রোগের হাত থেকে বাঁচতে। মিসেস্ ঘোষকে এখানেই রাখা হয়েছে তাঁর চিকিৎসার জন্য। পরিবারের সবার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে।

পুত্রসহ বিজি সাহেব থাকেন নর্থবেঙ্গলে, শিলিগুড়িতে। একজন বিবাহিত লোক, স্ত্রী তার অসুস্থ। আয়া দেখাশোনা করছে নবজাত শিশুপুত্রকে। তিন মাস দীর্ঘ সময়। ডক্টর বলেছেন, প্রথমে একটানা তিনমাস থাকতেই হবে। অপারেশন, বায়োপসি, রে-ট্রিট্মেণ্ট করতে কমপক্ষে তিনমাস লাগবেই। তারপর নিজের ভাগ্য আর ভগবানের হাত। একজন নবিবাহিত পুরুষের পক্ষে তিনমান দীর্ঘ সময়। শুধুই প্রতীক্ষা। প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। স্ত্রী অলকার সুস্থ হয়ে ওঠার, স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই। আর সুস্থ হলেও সে ফিরে আসবে এক উদ্ভিদের ভুমিকায়। নব বিবাহিতা নারীর আকর্ষণ থাকবে কি তার দেহে? অলকাদেবী কোলকাতার নার্সিং হোমে দিন গুনছেন। শিলিগুড়ির বিরাট বিশাল বাংলোতে বৃন্দাবন ঘোষ একা। নিঃসঙ্গ জীবনে উদভ্রান্ত যৌবনের দাপাদাপি। শিশু-

পুত্রকে দেখাশোনা করছে রমলা। তিনমাস সত্যিই দীর্ঘ সময়। বৃন্দাবন ঘোষের জীবনে বড়ই বিড়ম্বনাদায়ক অধ্যায়। কোলকাতার নার্সিংহোমে অলকা দেবী চিকিৎসাধীন। তার বুকে বাসা বেঁধেছে কার্সিনোমা। হিমালয় পাদদেশে বসে রমলাও আবিষ্কার করলো তার শরীরে নানা পরিবর্তন। কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, কেমন করে ঘটে গেল এই দুর্ঘটনা তা শুধু রাতের অন্ধকারই জানে।

বৌদিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রমলাকেও নিয়ে আসা হলো কোলকাতায়। শিশুপুত্রকে একবার মাতৃদর্শন করাতেই হয়। শিশুসহ আয়া চলে এলো কোলকাতায়। বিজি সাহেব প্রথমেই ওকে ভর্তি করিয়ে দিল সি-ডি নার্সিং হোমে। দক্ষিণ কোলকাতার এই নার্সিং হোমের বিশেষত্ব হলো—কমফোর্টেবল্ ডেলিভারী। ডেলিভারী অথবা ডিস্পোজ যাই হোক না কেন ব্যাপারটা গোপন রাখার দায়িত্ব নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের।

সব হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভাববেন না মিস্টার ঘোষ। বল্লেন ডক্টর হেমাঙ্গ হালদার। তবে খরচটা কিন্তু নগদে দিতে হবে। এম-টি-পি আমরা করাই। এই ধরণের মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সী বর্তমানে আইনসিদ্ধ। কিন্তু রমলা ডিসুজা তো স্বামীর নাম দিতে পারবে না। তাই ব্যাপারটাকে আর রেকর্ড করতে চাই না। বুঝতেই পারছেন। যত জটিল কাজ করবো অথচ তার ওপর দিতে হবে ইনকাম ট্যাকস্। আপনি খরচটা নগদেই দেবেন। কেমন ?

বিজি সাহেবের বীর্য তখন মাথায় বিচরণ করছে। সব কিছুই মেনে নিতে হবে। সি ডি নার্সিং হোমে রমলার এম-টি-পি সহজেই সমাধা হলো এবং ফিরে এলো শিলিগুড়িতে। তারপর থেকেই বিজি সাহেব সংযত। অন্তত এ ব্যাপারে। এখন নেশা বলতে একটাই, এ বটল্ অফ্ জিন্। তবে তিনি শুধু জিন্ পাগল কেন সে রহস্য এখনো বিপণন বিশারদরা আবিষ্কার করতে পারে নি।

বিধাননগরে অসহ্য গরম। ছেচল্লিশ ডিগ্রীর গরমে শুধু মানুষ

কেন, সমস্ত প্রকৃতিও দগ্ধ হয়। যে জায়গা একদা ছিল নিবিড় অরণ্যে ঘেরা আর ডাকাতের ক্রীড়াভূমি আজ তা শিল্পোন্নতির গৌরবে বৃক্ষবিহীন। মার্চ মাসের শেষ থেকে সূর্যদেবের তাণ্ডব শুরু, এপ্রিল-মেতে তার উন্মত্ত যৌবনের প্রলয় নাচন। গ্রীষ্মকালে বিধাননগর যেন আগুনের রাজত্ব। চারদিকে কলকারখানার ধোঁওয়া, ছাই, পলিউশন। শালবন শেষ। বৃক্ষের মাতৃভূমিতে বসেছে জনবসতি। যদিও বা একটু অবশিষ্ট ছিল শালবংশ কিন্তু তাদের সমূলে ধ্বংস করেছে কাঠুরিয়া সম্প্রদায়। তাদের কাছে আজকের চাহিদাই প্রবল। আগামীকালের কথা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবার সময় কোথায়? যে গাছ তার সম্পদে মানুষকে সজীব রেখেছে, পরিবেশকে রেখেছে সবুজ সেই গাছকেই সমূলে ধ্বংস করা হচ্ছে।

মানুষ সত্যিই কি অবুঝ। কাঠুরিয়ার দল আক্রমণ করছে মানুষের পরমবন্ধু বৃক্ষকে। বধ হচ্ছে বৃক্ষরাজি, প্রকৃতি হচ্ছে নিঃস্ব, রুক্ষ। বিধাননগরের প্রাণ আইঢাই করা গরমে অশোক খুবই কাবু হয়ে পড়লো। বিশেষ করে মে মাসটা সে কিছুতেই থাকতে চায় না বিধাননগরে। নতুন চাকরী। ছুটি নেই। মাঝে মাঝে সে ভাবে, দরকার নেই তার সার কোম্পানীর কাজে। ছুটি নেই তো কি হয়েছে? বিনা বেতনে অবসর কাটানোতে দোষ কি? দরকার নেই মাইনের। ভারী তো ছ'শ টাকার একটা চেক। তার জন্য মাসের তিরিশটা দিন খেটে মরার কোনো মানে হয় না। সে চললো সদলবলে, সপরিবারে দার্জিলিঙে।

পাহাড়ী আবহাওয়ায় এক মাস কাটিয়ে আবার প্রত্যাবর্তন। সেই দাবদাহের বিধাননগরে। অফিসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজি সাহেব তো রেগে আগুন, তেলে বেগুন। অশোককে কাজে যোগদান করতে দেনে না। কিন্তু সরকারী আইন এ বিষয়ে খুবই স্পষ্ট। যে কর্মচারী ছুটি নিয়ে হেডকোয়াটার্স ছেড়েছে তাকে কাজে পুনর্বহাল করতেই হবে। সবেতন অথবা বিনাবেতনে—যাই হোক না কেন চাকরী তার বজায় থাকবেই। মহা সমস্যায় পড়লেন রিজিওন্যাল ম্যানেজার। এভাবে তো আর অফিস চলে না। অশোক মিত্রকে শাস্তি না দিলে অন্য স্টাফরা তাঁকে মানবে না।

অফিস ম্যানার্স কিছুই শিখবে না। ডিউটি ইজ ডিউটি। কর্তব্য পালন হলো জহ্লাদের কাজ। তাকে নৃশংস হতেই হয়। প্রাণী হত্যাই যার পেশা তাকে নরম হলে চলে না। বিজি সাহেব গোপনে নোটশীট পাঠালেন কোলকাতায়, ঝাউতলা লেনের অফিসে। প্লিজ টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন এগেইনস্ট মিস্টার মিট্রা।

জেনারেল ম্যানেজার গাঙ্গুলী সাহেব তো সেই নোটশীট পড়ে একেবারে অগ্নিশর্মা। না, এই মাতালকে নিয়ে আর পারা গেল না। কোথায় একজন শিক্ষিত, রুচিবান ভদ্র পিয়ারোকে নিয়ে চুটিয়ে রিজিওন চালাবে, তা না করে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। জি-এম সাহেব ব্যাপারটাকে সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবার চেষ্টা করেন। এভাবে কি কোনো কাজ হয়? ও ব্যাটা মাতালটা বুঝতেই পারছে না জনসংযোগের লোক কতোটা ভয়ংকর হতে পারে। ওরা হলো ভয়ানক বিষধর। সেই বিষ যতক্ষণ গলায় ধারণ করে আছে ততক্ষণই মঙ্গল। যদি একবার সেই বিষ উদগীরণ করে ফেলে তবে বহু রথী মহারথীই ধরাশায়ী হবে। বিপদে পড়ে যাবে অনেক কেষ্ট বিষ্টু। ব্যাটা বিজিটা জানে না অশোকের সঙ্গে মিডিয়াম্যানদের কতো ঘনিষ্ঠতা। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থানীয় সব সাংবাদিকের সঙ্গে।

বিজি সাহেবের নোটশীট পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে ডেকে পাঠালে বিকিরণ সাহেবকে। ডক্টর বিকিরণ ভট্টাচার্য মুহূর্তে উপস্থিত জি-এম সমীপে। ওঁকে সামনে পেয়ে বড় সাহেব শুরু করলেন। শুনেছ বিকিরণ, ব্যাটা বিজির কাণ্ড। অত সুন্দর কাজের লোক অশোক, তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে ও। ইট ইজ নাথিং বাট ক্যানাইন ম্যাডনেস্। হি ওয়াণ্টস্ টু রিমুভ হিম ফ্রম বিধান-নগর। ওকে একদম পাত্তা দেওয়া চলবে না। ইগ্নোর দিস প্রপোসাল। পুট ইট ইনা কোল্ড স্টোরেজ। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের এই হলো মহিমা। সাব-অর্ডিনেট যখন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চায় তখন তাতে জল ঢেলে দাও। গিভ নো ইমপোর্টেন্স টু ইট। জি-এম হওয়ার অনেক হ্যাপা। আরে বাবা, শুধু চাইলেই তো হবে না। একজনকে বদলী করার অনেক ঝামেলা। আর যদি ব্যক্তিগত খেয়ালে বদলী করা হয় তবে তার জের চলবে দীর্ঘ

দিন। অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বেঁকে বসবে। আরে বাবা, আমাকেও তো চালাতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। বলে উঠলেন গাঙ্গুলী সাহেব। তাঁর সামনে উপবিষ্ট বিকিরণ সাহেব যথারীতি ভ্রূ স্পর্শ করে উত্তর দিলেন, তাই তো। তাই তো। এই উচ্চারণ তাঁর স্বগতোক্তি অথবা সমর্থন কিনা তা ঈশ্বর জানেন।

বৃন্দাবন ঘোষ বিধান নগরে বসে সময় গুণছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন গাঙ্গুলী সাহেব তাঁর নোটশীট ও-কে করবেন। অশোকের বদলী অনিবার্য। কিন্তু কোথায় বসাবেন অশোককে। ঝাউতলা অফিসে তিল ধারণের স্থান নেই। গাঙ্গুলী সাহেবের সমস্যা সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের। সেখানে ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই অবস্থা। আধ-ডজন পিয়ারো মাথা ঠোকাঠুকি করছে। তিনি বিজি সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। বরং উল্টো এক কৌশল অবলম্বন করলেন। অশোককে আর-এম অফিসে রাখার নির্দেশ দিলেন। এবং অপর এক সেলস্ ম্যানেজারকে পাঠালেন বিধাননগরে। লালতু চক্রবর্তী ওৎ পেতেই ছিল। মোহিত নগরে একটা বাড়ী করার সখ দীর্ঘদিনের।

ওর ভাগ্যে এবার শিকে ছিঁড়লো। ওকে পাঠানো হলো বিধান-নগরে। শ্রীযুক্ত লালতু চক্রবর্তী, ওরফে এল-সি এলো বিধাননগরে। শিল্পনগরের পাশেই মোহিতনগর। ওখানেই আছে এক ফালি জমি। বদলীর সুযোগে এবার বাড়ীটা করা সম্ভব হবে। মনে তার আনন্দের জোয়ার। রাজধানী শহরের ব্যস্ততা ছেড়ে এলসি এলো বিধাননগরের গরমে ভিজতে। শুধু গরমে ভিজতেই নয়। নিজের আখের গোছানোর ফন্দি মনে রেখে বিজি সাহেবকে ভিজিয়ে রাখতে তার পরিকল্পনা শুরু হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই এলসির ব্যবহারে বিজি সাহেব মুগ্ধ। এলসি বলতে তিনি পাগল। একবছরও লাগলো না, তার আগেই বিপণন বিভাগে এলসি-বিজি এক প্রবাদে পরিণত হলো। একেবারে মাণিকজোড়। একে অপরের পরিপূরক। একজন যদি হয় ঘা, তবে অপরজন তার মলম। এলসির বিধাননগর আগমন যেমন নাটকীয়, তার কথা-বার্তা তেমনি কাব্যিক। কারণে অকারণে শান্তিনিকেতনের

গুরুদেবকে স্মরণ করে সবাইকে বিস্মিত করে দেয়। মার্কেটিং-এর লোকেরা কেনাবেচায় পারদর্শী হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্যে এমন দখল দেখে সবাই তাকে নরম প্রকৃতির মানুষ বলে ভাবে। ওটা ওর বাইরের ভড়ং। অন্তরে একেবারে স্বার্থপর, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর। বিজিকে কি করে ভজিয়ে নিয়েছে সে ব্যাপারটা অনেকেই আলোচনা করে। বিজি সাহেব একদণ্ড এলসিকে চোখের আড়াল করতে চান না। ওকে দেখতে না পেলে অশান্ত হয়ে ওঠেন। পেচ্ছাপের বেগ এলেও তা ধরে রাখেন। কখন এলসি এসে ওর চেম্বারে বসবে সেজন্য অপেক্ষা করেন। এলসি এসে ওর সামনে বসলে তবে তিনি বাথরুমে যান।

কৃষি বিজ্ঞানের স্নাতক লালতু চক্রবর্তী। গুবরে পোকার সঙ্গে মাটির উর্বরাশক্তির সম্পর্ক কতোটা গভীর এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েছিল মাথাভাঙা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু গবেষণা শেষ করা হয়নি। হঠাৎই চাকরী জুটে যায় সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে। চাকরীর জন্যই পড়াশুনা। সেই চাকরীই যখন পকেটে তখন আর একটি চোথার জন্য সময় নষ্ট করে কি লাভ? গবেষণায় ইস্তফা দিয়ে সার বিক্রির কাজে লেগে গেল শ্রীমান লালতু। ওর বহুদিনের ইচ্ছা মোহিতনগরে একটা বাড়ী তৈরী করে দেশের লোককে তাক লাগিয়ে দেয়। কৃষিবিদরাও যে বিজ্ঞানী, সমাজে তাদেরও যে অবদান আছে তা প্রমাণ করার জন্যই তার এই স্বপ্ন। কোলকাতার অহংকার যদি সল্টলেক সিটি হয়, তবে বিধাননগরের সম্ভ্রান্তপল্লী হলো মোহিতনগর। বাড়ী যদি করতেই হয় তবে তা করতে হবে এই বনেদী পল্লীতে। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের এক দারুণ উদাহরণ এই মোহিত নগর। বিধাননগরের চাকরী জীবনে তাকে বাড়ী তৈরি শেষ করতে হবে। বিপণন বিভাগে কাজ করার এটাই তো এক বিশেষ সুযোগ। বিজি সাহেব ইতিমধ্যেই এক রাজ-প্রাসাদের মালিক। এবার এলসির পালা।

এলসি জানে বাজারের খবর। যে ডীলায় সার বিক্রি করে সেই আবার বেচে সিমেণ্ট। আর তার ভাই হলো ইট ভাঁটার মালিক। আসলে ব্যবসায়ীরা হলো একটি বিশেষ সম্প্রদায়। ওরা পুরো

বাজারটাকে এক পরিবারের মধ্যে রাখতে চায়। সব জিনিসের লেনদেনে একটা রফা হয়েই থাকে। মোহিত নগরের জমিটা বহু আগেই কেনা ছিল। এবার সেখানে ভিত্তি স্থাপনের বাসনা হলো লালতু চক্রবর্তীর। সে বরাবরই সাহিত্যের ভক্ত। শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি থাকার বাসনা তার আবাল্য পোষিত। বিশেষ করে, কর্মজীবনে অবসর গ্রহণের পর মোহিত নগরে একটা কোঠী থাকলে ক্ষতি কি? ঝুপরি মোড়ে একটা মনোহারী দোকান বেশ ভালই চলবে। দিন দিন যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে তাতে খদ্দেরের অভাব হবে না। ওখানে বসাতে হবে গৃহভৃত্য শিবুকে। ও সারাজীবন বাড়ীর বাসন মাজবে কেন? ওরও একটা ভবিষ্যৎ আছে। মোহিতনগরে বাড়ী, ঝুপরি মোড়ে দোকান আর ইচ্ছা হলেই একবার শান্তিনিকেতন ঘুরে আসা। এমন আদর্শ পরিকল্পনা লালতুকে মোহান্বিত করে রাখে।

শীতকালে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, বসন্তকালে দোলের উৎসব। চির আকর্ষণীর বসন্তোৎসব তাকে সর্বদাই হাতছানি দেয়। বিধাননগর থেকে বোলপুর। যাতায়াত কোনো সমস্যাই নয়। প্রতি আধঘণ্টায় বাস সার্ভিস। তাছাড়া যতদিন আছে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান ততদিন সফর কোনো সমস্যাই নয়। অফিসের কাজের জন্য রয়েছে দু-খানা অ্যাম্বাসেডার আর তিনখানা জীপ। সাদা গাড়ীটা তো শুধু রাখা আছে এলসি সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। দিকপতিবাবু জানে এলসি তুষ্ট মানে বিজি সন্তুষ্ট। তার মানেই স্বীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ। ড্রাইভার ভজন রায়কে বলা আছে। প্রতিদিন সকালে এলসি সাহেবের কোয়ার্টারে খোঁজ নিয়ে তবে অফিসে রিপোর্ট করার জন্য। মেম সাহেবের কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা সে খবর রাখতেই হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দিকপতিকে। বিপণন বিভাগে চাকরী আর দু-চারটা গাড়ী দৌড়োদৌড়ি করবে না, তাও কি কখনো হয়? বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভেবেই এলসি মোহিতনগরে গৃহনির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কোলকাতার একনম্বর স্থাপত্য বিশারদকে দিয়ে বাড়ীর প্ল্যান করানো হয়েছে।

বিধাননগরের পাশেই মোহিতনগর। নগর উন্নয়ন দপ্তরে বসিয়ে

রেখেছে সেলস্‌ অফিসার অভয় কিংকরকে। ওর কাজ হলো প্ল্যানিং অফিসারকে খুশী করে নক্‌শাটায় একটা 'ও-কে' ছাপ মেরে নেওয়া। বাড়ীর প্ল্যান পাস করাতে হলে নোটিফায়েড অফিসের বাবুদের চা-জলখাবার খাওয়াতেই হয়। সে ব্যবস্থা অভয় কিংকরই করবে। আপাততঃ পয়সাটা ওর নিজের পকেট থেকে দিলেও তা পরে উঠে আসবে দ্বিগুণ হয়ে। দরকার হবে একটা ফলস্‌ ট্র্যাভেলিং অ্যালাউন্স বিল দাখিল করা। যে সাহেবের জন্য সে এতটা করছে তাকে সেই বিল মঞ্জুর করতেই হবে। এলসি সব কিছুই জানে। এবং জেনেই অভয়কে এ দায়িত্ব দিয়েছে। সে জানে যতদিন আছে চেয়ার ততদিন থাকবে তার জোর। ইংরেজি প্রবাদটা স্কুলে পড়লেও তা' স্পষ্ট মনে আছে। মেক দ্য হে হোয়াইল দ্য সান শাইনস্‌। সময়ের সদ্ব্যবহার যারা করে না তারা এযুগে অচল। আর যারা সময় মতো গরম লোহায় আঘাত করতে সক্ষম তাদের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল, সুখকর এবং আনন্দদায়ক।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো বিপণন বিভাগে লালতুর আবির্ভাব। বেচাকেনা যেখানে প্রধান কাজ সেখানে শিল্পের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু সব নিয়মেরই আছে ব্যতিক্রম। সঙ্গীতে, নৃত্যে, অঙ্কনে বিশেষ ঝোঁক আছে এলসির। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে মনের শান্তি, আত্মার আরাম হিসেবে অনুভব করে সে। অত্যন্ত স্বল্পভাষী। তবে মনে যে টেন্‌শন আছে তা বোঝা যায় ঘন ঘন চারমিনারের আশ্রয় গ্রহণ করায়। বাড়ীতে সে আদৌ কোন নেশা করে না। সিগারেট একদম স্পর্শ করে না। কিন্তু অফিসের চেয়ারে বসলেই তাম্রকূটের ধোঁয়ার এক আবরণ সৃষ্টি করে। এত লোকজন, স্টাফ, বাবুর মাঝেও সে যেন একান্ত নিঃসঙ্গ। সঙ্গীতকে যে ভালোবাসে মন তার নরম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রতিটি মানুষই এক একজন ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড। গোলাপের সৌন্দর্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে কাঁটা। পাঁক আছে তাই পঙ্কজের জন্ম।

এলসির মনের অন্তরালে একটা কমপ্লেক্স্‌ সততই বিরাজমান। অশোক ওর আচরণে এবং আচম্‌কা কোনো মন্তব্যে তা অনুভব

করেছে। সঙ্গীতপ্রিয় লোকও যে কেমন স্বার্থপর, ঈর্ষাকাতর এবং ততোধিক ক্ষতিকারক হতে পারে সে পরিচয় অশোক পেয়েছে। আসলে অপরের ভালোকে সহ্য করতে পারে না এলসি। নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও যে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা আছে তা দৃঢ়ভাবে বলা মুস্কিল। টাউনশীপের অলিগলিতে এ ব্যাপারে আলোচনা শোনা যায়। ওদের জীবন, মানে দাম্পত্য জীবন নিয়ে, লোকে মস্করা করে। গসিপ করে আনন্দ পায়। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা বলে ওর নাকি একটু হোমো ভাব আছে। আর সেইজন্যই স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। আরে বাছাধন আছ মার্কেটিং ডিভিশনে, কাজ সেলস্ ম্যানেজারের। সমস্ত দুনিয়াটাই তো হাতের মুঠোয়। কতো সুন্দরী, রূপসী অপেক্ষা করছে তিন তারকার প্রকোষ্ঠে। তা ছেড়ে এ আবার কি নেশা? নেশা, না রোগ? সুদূর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে, যা শোভা পায় তা কি কখনো এ দেশের মাটিতে মেশে? সম্পদ প্রাচুর্যে যে সখ লোকে মেনে নেয়, এই রুক্ষ শুষ্ক দেশে তা কখনো পোষায় না। মানায় না।

সেদিন চোপরা সাহেব বলেই ফেললো, হ্যাল্লো মিস্টার মিট্রা। হাউ ইজ য়ুয়োর গে-সাহেব?

প্রথমে ধরতেই পারেনি অশোক। কি বলতে চায় চোপরা সাহেব। তারপর কথার বিস্তারে, আলাপে-প্রলাপে সে গে-সাহেবকে আবিষ্কার করলো। চোপরা সাহেবের এই এক বিশেষত্ব। সবাইকে এক একটা সাঙ্কেতিক নাম দিয়ে আনন্দ পায়। মার্কেটিং অফিসের ফিনান্স ম্যানেজার পলাশ ধরকে নাম দিয়েছে মফৎলাল। মিস্টার ধরের বৈশিষ্ট্য, সে বিনি খরচে, মানে পরের পয়সায়, মদ গিলতে ভালোবাসে। লোকে বিনা পয়সায় বিষও খায়। সে মাল খায় তাতে দোষ কোথায়? সেদিক থেকে চোপরা সাহেবের দেওয়া ছদ্মনাম সত্যিই সার্থক। এমন পরস্মৈপদী লোককে রাষ্ট্রভাষায় মফৎলাল বলা খুবই যুক্তিযুক্ত।

সেদিন ঝুপরিমোড়ে বাজার করতে এসেছে মফৎলাল। হঠাৎ দেখা বিজি সাহেবের সঙ্গে। তিনিও সঙ্গী পেয়ে গেলেন। দুজনে চল্লো ট্যুরিস্ট লজে। ইতালীর মিলানো থেকে এসেছে এক টেকনোক্র্যাট পার্টি। ন্যাপ্থা ক্র্যাকার প্ল্যাণ্টে কি যেন বিশেষ

কাজ। উৎপাদন বন্ধ আছে বেশ কয়েক মাস। ওরা এসেছে আমাদের দেশে, আমাদের কাজ করতে। চলুন ধর সাহেব ওদের একটু সঙ্গ দেওয়া যাক। বিজি সাহেবের অনুরোধে সাড়া দিতেই হয়। আফটার অল ফরেনার্স আর আওয়ার গেস্ট। সঙ্গ দেওয়া সবারই কর্তব্য। শ্রীযুক্ত মফৎলাল জানে বিদেশী মানেই বিশেষ ব্যবস্থা। ওরা আবার এদেশে এসে জল পান করতে ভীত। কলেরার জীবানু সব ওৎ পেতে আছে। বিদেশীর উদরে যেয়ে একটা কাণ্ড কারখানা বাধানোর উদ্দেশ্যে। তাই সাদা জল, মানে প্লেইন ওয়াটারের পরিবর্তে অন্য তরল পানীয় গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। আর সঙ্গে সমজদার সঙ্গী থাকলে সেই তরল প্রবাহের বিরাম নেই। বিজি সাহেবের প্রস্তাবে মফৎলাল সব ভুলে গেল। স্কুটারটা ধোপী পাড়ায় লিয়াকৎ মিস্ত্রির হেফাজতে রেখে চেপে বসলো বিজি সাহেবের লাল মারুতিতে। তারপর ট্যুরিস্ট লজের বাতানুকূল কক্ষে সুরাপানের এক মহাযজ্ঞ। সকাল গড়িয়ে দুপুর। অপরাহ্নও যায় যায় এমন সময় খেয়াল হলো ঝুপরি-মোড় থেকে বাজার করে বাড়ী ফিরতে হবে।

মফৎলাল পরস্মৈপদী নেশার অভ্যাস আয়ত্ব করেছে বৃন্দাবন ঘোষের কাছ থেকে। অফিসের বিজি সাহেব টাউনশীপের মালবাবু। মাতলামিতে এক নম্বর। বাগানে ফুল ফুটলে যেমন ভ্রমরের আনাগোনা তেমনি টেবিলে মদের গ্লাস থাকলে সেই গেলাসের বন্ধুও জুটে যায়। লোকে বলে, গার্ল ফ্রেণ্ড আর গ্লাসফ্রেণ্ড— একেবারে অঙ্গাঙ্গী ভাব। ছাড়াছাড়ির কোনো সম্ভাবনাই নেই। লালতু চক্রবর্তী বিজি সাহেবের দাসানুদাস হলেও এ রসে বঞ্চিত। তাই গেলাসের বন্ধু হিসেবে মফৎলাল বিজি সাহেবের পরম প্রিয়।

বৃন্দাবন ঘোষ আর লালতু চক্রবর্তীর চক্রে পড়ে অশোক অসহায়। ওর কর্মজীবনে বীতশ্রদ্ধ ভাব এসে যায়। বিজি সাহেব কারণে-অকারণে দুর্ব্যবহার করেন অশোকের সঙ্গে। কিসের যেন এক ধরণের আক্রোশ ওর ওপর। তার ওপর এলসির চামচেগিরি ওর জীবনকে আরো অসহনীয় করে তোলে। সপ্তাহান্তে গাঙ্গুলী সাহেব আসেন বিধাননগরে। মানকরে মামার বাড়ী। তাই

বিধাননগরে আসতেই হয় অফিসের কাজে। সেখানে খোঁজ পেয়েছেন এক সৎপাত্রের। ভাগ্নীটাকে পাত্রস্থ করতেই হবে। যৌবন ঢলে পড়ার আগেই জীবনসঙ্গী চাই। ছেলেটি বিষ্ণুপুরের গোস্বামী পরিবারের। জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ারে থাকতে থাকতেই ভাগ্নীর বিয়েটা দেওয়া দরকার। মোটামুটি ভদ্র পরিবার। পাত্র দেখতে সুশ্রী। তবে বেকার। গাঙ্গুলী সাহেবও তেমনটি চাইছিলেন। একটু লেখাপড়া জানলেই হলো। চাকরীটা তো তিনি বিয়ের যৌতুক দেবেন। ওই লোভনীয় চাকরীটাই তো তাঁর কাছে তুরুপের তাস। তা লোকে ডাউরী বলুক, দহেজ বলুক আর পণ যাই বলুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এসব কথাগুলো আঙুর ফল টক গল্পের মতো। তবে ভাগ্নী আগেই বলে রেখেছে। মামা, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে বর হওয়া চাই খাস অফিসার। ওসব ফুটোকার্ত্তিক কেরাণী ফেরাণীর সঙ্গে ঘর করতে পারবো না। একেই বলে মামা বাড়ীর আবদার। মামা হয়ে আদুরে ভাগ্নীর আবদার এড়ানো মুস্কিল।

গোস্বামীদের কনিষ্ঠ তনয়কে পাত্র মনস্থ করে ফেলেছেন গাঙ্গুলী সাহেব। পড়াশুনায় ততটা তুখোর নয়। শুধু বি কম্ পাশ। দেখতে সুপুরুষ। ভাগ্নী তাঁর তেমন সুন্দরী নয়। অনেকটা আফ্রিকান রঙের চেহারা। তুলনামূলক ভাবে ছেলে একেবারে কার্তিকসদৃশ। গাঙ্গুলী সাহেবের প্লাস পয়েণ্ট হলো, ছেলে বেকার। বেকার মানেই বেগার। বেগার্স কাণ্ট বী চুসার্স। এই বেকার ছেলেই নিগ্রোকালো ভাগ্নীর জুটি হবে জব্বর। অন্ততঃ পরবর্তী প্রজন্ম একটা মাঝামাঝি বর্ণ পাবে। গার্জেন হয়ে সে কথাও ভাবতে হবে। রূপ, যৌবন, সহবাস আর সঙ্গম সবই তো সাময়িক। কিন্তু তার পরের অধ্যায়টা কেমন হবে সে চিন্তা অভিভাবকদেরই ভাবতে হয়। এক একটি বলবান ষাঁড়ের জন্য এদেশের পশুপালন মন্ত্রীরা সুদূর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সফর করছেন। সবদিক থেকে বিচার করে গাঙ্গুলী সাহেব স্থির করলেন, এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। একেবারে রাজযোটক। এ যেন আফ্রিকার সঙ্গে য়ুরোপের সহবাস। ইন্দিরাজী হয় তো এদের কথা ভেবেই জাতীয় সংহতির স্লোগান তুলেছিলেন ভোটের ভারতবর্ষে।

গাঙ্গুলী সাহেব মাঝে মাঝেই বিধাননগরে আসেন। বিপণন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁকে ট্যুর করতেই হয়। এখানে এলে মাধুরীলতা গেস্ট হাউজে ওঠেন। বিজি সাহেবকে দিয়ে দু-একটা নোটশীট তৈরী করিয়ে নেন। ট্যুরটাকে অফিসিয়াল দেখাতে হলে এ ধরণের কাগজ বানাতেই হয়। তাতে মহামূল্যবান সইও দিতে হয়। লোকে সব ভুলে যাবে। কিন্তু কাগজ হয়ে থাকবে ভাবীকালের দলিল। তাই ছকে বাঁধা নোটশীটে গাঙ্গুলী সাহেব তাঁর অবোধ্য হস্তাক্ষরকে সাক্ষী রাখেন। বিজি সাহেব তস্য পোষ্য এলসিকে দায়িত্ব দেন তাঁর দেখাশোনা করার।

একদিন গাঙ্গুলী সাহেব লানচ সেরে দিবানিদ্রায় মগ্ন। তিন নম্বর ঘরের ভেতরে বাতানুকূল পরিবেশে ভগবান নিদ্রারত। ঘরের বাইরে সক্রিয় প্রহরী এলসি। সদা সতর্ক দৃষ্টি সাহেবের যেন আরামে আঘাত না লাগে। অশোক ভাবলো, গাঙ্গুলী সাহেব ইন দ্য টাউন মানেই সরকারী সফরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে মন্দ হয় না। এই নিরিবিলিতে সাক্ষাতের সুযোগে বদলীর ব্যাপারটা নতুন করে তুললে কেমন হয়? গাঙ্গুলী সাহেব কোনোদিন কারো ক্ষতি করেন না এমন খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর ঘরের বাইরে বসে আছে বিজি সাহেবের সুখতলা ব্যাটা লালতু চক্কোত্তি।

না, না, যাবেন না। সাহেব আরাম করছেন। ডোণ্ট ডিস্টার্ব হিম। অশোক যেন শুনতে পেল একজন জাত দারোয়ান তার কানের কাছে কথাগুলো বলে গেল।

কিন্তু আমার যে ভীষণ প্রয়োজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার। এবং বলতে বলতেই সে ঘরের অন্দরে প্রবেশ করলো। গাঙ্গুলী সাহেব অতি সহজভাবে গ্রহণ করলেন অশোককে।

কি ব্যাপার? মিট্রা। এনি প্রব্লেম? কি বলতে চাইছ বলে ফেল। আমার সময় কম। সূর্যাস্তের আগেই আমাকে পৌঁছতে হবে বিষ্ণুপুর। সন্ধ্যায় অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মিটিং আছে। বাঁকুড়ার খরাপ্রবণ অঞ্চলে ফসল ফলানোর এক

পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। আমি সার্বজনিক সার কোম্পানীর প্রতিনিধি। আমাকে সময় মতো উপস্থিত হতেই হবে।

গাঙ্গুলী সাহেব যেন বিষ্ণুপুরের আসন্ন সভার জন্য গলা সেধে নিলেন একদমে। অশোক বেশ ভালভাবেই জানে এই যে মাধুরীলতায় দ্বিপ্রাহরিক আরাম করা, বিষ্ণুপুরে সান্ধ্যসভা এসবই নাটক। রীতিমতো প্রহসন। আসলে ভাগ্নীর বিয়ের ব্যাপারে বর-নির্বাচনই মুখ্য বিষয়। আর এইসব সাজানো সংলাপ শুধু শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টা। কারখানায় এক ছটাক সার নেই। জনসাধারণের করের টাকায় চলছে এতো বড় এক লোকসানী প্রতিষ্ঠান। শুধু ভর্তুকী আর ভর্তুকীর কীর্তনে চারিদিক ঝালাপালা। তবুও জেনারেল ম্যানেজারকে ফিল্ডে যেতেই হয়। সব সফরই যে সফল তা বলা মুস্কিল। তবু সার্বজনিক প্রথানুযায়ী সব ট্যুরকেই দেখাতে হয় অফিসিয়াল। এইসব হিসাব-পত্তর, গাড়ীর গতিবিধি, বিনাপ্রয়োজনে হোটেলে নৈশবাস ইত্যাদি দেখার জন্য রয়েছে ভিজিল্যান্স। রয়েছে অডিট এবং সর্বোপরি মহা বিচারশালা পার্লামেণ্ট। জবাবদিহী করতেই হবে। কোথাও, না কোথাও প্রমাণ করতেই হবে, 'আমি নির্দোষ।'

অশোকের দীক্ষাগুরু দয়ালসাহেব সবই বলে দিয়েছেন বিধান-নগর কারখানায় কাজে যোগদান করার প্রথম পর্বে। ভদ্রলোককে প্রথমে শিক্ষাগুরু হিসেবে মানতো অশোক। পরবর্তীকালে সে উপলব্ধি করেছে, দয়াল সাহেব শুধু শিক্ষাগুরু নয়। তাঁকে দীক্ষাগুরুর মর্যাদা দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দয়াল সাহেব বলেছিলেন, সার্বজনিক সার কোম্পানীর বড় সাহেবদের গতি প্রকৃতি খুবই রহস্যময়। ওঁদের আচার আচরণ অভিজ্ঞ অভিনেতার চেয়েও সূক্ষ্ম। ওঁরা যা বলেন তা মীন করেন না। ওঁদের সবকিছুই ভাণ, ভণিতা আর অভিনয়। সবই শো। এ বিগ শো অন আর্থ।

সাবাস নেহেরুজী! জমিদারী উচ্ছেদ করে এ তুমি কী দিয়ে গেলে। ব্রিটিশ শাসিত জমিদারের জারজ সন্তান এই ম্যানেজার-গুলো। শ্রমিক ঠকাতে ওঁরা সরকারী আইনের আশ্রয় নেয় আর

নিজেদের ভোগ সম্ভোগের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টারের স্টাইল। অশোক সব জেনে গেছে। বুঝে নিয়েছে ওঁদের কৃত্রিম সংলাপ। তবুও সে সহ্য করে। দয়াল সাহেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিতে উপদেশ দিয়েছেন। মা ফলেসু কদাচন! কীপ য়ুয়োর ইয়ার্স ওপেন, বাট ডোণ্ট ওপেন য়ুয়োর মাউথ। ঈশ্বর মানুষকে দুটি কর্ণ দিয়েছেন বেশী করে শোনার জন্য। আর মাত্র একটি মুখ। সে মুখের অনেক ফাংশন। তাই কম কথা বলাটা সত্যিই শোভনীয়।

অশোক অনেক আশা নিয়ে গাঙ্গুলী সাহেবের কাছে পৌঁছেছে। আজ তাকে শেষ অনুরোধ জানাতেই হবে।

স্যর, অনেকদিন পর দেশে ফিরেছি। দেশের মাটির আকর্ষণে স্বদেশে করেছি প্রত্যাবর্তন। ও আমার দেশের মাটি, তোমার চরণ পরে ঠেকাই মাথা। কিন্তু স্বদেশে এসে একেবারে ফেঁসে গেলাম। বিধাননগর আমার সহ্য হচ্ছে না। অসহ্য গরম, ততোধিক অফিসের অশান্তি। সবাই কেমন যেন ঈর্ষায় জর্জরিত। সোজাভাবে কেউ কথা বলে না। সব কিছুতেই হেঁয়ালী, টণ্টিং অ্যাণ্ড টিজিং। ছিলাম পৃথিবীর ব্যস্ততম মহানগরীতে। আর এসে পড়েছি গরমে পচা বিধাননগরে। প্লীজ ডু মী আ ফেভার। আমায় কোলকাতায় একটা পোস্টিং দিন। আই শ্যাল সার্ভ ইউ লাইক এ বুলডগ।

অশোকের কথাগুলো গাঙ্গুলী সাহেব সব শুনলেন। কোনো কথা দিলেন না। তাঁর সামনে এখন শুধু একটাই কাজ। চেয়ারে থাকতে থাকতেই ভাগ্নীর বিয়েটা দিতে হবে। আর আদুরে ভাগ্নীকে কোলকাতায় রাখতে হলে বাবাজীবনকেও আনতে হবে সেই শহরে। ঝাউতলা অফিসে প্রচুর লোক। মাথা ঠোকাঠুকির মতো অবস্থা। নতুন করে এই অফিসের বোঝা বাড়াতে মন সায় দিচ্ছে না। দিল্লীর কর্পোরেট অফিসে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ওরা ঝাউতলা লেনকে নাম দিয়েছে বাঙালীস্তান। গাঙ্গুলীসাহেব হলেন সেখানকার সেলফ স্টাইলড্ জমিদার।

অশোকের সবিনয় অনুরোধ শুনে তিনি শুধু বল্লেন, আজ [illegible]।

লেট মী সী। তারপর হাঁক দিলেন ড্রাইভারকে। কর্মকার, সব ঠিক আছে তো? ঠিক পনের মিনিটের মধ্যে রওনা দিতে হবে। ডিভিসি ব্যারেজ পার হলেই বাঁকুড়া জেলা। বেলিয়াতোড় ছাড়ালেই বড়জোড়ার জঙ্গল। জায়গাটা সুবিধার নয়। বিশেষ করে সূর্যাস্তের পর সেখানে ডাকাতের রাজত্ব। মাঝে মাঝেই গাড়ী থামিয়ে ডাকাতি হয়। একটা শুভকাজে এসে থানা পুলিশ করার মানে হয় না। সতর্ক থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

একেবারে ব্রিটিশ কায়দায় পনের মিনিটের মধ্যে গাঙ্গুলী সাহেব রওনা দিলেন। গন্তব্যস্থল বিষ্ণুপুর। সঙ্গে এসকর্ট লালতু চক্রবর্তী। ও যেয়ে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসলো। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পেঁাছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিজি সাহেব। তাঁর হুকুম। বড় সাহেবের যেন কোনো তকলিপ না হয়। অনেক কষ্ট করে এসেছেন আমাদের রিজিওনে। ওঁর সুখ সুবিধার দায়িত্ব আর-এমের ওপর। রিজিওন্যাল ম্যানেজার হলেন হোস্ট আর তাঁর কর্তব্য হলো অতিথির মঙ্গল চিন্তা করা। যে সাব-অর্ডিনেট নিজের বস্‌কে খুশী করতে অক্ষম তার পক্ষে আর যাই হোক চাকরী করা শোভা পায় না। আধুনিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বস্‌ হলো গত শতকের ভাতার তুল্য। ভাতারের সোহাগ চুম্বন পেতে হলে অনেক কিছুই সমর্পণ করতে হয়। তবুও ভাতার বেজার হতে মুহূর্তের ব্যাপার। বিজি সাহেবের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। অবশ্য সেদিকে ভাবার সময় নেই গাঙ্গুলী সাহেবের। তাঁর মগজে বর্তমানে একটিই পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্নীর বিয়েটা শীগগীরই দিতে হবে। বিলম্বে নানা বিড়ম্বনা দেখা দিতে পারে।

পরদিন বৃন্দাবন ঘোষ অফিসে এসেই ডেকে পাঠালেন অশোককে। ঘরে ঢুকে যথারীতি সুপ্রভাত সম্ভাষণে কোনো সাড়া পেল না সে। বস্‌ যেন একটু লো গীয়ারে আছেন। অশোকের তাই মনে হলো। বিজি সাহেবের তরফ থেকে কোনো সাড়া না পেলেও একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো সে। একেবারে সামনা সামনি। কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকা যায়? এবার বিজি সাহেব মুখ খুললেন। মিস্টার

মিট্রা, ইটজ্ ভেরী ব্যাড। গতকাল আপনি গাঙ্গুলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন? আপনি জানেন না উনি একটা ব্যক্তিগত কাজে এখানে এসেছেন। ওঁকে ডিস্টার্ব করা আপনার উচিৎ হয়নি। আমি এসব পছন্দ করি না।

দেখুন, মিস্টার ঘোষ, প্রয়োজনটা আমার প্রকট। তাই নিজের তাগিদে আমি দেখা করেছি। তাতে দোষের কি আছে?

গাঙ্গুলী সাহেব এসব পছন্দ করেন না। তাঁর বিশ্রামের সময় ব্যক্তিগত সমস্যার বোঝা চাপানো ঠিক নয়। আপনি খুব ভুল করেছেন। আমার পার্মিশন নেওয়ার দরকার ছিল। কোম্পানীর একটা ডেকোরাম আছে। হুট্ করে জি-এমের ঘরে ঢুকে যাওয়া খুবই বেয়াদপী কাজ। ইট শুড নট বী রিপিটেড।

কিন্তু উনি তো চিরকুমার। ফার্স্ট ক্লাশ ব্যাচেলার। এসেছেনও একা। ওনার আবার ব্যক্তিগত জীবনে কি ব্যাঘাত ঘটালাম? ভর দুপুর বেলায় একটু কথা বলতে গিয়েছিলাম শুধু।

বী কেয়ারফুল! খুব সাবধান! এমনটি যেন দ্বিতীয়বার না হয়।

অশোক মনে মনে ভাবছে, এ শালার মাতাল বলে কি? এ যে ভূতের মুখে রাম নাম। সপ্তাহের প্রতিটি দিন ট্যুরিস্ট লজে বসে মাল খাওয়া যার নিত্যকর্ম এবং পরের পয়সায় খাওয়া যার জীবনের ধর্ম সে কিনা উপদেশ দিচ্ছে একজন শিক্ষিত পিয়ারোকে। মোরারজী দেশাই তবে কি দাওয়াই দিলেন এইসব মাতাল ম্যানেজারকে। ড্রিংকিং হোয়াইল অন্ অফিসিয়াল ডিউটি ইজ ফরবিড্ন। এ ব্যাটা শুধু মাল খায় না, অফিসে বসে মাতলামীও করে। কখনো কখনো অশ্লীল শব্দযোগে পিয়নগুলোকে দাবড়ায়। তখন যেন কোন্ এক জমিদার তনয়ের লীলা চলে লান্চের পর। তাতে দোষ নেই। শালা যেন ধোওয়া তুলসী পাতা। আর দোষ হলো অশোকের। সে তো শুধু বিশেষ এক সমস্যার কথা বলতে জি-এমের ঘরে ঢুকেছিল। এতে অন্যায় কোথায়? এ নিশ্চয়ই লালতুর কাজ। ওই চাম্চেটা হলো এক নম্বর হারামী। অশোকের মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওই ব্যাটা হোমোটাই চুক্লি করেছে

বিজির কাছে। গতকাল ঐ সময়ে ওকেই রাখা হয়েছিল দরজার সামনে প্রহরারত। ও ছিল জার্মান গেস্টাপোর ভূমিকায়। ঐ যে কি একটা গান আছে, চুপ, চুপ শব্দ কোরো না। কথা বোলো না। ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারেরা এক একজন ভগবানের প্রতিভূ। তাঁদের সেবার জন্য রাখা আছে কয়েকডজন সাব অর্ডিনেট। বড়কর্তাকে দেখভাল করার জন্য পিয়ারো অশোকই আদর্শ ছিল। সাধারণতঃ জনসংযোগের লোকেরাই বিগ বস্‌দের হ্যাপা সামলায়। তাঁদের ট্যাক্‌ল করা এবং ওয়ার্কারদের গুড হিউমারে রাখার দায়িত্ব জনসংযোগ অফিসারের। একমাত্র পিয়ারোই বুঝতে পারে কোম্পানীর আবহাওয়া। তবে বড় কর্তাদের কাছের লোক হওয়া আর কাজের লোক হওয়ায় অনেক পার্থক্য। তাই বিকল্প ব্যবস্থা আছে সর্বত্র। এখানেও নেই তার ব্যতিক্রম।

বিজি সাহেব অশোককে নির্ভর করতে সাহস পান না। ওঁর শত কলংক। কথায় কথায় যদি সব ফাঁস হয়ে যায়। তাই একান্ত আস্থাভাজন এলসিকে বসিয়ে রেখেছিলেন গাঙ্গুলী সাহেবের পদসেবার প্রয়াসে। লালতু চক্কোত্তির ফন্দি হলো বিধাননগরে থাকাকালীন মোহিতনগরের বাড়ীটার কনস্ট্রাকশন শেষ করা। মাণিকজোড় এলসি বিজির এক চিন্তা। কাজে থাকতে থাকতেই সবকিছু গুছিয়ে নাও। যত পার গুটিয়ে নাও। সমস্ত সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের এটাই হয়তো মূল মন্ত্র। লোভের জাল ছড়িয়ে দাও গ্রামে গঞ্জে শহরে। আর মোওকা বুঝে লাভের সোনা ঘরে তোলো। এ ব্যাপারে সোনার সঙ্গে জুটে গেছে সোহাগার। কেন যে গুপ্ত সাহেব এই গা সোঁকাসুঁকির মধ্যে এনে ফেল্লেন অশোককে? অশোকের প্রখর নীতিবোধ, স্পষ্ট কথা বলার প্রবণতা এবং লালকে লাল, নীলকে নীল বলার বলিষ্ঠতা বিজি সাহেবের পছন্দ নয়। শুধু বিজি কেন? কোনো বস্‌ই চায় না তাঁর অধস্তন সহকর্মী তাঁর চেয়ে অধিক শিক্ষিত হোক। মুখের ওপর কোনো যুক্তিপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করুক। এদিক থেকে এলসি খুবই বিশ্বস্ত, অনুগত এবং ধৈর্যশীল। অস্থিরতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত লোকটির

আচরণে। মনে টেনশনের আবির্ভাব হলেই চারমিনারের কাঠি মুখে। ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকে মনের চিন্তাকে হাওয়ায় মিশিয়ে দিতে চায়।

সেদিন বুদ্‌বুদ্‌ থেকে খবর এলো, মাদার একস্‌পায়ার্ড। তাতেও কোনো বিকার নেই, নেই কোনো চিত্ত বৈকল্য। গর্ভধারিণী মাতৃদেবী তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। চক্কোত্তি বংশে বাতি দেবার জন্য লালতুকে প্রসব করেছেন। ওকে শিশু থেকে যৌবনের দরজা পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়েছেন। লেখাপড়া শিখিয়ে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর জীবনের ইনিংস শেষ। ক্রীজ থেকে প্যাভেলিয়ানে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। তাই মাতৃবিয়োগের সংবাদে বৈচিত্র কোথায়? মায়ের মৃত্যু সংবাদ জেনেও একদিনের জন্য দেশের বাড়ী গেল না। এলসি কি নিষ্ঠুর, না অকৃতজ্ঞ? ঈশ্বর জানেন। মাতৃবিয়োগের দুঃসংবাদ শুনে অফিসের এক কনিষ্ঠ কেরাণীকে পাঠালো বুদ্‌বুদে। কোম্পানীর খরচে এলসি-পিতা এলেন বিধাননগরের কোয়ার্টারে। মাতৃদায় বলতে যা বোঝায় তা নিতান্তই সংক্ষেপে সমাধা হলো। তবে হ্যা, মাথাটা ন্যাড়া করেছিল এলসি।

মা মারা যাওয়ার ঠিক পনের দিন পর ওর ডিপার্টমেণ্টাল ইণ্টারভিউ। পরবর্তী উচ্চপদের জন্য একবার বিভাগীয় প্রধানদের সামনে নিয়মমাফিক হাজিরা দিতেই হবে। সে জানে প্রমোশন তার কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুণ্ডিত মস্তকে বোর্ডের সামনে উপস্থিত হয়েছিল এলসি। ভেবেছিল এই শেভ্‌করা মাথাই তাকে অনেক পয়েণ্ট স্কোর করতে সাহায্য করবে। কিন্তু কর্পোরেট অফিস থেকে এসেছিলেন মিস্টার অরোরা। সিলেকশন বোর্ডের তাবর এক প্রশ্নকর্তা। তাঁর কাছে খবর ছিল এলসি হলো আর-এমের পোঁ-ধরা লোক। ওর ভাগ্যে সেবার শিকে ছিঁড়লো না। প্রমোশনটা পেয়ে গেল মিস্টার ভাসিন। যদিও ওর সিনিয়ারিটি ছিল অনেক নীচে, কিন্তু অরোরা সাহেব দিল্লীতে বসেই সব ঠিক করে এসেছেন। তাঁর এক জেদ্‌, কোনো চাম্‌চে বাবুকে মর্যাদাপূর্ণ পদে বসাবেন না। এতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভেঙ্গে পড়ে। নীচুতলার কর্মীদের মনোবল দুর্বল হয়ে যায়। এতকিছু করেও সেবারের

মতো প্রমোশনটা ফস্কে গেল লালতুর জাল থেকে। আঙুর ফল টক গল্পের মতো সে প্রচার করে দিল ঠিক উল্টো। আসলে বিধান-নগর ছাড়তে রাজী হয়নি বলেই এলসির প্রমোশনটা দেওয়া হয়েছে ভাসিনকে। সত্যিই, দিল্লী অনেক দূরে।

বৃন্দাবন ঘোষ বেশ রেগে আছেন। গাঙ্গুলী সাহেব ও'র নোটশীট ও-কে করেন নি। অশোককে শাস্তিমূলক বদলী করা গেল না। এই ক্রোধ ওঁকে ক্রমশই উত্তেজিত করে তুলছে। আচরণে আনছে উন্মত্ততা। আর যাই হোক, একজন রিজিওন্যাল ম্যানেজার। নীচের পেয়াদা পিয়ন থেকে শুরু করে সাব অডিনেট অফিসার সবাইকে সহ্য করতে হয় বস্-এর দুর্ব্যবহার। হজম করতে হয় অনেক অশোভন আচরণ। চাকরীর খাতায় যখন লেখানো আছে নাম তখন চাকরের গঞ্জনা সইতেই হয় সবাইকে।

বৃহস্পতিবার সারা দেশে ড্রাইডে। সম্পূর্ণ শুকনো দিন। পানীয় ক্রয়ে এবং বিক্রয়ে নিষেধ। ঝুপরিমোড়ে যাদবের অফ্-লাইসেন্স আইনতঃ বন্ধ। অবশ্য জানাশোনা থাকলে পেছনের দরজা দিয়ে সব পানীয়ই পাওয়া যায়। স্কচ্ হুইস্কি, জিন, রাম অথবা বীয়ার। বিজি সাহেব সেলস্ অফিসারের পয়সায় মাল টেনে টেনে এমন অভ্যাসে পেঁছেছেন যে প্রতিদিন মাল তাঁর চাইই। ভুলে যান বৃহস্পতিবার। মনে থাকে না ড্রাইডের অর্ডার। সন্ধ্যায় গলা যখন শুকিয়ে আসে তখনই মনে পড়ে অশোকের কথা। স্মরণ মানেই সমন। ডেকে না পাঠালেও বাড়ীর ইণ্টারকামে সমন পেঁছে যায়। প্রথমে বিনয়, তারপর বেগিং। সেই পুরানো কায়দা।

মিস্টার মিট্রা, আপনার পার্সোন্যাল স্টকে একটা রাম্ হবে? টেলিফোনে কান পেতে অশোক শুনতে পায় বিজি সাহেবের কণ্ঠস্বর। কোলকাতা থেকে বিকিরণ সাহেব এসেছেন। মাধুরী-লতায় একা একা বসে আছেন। প্লীজ হেল্প!

অশোক বুঝতে পারে না কি উত্তর দেবে। অফিসে ইতিমধ্যেই সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। তবুও এক বোতলের বিনিময়ে যদি ওঁর উন্মত্ততাকে একটু ভেজানো যায়। যদি বিগলিত হয়

বস্-এর নিষ্ঠুর হৃদয়। সেই আশাতেই অশোক হাজির হয় মাধুরীতলায়। প্রতি গুরুবারে এই পুজো না হলেও মাঝে মাঝেই তাকে সহ্য করতে হয় এই উৎপাত। জলে বাস করে তো কুমীরের সঙ্গে লড়াই চলে না।

সব জেনেশুনেও অশোক বলে ফেললো, সরি! নো স্টক। গত কয়েকমাস বৃহস্পতিবার, দোকান বন্ধ অর্থাৎ ড্রাইডের অজুহাতে বেশ কয়েক বোতল জিন আর রাম্ ধার নিয়েছেন বিজি সাহেব। ফেরৎ দেবার কথা একদম ভুলে গেছেন। কোনো সম্ভাবনাও নেই। আসলে ওপরওয়ালার পদাধিকার বলে এ হলো এক ধরণের তোলা সংগ্রহ করা। কোলকাতার ফুটপাত থেকে তোলা তোলে মাস্তানরা। ভাগ পায় পলিটিক্যাল দাদারা। আবার সেই দাদাদের কিছু শেয়ারে ভাগ বসায় আরো ওপর মহলের নেতারা। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানেও সেই এক সুর। অপরিবর্তিত প্রবাহ।

একটা পয়েণ্টে এসে অশোককে শক্ত হতেই হয়। কিন্তু বিজি সাহেব তখন ক্ষুধার্থ নেকড়ে। রুপেয়া, রমণীতে ওঁর তেমন আকর্ষণ নেই। শুধু তরলের তৃষ্ণায় ওঁর সব শান্তি। তন্মধ্যে জিন হলো বিশেষ প্রিয়। মোস্ট ফেভারিট। অন্যথায় থ্রি-একস্ রাম্ হলেও চলবে। বীয়ারে তেমন আগ্রহ নেই। ওয়ার্কিং ক্লাশ ড্রিংক। কারখানার মজদুরের ক্লান্তি ঘোচানোর নেশা হলো বীয়ার। জলের বদলে অ্যালকোহল। অশোক রবার্ট ব্রুসের মতো পর পর ছ'বার পরাজিত হয়েও সপ্তমবারে বিজয়ীর গর্ব অনুভব করলো। সামনা-সামনি না হলেও টেলিফোনের মাধ্যমে বিজি সাহেবকে রিফিউজ করতে পেরেছে।

অশোকের জানা ছিল না যে সেই প্রত্যাখ্যানই একদিন পরিণত হবে প্রতিশোধে। প্রতিশোধ অথবা প্রতিহিংসার আগুনে তাকে দগ্ধ হতে হবে। সেদিন আর এমের ঘরে হঠাৎই ঘটনাটা চুড়ান্তরূপ নিল। বিজি সাহেবের সামনেই বসে এলসি। সাহেবের ল্যাঙ্গোঠী। সে নিশ্চয়ই বস্‌কে বিগড়ে দেবার জন্য নানা ইন্ধন সরবরাহ করেছে। নির্জলা গুরুবারের সন্ধ্যা কাটিয়ে সাহেবের রাত কেটেছে নিদ্রাবিহীন অবস্থায়। এতদিনের অভ্যাস যাবে কোথায়?

বিনিপয়সায় মাল খাওয়া পার্টি একদিনের অনিময়েই আপ্‌সেট। শুধু সেদিনের প্রত্যাখ্যানই অশোকের জীবনে, মানে কর্মজীবনে, কালো মেঘের সঞ্চার করলো। রীতিমতো অসহনীয় করে তুললো তার জীবন। অতি ছোটোখাটো ব্যাপারে তাকে টীজ করতে লাগলো এলসি বিজি। বাংলা ভাষার যতসব হেঁয়ালী, টিপ্পনি তথা লঘু মন্তব্য যেন ওর ওপরে বর্ষিত হবার জন্যই লিখিত হয়েছে। অশোক শুধু ধৈর্যের অলিম্পিক সাধনায় ব্রতী।

* * *

গাঙ্গুলী সাহেব কোলকাতায় ফিরেই একটা ডিসিশন নিয়ে ফেল্লেন। বিষ্ণুপুরে ভাগ্নীর বিয়েটা পাকাপাকি হওয়াতে মনটা তাঁর বেশ প্রফুল্ল ছিল। চিরদিনের অকৃতদার, কনফার্মড ব্যাচেলার, গাঙ্গুলী সাহেব পরোপকারে বিশ্বাসী। তিনি জানেন আজ যাকে কিঞ্চিৎ উপকার করতে পারবেন পরবর্তীকালে তার প্রতিদান হবে সহস্রগুণ। এই যে ভাগ্নীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনি মাসে অন্ততঃ একবার বিষ্ণুপুর যাচ্ছেন তার মধ্যেই বা কি স্বার্থ আছে? শুধুই পরোপকার। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই এক দূর সম্পর্কের দিদি স্বামীর ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিল তাঁর কাছে। নব বিবাহিতা পূর্ণ-যৌবনা যুবতী রমণী স্বামী প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় এসে উপস্থিত তাঁর দরজায়। অতিথি তাঁর দুয়ারে। স্থান দিতেই হয়। তারপর প্রতিদিনের একত্র বসবাসের প্রভাবে এবং নরনারীর সহজাত আকর্ষণের ফলে ওরা বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই দিন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু কাল হলো পাঁচ বছরের মাথায় এই ভাগ্নীর আবির্ভাবে। তার প্রতি সহজাত স্নেহ রূপান্তরিত হলো দায়িত্বের মহীরুহে।

দায়িত্ব বড়ই কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। ধীরে ধীরে শিশু ভাগ্নী কিশোরীতে এবং তারপর যুবতীতে পরিণত হলো। এবার তাকে পাত্রস্থ করাও ওঁর কর্তব্য। যে পৃথিবীতে এসেছে আপন অধিকার নিয়ে তাকে বেঁচে থাকার অধিকার দিতেই হবে। মানুষ তাই তো সামাজিক জীব। আর মাছের মায়ের নেই পুত্রশোক।

কন্যাদায় কি চাট্টিখানি কথা! তবুও যাই হোক, সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার সুবাদে সবাই মানে। চেয়ারকে ভয় করে। আবার স্বার্থের কথা ভেবে খাতিরও করে। আসলে চেয়ারের ক্ষমতাই আলাদা। একজন চোরকেও চেয়ারে বসালে পদমর্যাদার প্রভাবে লোকে তাঁকে ভয় করবে। ভালোবাসা সম্মান প্রদর্শণের ভাণ করবে। গাঙ্গুলী সাহেব বেশ ভালই জানেন, যতদিন আছেন চেয়ারে ততদিন তাঁকে কে মারে?

ভাগ্নীর বিয়েতে লক্ষ টাকার যৌতুক দেবার সুযোগ না থাকলেও আজকের বাজারে একটা লোভনীয় চাকরীর বিনিময়ে ভালো বর কেনা যায়। বেকারের দেশে কতো শিক্ষিত ষাঁড় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের একজনকে ধরে পিঁড়িতে বসালেই হলো। সমাজের একটা উপকার হলো। অরক্ষণীয়া কন্যার একটা বর জুটলো। ঘর বাঁধার সুযোগ এলো। ছেলেটিরও লাভ হলো অনেক। রাজকন্যা আর রাজত্ব। মন্দ কি?

আজকালকার ছেলেরা বিয়ে করতে ভয় পায় শুধু দায়িত্ব গ্রহণের আতংকে। তাছাড়া বেকার ছেলের সঙ্গে কোনো কর্তব্যপরায়ণ পিতা-মাতা বিয়ের প্রস্তাব আনতে সাহস পায় না। তারা জানে বিয়ের পর হবে দ্বিগুণ বোঝা। বেকার জামাই তখন ঘর-জামাই না হলেও কর-জামাই হবে। অর্থাৎ মাসে মাসে জামাইকে কর দিতে হবে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর সম্পর্ক যেক্ষেত্রে আইনসিদ্ধ সেক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মেরা লাইন দিয়ে আসতে শুরু করবে পৃথিবীতে। মা ষষ্ঠী এ ব্যাপারে অকৃপণ। অপরদিকে সমাজের প্রবাহকে রাখতে হবে সচল সক্রিয়। বংশরক্ষার জন্য চাই বংশধর। পুরাকালে রাজারা শুধু বংশরক্ষার জন্যই সিকি ডজন, আধ ডজন বিয়ে করে ফেলতেন। সিকি ডজন রানী নিয়ে দশরথ নামে এক রাজা একবার কি বিপদেই না পড়েছিলেন। এক রানীকে ঘুষ দিতে হলো আর তার বদলে হারাতে হলো জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র রামকে। তাই নিয়ে কী হুলুস্থুল কাণ্ড! সে এক মহাকাব্য।

বিষ্ণুপুর থেকে ফিরে গাঙ্গুলী সাহেবের মনটা উৎফুল্ল ছিল। প্রথমেই তাঁর ঘরে ডাক পড়লো বিকিরণ সাহেবের।

বিকিরণ, আই ওয়াণ্ট টু ট্রান্সফার মিস্টার মিট্রা।

কোথায় স্যার ?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। ব্যাটা বাঁদর বিজিটা বড়ো পাজি হয়ে উঠেছে। অশোককে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। বিজির সঙ্গে জুটেছে আরেক সমকামী সহযোগী। এলসিকে আমি পাঠালাম ওই মাতালকে সামাল দিতে। তা না করে, ও হাত মেলালো বিজির সঙ্গে। অশোককে আমি ঝাউতলা অফিসে নিয়ে আসবো অ্যালঙ্গ উইথ দ্য পোস্ট। এটা আমার ক্ষমতার মধ্যে আছে নিশ্চয়ই! তুমি একবার জি-এমের ডেলিগেশন অফ পাওয়ারটা ভালো করে স্টাডি করো। এবং আমায় জানাও আজকের মধ্যেই। বিফোর দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে।

হ্যা, স্যর। সবই ঠিক আছে। তবে ও বসবে কোথায় ? আমাদের ঝাউতলা বিল্ডিং-এ আর কোনো অ্যাকমোডেশন নেই। চেয়ার টেবিলও নেই।

দ্যাটস্ নটা প্রব্লেম। তুমি আজই অর্ডার বের করে দাও। আমার পাওয়ারটা আরেকবার চেক্ করো। লেট হিম কাম ফার্স্ট। লেট হিম কাম উইথ ফার্নিচার অল্সো।

গাঙ্গুলী সাহেবের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। তিনি চাইছেন ভাগ্নীর ভাবী বরকে কোলকাতায় বসাতে। ঝাউতলা লেনের অফিসেই তাকে বসাতে হবে। বিয়ের আগেই চাকরীর অফার। প্রথমে কর্মে নিয়োগ তারপর বিবাহে মনোযোগ। যৌতুকের সামগ্রী অগ্রিম প্রেরণই শাস্ত্রসম্মত। সমাজে এটাই হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এমন একটা পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে নিশ্চিদ্র করতে হলে প্রয়োজন একটা বাতাবরণ। একটা অ্যাটমস্ফিয়ার। যাকে বলে ফেভারেবল এনভারনমেণ্ট। এক্ষেত্রে অশোকই হবে আদর্শ উদাহরণ। সে আসবে। ঝাউতলা অফিসে বসবে। কোলকাতায় মানিয়ে নেবে। আর কৃতজ্ঞতা জানাতে স্বাভাবিক ভাবেই বসের গুণগান গাইবে। এই ধরণের গুণধর জনসংযোগের লোক দিয়ে জি-এমের পরিকল্পনা সবার কাছে সহজ করে তোলা

যাবে। অশোক নতুন পি আর ম্যান। ঝাউতলার পলিউশন ওকে কাৎ করতে পারবে না। নব উদ্যমে কর্তৃপক্ষের কীর্তন গাইবে। ম্যানেজমেণ্টের ক্ষতস্থানে প্রলেপের ভূমিকা পালন করবে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নবীন ময়রার রসগোল্লায় আপ্যায়ন করবে। যেসব নেতা রসের মিষ্টি পছন্দ করে না, তাদের জন্য বন্দোবস্ত থাকবে নকুড় নন্দীর সন্দেশ। অশোক এই প্রতিষ্ঠানে নবাগত। এখনো দূষিত হয়ে ওঠেনি। ওকে সদ্ব্যবহার করতে হবে। নতুন স্ট্রাটেজী। সম্পূর্ণ নতুনভাবে দাবার বোর্ড সাজাতে হবে। জয় তাঁর সুনিশ্চিত!

মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। সর্বশক্তিমান বিধাতা হলেন সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা। অশোক বদলী হয়ে এলো কোলকাতায়। অপরদিকে জেনারেল ম্যানেজার গাঙ্গুলী সাহেব চলে গেলেন দিল্লীতে। কর্পোরেট অফিসে তাঁরও বদলী হয়েছে। ওখানে বসেই ভারত শাসন। পূর্বাঞ্চলের বিপণন ব্যবস্থা ছড়িয়ে আছে আসামে, পশ্চিমবঙ্গে, বিহার এবং উড়িষ্যায়। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হবে কর্পোরেট অফিস থেকে। সবই রিমোট কণ্ট্রোল। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ইলেকট্রনিক এতই অগ্রসরমান যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে মানি অর্ডার করা যাচ্ছে। বিপণন ব্যবস্থা তো আরো সহজ। চাষীরা গ্রামে থাকুক। সার কিনুক স্থানীয় ডিলারের দোকান থেকে। তার জন্য একজন পদস্থ জি-এমকে কোলকাতায় বসানোর মানে হয় না। রাজধানীতেই ক্ষমতার উৎস এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের বেশী সুযোগ। কিন্তু দিল্লীতে বহু বাঘের উৎপাত। প্রতিটি বাঘই অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সেখানে মিস্টার গাঙ্গুলী একজন এমপ্লয়ী মাত্র। তাঁকে কেউ চেনে না, কেউ মানে না। শুধু মাসের শেষে একটা মোটা অংকের চেক্ টেবিলে পেঁছে যায়।

বৃন্দাবন প্লেসের কর্পোরেট অফিসে গাঙ্গুলী সাহেব বন্দী হয়ে রইলেন চার দেওয়ালের মাঝে। কোলকাতার দুর্দান্ত প্রতাপশালী সিংহ কর্পোরেট জঙ্গলে হারিয়ে গেল। নো পিয়ন, নো বাবু টু সার্ভ হিম। কর্পোরেট চক্রে পড়ে তিনি একেবারে কেঁচো হয়ে পড়লেন। ঝাউতলা অফিসের চেয়ারে বসে তিনি অফিসের ক্লাশ

ফোর স্টাফকে পর্যন্ত এয়ার-জার্নি মঞ্জুর করেছেন। ভাবী ভাগ্নী জামাই-এর বন্ধুকে আন্দামানে ট্যুরে পাঠিয়েছেন স্টাফ ফটোগ্রাফারের নামে। সে ছিল এক সময়। খেয়ালীপনার এক স্বর্ণযুগ। বড় সাহেবদের মহিমায় কতো পঙ্গু যে গিরি লংঘন করেছে তা শুধু ঈশ্বর জানেন। সবই পদমর্যাদার প্রেরোগেটিভ। সেই জি-এমই দিল্লীতে এসে একদম চুপ। তাঁর সব পাওয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কর্পোরেট অফিস তাঁকে কর্মজীবনের বাণপ্রস্তে পাঠিয়েছে। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল বোঝা গেল না। তবে গুয়াহাটিতে বসেই গুপ্ত সাহেব কেল্লা ফতে করেছেন। এক মাঘে কখনো শীত যায় না।

*　　　　*　　　　*

আসামের যত দুর্নামই থাক, তবু সে সমৃদ্ধ। চা শিল্প বিদেশী-মুদ্রার যোগানদার। সার্বজনিক সার কারখানা পানীটোলাতে সেণ্ট পারসেণ্ট প্রডাকশন। যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভাল। সব রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমীহ করেও ম্যানেজিং ডাইরেকটারকে ট্যুরে আসতে হয়। বলতে গেলে পানীটোলাই হলো এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কামধেনু। সেবার সি এম ডি, মানে চেয়ারম্যান মিস্টার খাসনবীশ যাচ্ছিলেন পানীটোলা কারখানা পরিদর্শনে। গুয়াহাটিতে স্টপ্-ওভার। যাত্রা বিরতি মানেই পরবর্তী পথের জন্য নব উদ্যম সংগ্রহ করা। এই সুযোগে মার্কেটিং ম্যানেজারের মোওকা।

কর্পোরেট অফিসের তথা কোম্পানীর পয়লা নম্বরকে এত কাছে পাওয়া, সেবা করা পরম ভাগ্যের কথা। তাঁর দেখা পাওয়া যেন ভগবানকে কাছে পাওয়া। এই সুবর্ণ সুযোগকে গুপ্ত সাহেব কাজে লাগালেন। সি এম ডি সাহেব লানচ সেরেই নেক্স্ট ফ্লাইটে যাবেন পানীটোলা। পলাসবাড়ী বিমান বন্দরে তখন কোম্পানীর গাড়ী এবং চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিস্টার হাজারিকা প্রতীক্ষারত। হাজারিকার হাজারো গুণ। সে শুধু গাড়ীঘোড়াই দেখে না। তার অধীনে আছে বিরাট এক জনসংযোগ বিভাগ। গেস্ট হাউজ দেখাশোনা করা থেকে প্রতিটি

অতিথিকে কোম্পানীর খরচে খানা-পিনা সরবরাহ করাও তার কাজ। জনসংযোগের তো শুধু একটিই পথ নয়। বহুপথের নিশানা দেখানো হলো জনসংযোগের কাজ। সেখানে বহু মতকেও এক টেবিলে জড়ো করতে হবে। আর সেই টেবিলে খাদ্য এবং পানীয়, প্রয়োজন বোধে বিশেষ বিশেষ সামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্ব হাজারিকার স্কন্ধে। সেজন্য তাকে দেওয়া আছে বিরাট অংকের বাজেট। হাজারিকা সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের একজন আদর্শ জনসংযোগ অফিসার।

হাজারিকা পলাশবাড়ীর রানওয়ের পাশে পায়চারী করতে ব্যস্ত। গুয়াহাটিতে বসে গুপ্তসাহেব তখন সময়ের সদ্ব্যবহার করে চলেছেন। সি এম ডি সাহেব লানচ করবেন। খাবার টেবিল প্রস্তুত। অ্যাপিটাইজার হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে চীল্ড বীয়ার। হিম-শীতল কিং ফিশার। পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে যে কিং ফিশারের জন্ম, জন্মের পরই আকাশ পথে উড়ে এসেছে গুয়াহাটিতে। লানচ্, স্টিমিং লানচ্ অপেক্ষা করছে রসুইখানায়। দু-রাউন্ড বীয়ার পানের পরই গুপ্তসাহেব সি এম ডির কানে কথাটা তুললেন। স্যার, কোলকাতার ঝাউতলা লেনের অফিসটায় একটু নজর দিন। কেন? হোয়াট ইজ রঙ্ দেয়ার? গাঙ্গুলী রয়েছে। ঝানু প্রশাসক।

মাপ করবেন স্যার। ওখানেই তো যত গণ্ডগোল। উনি তো জি এমের চেয়ারে বসে সবকিছু নয়-ছয় করে বেড়াচ্ছেন। আপনি জানেন নিশ্চয়ই অ্যাসানসোল-পুরুলিয়া বেল্টে আমাদের মাল এক ছটাকও বিক্রি নেই। অন্ততঃ স্ট্যাটিস্টিকস্ তাই বলে। অথচ গত দুমাসে গাঙ্গুলীসাহেব বারবার, আটবার, সফর করেছেন ঐ বন্ধ্যা ধূসর অঞ্চলে। স্যার, আপনি কি অবগত আছেন কিসের আকর্ষণে এই সফর? কোম্পানীর খরচে তিনি ভাগ্নীর বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

হোয়াট ডু ইউ মীন? তুমি বলতে চাইছ যে গাঙ্গুলী ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।

হ্যা স্যার! আপনি বিশ্বাস করুন। ঘটনাটা আমি জানি।

আপনি ইচ্ছে করলে ভেরিফাই করতে পারেন। বৃন্দাবন প্লেসে আপনার অধীনে রয়েছে চীফ ভিজিলেন্স অফিসার। ওকে একবার বলে রাখবেন ব্যাপারটা। একমাত্র ভাগ্নীর বিয়ের উপলক্ষেই মিস্টার গাঙ্গুলীর যত সফর সূচী। পাত্র নির্বাচন শেষ। তাকে ঝাউতলার অফিসে একটা চাকরীও দেওয়া হয়েছে। এবার শুধু সাত পাক বাকী।

খাসনবীশ সাহেব সব কথা শুনলেন। এবং হয়তো প্রসঙ্গটা মনে রেখেছিলেন। তাই পানীটোলা সফর শেষে দিল্লী ফিরেই তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডাকলেন। তারপর এক সংক্ষিপ্ত ডিকটেশন।

ফ্রম ঃ সি এম ডি, সি ও, ডেলহী

ফর ঃ মিস্টার বিমল গাঙ্গুলী, জি এম, এম ডি, ক্যাল।

ইউ আর ট্রান্সফারড টু কর্পোরেট অফিস, ডেলহী উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট। প্লীজ হ্যান্ড ওভার চার্জ টু ডক্টর বিকিরণ ভট্টাচার্য অ্যান্ড অ্যাভেইল আরলিয়েস্ট ফ্লাইট ফর ডেলহী। ম্যাসেজ-ওভার।

টেলেক্স মেসেজটি গাঙ্গুলী সাহেবের হাতে পেঁাছানোর আগেই সব ডিপার্টমেন্টে প্রচারিত হয়ে গেল খবর। বিপণন বিভাগের সব থেকে তাজা খবর। গরম খবর। গাঙ্গুলী সাহেব দিল্লী যাচ্ছেন। অধিকাংশ স্টাফের মুখে বিষাদের ছায়া। ঝাউতলা অফিসের বহু লোকের তিনি উপকার করেছেন। কর্তব্যের তাগিদে শাসন করেছেন। তবে কাউকে শাস্তি দেন নি। দুর্নাম তাঁর একটিই। বাঙালী হয়ে বেশ কিছু বঙ্গসন্তানের অন্নের সংস্থান করেছেন। একেই বলে চাকরী তথা চাকরগিরি। যে লোকের এতো দুর্দান্ত প্রতাপ, সর্বত্র যাঁর আধিপত্য তাঁকেই চার্জ বুঝিয়ে দিতে হয় একজন জুনিয়ারের হাতে। বিদায় নিতে হয় করুণ বদনে। গাঙ্গুলী সাহেব ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অবশেষে দমদমের পথে রওনা দিলেন। সঙ্গী শুধু ড্রাইভার কর্মকার। প্রাক্তন প্রভুকে বিমানবন্দরে পেঁাছে দেওয়া ওর কর্তব্য। যে লোক মৃত, তার দেহ শ্মশানে পেঁাছোতেই হয়। পুরাতনের বিদায় মাধ্যমেই তো নবীনের আগমন। এটাই বিশ্ব

সংসারের ধর্ম। কর্মজীবনে বদলী তো সাময়িক প্রস্থান মাত্র। বিকিরণ সাহেব চার্জ নিলেন এবং ঠিক তার পরদিনই অশোক তার নতুন দায়িতভার গ্রহণ করলো।

*　　　　*　　　　*

নতুন অফিস, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। অশোকের সব থেকে প্রধান সমস্যা হলো মার্কেটিং কালচার। এখানে সবাই চাচা-ভাতিজা। একে অপরের আত্মীয়। সর্বত্রই গা সোঁকাসুঁকির ব্যাপার। সবার পরিচয়, ইতিহাস জানা না থাকলে প্রতিদিনের পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা। ফেল করা অপেক্ষা এখানে টিকে থাকাই হয়ে উঠবে দুরূহ। ইউনিয়নের নেতার সঙ্গে বিকিরণ সাহেবের অস্বাভাবিক সখ্যতা। কর্পোরেট অফিসের বড় কর্তাদের কাছে এইসব লোহিতবর্ণের নেতারা এক একজন জঙ্গী কমরেড হলেও ঝাউতলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সবাই হিন্দী-রুশী ভাই ভাই।

কাজে যোগদানের প্রথমদিনই অশোকের স্টেনো ঝাড়ুলাল ওর কানে কানে বলে গেল, স্যর। ওই যে দেখছেন নন্দবাবুকে। ওকে ভালোভাবে চিনে রাখুন। খবরদার ওকে কিছু বলবেন না। ও হলো ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সূর্যকান্তের শ্যালক। হ্যা স্যর, সত্যি বলছি। একটুও বানিয়ে বলছি না। আর ওই যে মিহির সান্যাল। ও হলো বিকিরণ সাহেবের ভাগিনা। ঝাউতলা অফিসে শুধু বিকিরণ সাহেবেরই আছে বারোজন নিজের লোক। ওরা কাজ অপেক্ষা অকাজ করে অধিক। প্রত্যেকেই এক একজন ইনফর্মার। রাজার চর। কিচ্ছু ভাববেন না। ক'দিনের মধ্যেই সব ইতিহাস জানা হয়ে যাবে। এইজন্যই তো গুপ্তসাহেবকে কেউ পছন্দ করতো না। উনি সবাইকে মুখের ওপর বলে দিতেন ন্যায্য কথা। কোনো ঢাক ঢাক গুরু গুরুর বালাই ছিল না। ওঁকে তাই গুয়াহাটিতে নিতে হলো বনবাস। আপনি অভিজ্ঞ অফিসার। সবই জেনে যাবেন। এটা তো অফিস নয়। এ হলো এক পরিবার। মার্কেটিং ফ্যামিলী। ঝাউতলা অফিসের অর্ধেক লোক হলো গাঙ্গুলী-সাহেবের আর বাকীটা ট্রেড ইউনিয়ন দাদাদের। পর্দার আড়ালে সব ভাগাভাগি। বাইরে যত পোস্টারিংই হোক না কেন সন্ধ্যার

অন্ধকারে সবাই এক গেলাসের বন্ধু। রাজনৈতিক দাদাদের মতো এই অফিসের কর্তৃপক্ষও এক ধরণের অভিনেতা। গুণ্ডামীতে যদি প্রথমপক্ষ ওস্তাদ হয়, তবে ভণ্ডামীতে এ পক্ষ সেরা। আদর্শের নামাবলী পরিধান করে ঠুনকো নীতির কীর্তনে এরা বিশারদ।

ইউনিয়নের নেতারা মাঝে মাঝে সংগ্রামের জয়গান করে সভ্যদের মগজ ধোলাই করে। গাঙ্গুলীসাহেবের পতনের মূলে, স্যরি প্রস্থানের মূলে, তাঁর পরিবার পোষণই দায়ী। ঝাউতলা লেনে যা দেখছেন তাকি কোনো অফিসের আখ্যা দিতে পারে? এ যেন বৈঠকখানার বাজার। বৈঠকখানা রোডের বাজারও নয়। এ হলো শেয়ার মার্কেট। সর্বদাই হৈ হুল্লোড়, আড্ডা আর তাস খেলা। তাসের নামে ফ্লাশখেলা। তিন পাত্তির জয় জয়াকার। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে শেয়ার বাজারের আলোচনাও চলে। ফেরা ডাইলুশনে কোন্ শেয়ার পাওয়া যাচ্ছে নামমাত্র প্রিমিয়ামে সে খবরের জন্যও অনেকে উদগ্রীব। কেউ বা সহকর্মীর মধ্যেই সুদে টাকা খাটাচ্ছে। অনেকে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়ে রেখেছে। আসল কাজ গড়ের মাঠে খেলাধুলার কলাকৌশল বিক্রী। স্যর, এ এক বিচিত্র জগৎ। সত্যিই বেচাকেনার দপ্তর। তবে একটা বিষয়ে সবাই সতর্ক। এইসব হট্টগোলের শব্দ তরঙ্গের এক ডেসিবল্ও যেন ঠাণ্ডা ঘরে না ঢোকে। বস্দের যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

দিল্লীর বৃন্দাবন প্লেসে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়। কর্পোরেট অফিস। গাঙ্গুলীসাহেব এলেন বৃন্দাবন ধামে বিহার করতে আর খাসনবীশ সাহেব বিদায় নিলেন অপর দরজা দিয়ে। কে আর থাকতে চায় লোকসানী প্রতিষ্ঠানে? পণ্ডিচেরীতে ব্যক্তিগত মালিকানায় তৈরী হচ্ছে সার কারখানা। সেখানে আমন্ত্রণ পেলেন খাসনবীশ সাহেব। একজন করিৎকর্মা প্রকল্পবিদ কেন পড়ে থাকবেন সার্বজনিক কোম্পানীর গ্লানি বহন করতে? তিনি পণ্ডিচেরীতেই চলে গেলেন টেকনিক্যাল ডাইরেক্টার হিসেবে। বৃন্দাবন প্লেসে এলেন নতুন ম্যানেজিং ডাইরেকটার ডক্টর কে কে সামন্ত। পুরো নামটা না জানায় সবাই তাঁকে অল্পদিনের

পরিচয়েই নাম দিল কর্তব্যে কাতর সামন্ত। কৃষিবিদ হিসেবে দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি আছে। যে ব্যক্তি প্রথমজীবনে বেগুন গাছের পোকা মারতে ছাই অথবা স্যাভলনের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডক্টরেট করেছেন তাঁকে দেওয়া হলো এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার। তিরিশ হাজার কোটীর এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার গুরু-দায়িত্ব পড়লো একজন নন-টেকনিক্যাল ম্যানের ওপর।

রাসায়নিক কারখানার পুংখানুপুংখ কাজ দেখার জন্য রয়েছেন সব ঝানু জেনারেল ম্যানেজার। ন্যাপ্‌থা অথবা ন্যাচারেল গ্যাস, স্টীম জেনারেশন, অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া প্লাণ্ট নিয়ে চিন্তা করবেন জি এমরা। তাঁরা আবার পর্যায়ক্রমে নির্ভর করবেন বিভাগীয় প্রধানদের ওপর। প্রকৃতপক্ষে কারখানা চালাবেন তাঁরা। ক্যাটালিস্ট, করোশন, হর্টন স্ফীয়ারের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি নিয়ে চিন্তা করবেন এইসব দক্ষ প্রধানের দল। একজন এম ডিকে সবই জানতে হবে তাই বা কোথায় লেখা আছে? তাছাড়া যে প্রতিষ্ঠান এখনো উৎপাদনে অক্ষম সেই প্রতিষ্ঠানের এম ডির কাজ মিনিস্ট্রির সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। পুরো প্রতিষ্ঠানই যেক্ষেত্রে চলছে ভর্তুকিতে সেখানে রাজকোষাগার থেকে টাকা আদায় করে আনাই সবথেকে বড়ো বাহাদুরী। জনগণের কোষাগার থেকে রুপেয়া লাও আউর বাটো। যা মাইনে তার দেড়গুণ ওভারটাইম। এ যেন ইণ্ডাস্ট্রির এক ক্যান্সারাস গ্রোথ। কর্কটরোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। তবুও লোকে ভাবে এ যাত্রায় বেঁচে যাবে হয়তো।

ইণ্ডাস্ট্রিতে, বিশেষ করে সার্বজনিক কারখানায়, চাকরী করার এই তো বিশেষত্ব। সুযোগ, একেবারে সুবর্ণ সুযোগ। সরকারী মূলধন থেকে যতটা ঘরে তোলা যায় তাই হবে পরবর্তী প্রজন্মের সঞ্চয়। এই প্রতিষ্ঠানের মজদুরেরা জানে প্রতিদিনের হাজিরার জন্য মাইনে তারা পাবেই। কিন্তু কাজ করার জন্য চাই ওভার টাইম। ওটির নেশাই তাদের কারখানায় আকর্ষণ করে। মাসের শেষে ওটিই হলো ফ্রুটি। একেবারে রসাল ফল। এই অপরিকল্পিত অতিরিক্ত আয়ের নেশাতেই সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান তথা কারখানা-গুলো লালবাতি জ্বালাচ্ছে। ডকে উঠছে। কারখানায় উৎপাদন

হোক, আর নাই হোক, মাইনে তাদের মিলবেই। যতদিন আছে অশোকচক্র ততদিন থাকবে এই চক্রান্ত। কোনো কাজ না করে কর্তব্য পালনের নাটক। ওয়ার্ক'স নাই বা থাকলো, ওয়েজেস্ থাকবেই।

আজব এক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছেন নেহেরুজী। সরকারী অর্থে কয়েকলক্ষ স্বার্থপর দৈত্যের রসদ বণ্টন। সার্বজনিক সার কারখানায় যে এম ডিই আসুন না কেন তাঁর পরমায়ু পরিমিত। প্রথমে কাজে যোগদান করে বেশ গরম গরম বক্তৃতা দেবেন। শ্রমিক স্বার্থ দেখা হবে। কর্তব্যে অবহেলা চলবে না। অপদার্থ টেক্‌নোক্র্যাটদের ঝেটিয়ে বিদায় করা হবে। নতুন এক একজন এম ডি এসে চেষ্টাও করেন। তবে তার আগে কেনেন লাক্‌সারী ফ্ল্যাট। নিজের ব্যবহারের জন্য কনটেসা গাড়ী এবং তা অবশ্যই হতে হবে বাতানুকূল। অপরদিকে সব ম্যানেজারের বিমান সফর বাতিল করে নিজে ঘুরে বেড়ান শুধুই আকাশপথে। ব্যয় সংকোচ বলতে হয়তো একেই বোঝায়। যেখানেই তাঁর সফর, সঙ্গে যাবেন আধডজন সাক্‌রেদ। এঁদের পরামর্শেই প্রতিষ্ঠানটি দেনার দায়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এঁদের নিয়েই আবার নতুন চিন্তা ভাবনা। নতুন বোতলে পুরানো মদ।

কর্পোরেট অফিসের পরামর্শ নিয়েও নতুন এম ডি অনুভব করেন যে এই প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক-কালচার তাঁর ধমনী গ্রহণ করতে অক্ষম। তাই বিদায়। প্রতি বছরে না হলেও, দুবছরে তিনজন এম ডির আগমন এবং প্রস্থান এখানে সাজানো নাটকের অঙ্গ। এইসব আয়ারাম গয়ারামকে দিয়ে কোম্পানীর হাল ফেরানো মুস্কিল। মিনিস্ট্রিও জানে এই কোম্পানীর কোনো সম্ভাবনা নেই। নেই কোনো ভবিষ্যৎ। তবুও পুষতে হয় রাবণের বংশ। উপায়ই বা কি? ভোট বাক্সের দিকে নজর রাখতে হলে কারো ওপর কঠোর হওয়া কঠিন। মন্ত্রী হলেন আধুনিক যুগের অবতার। তিনি যা চাইবেন তাই হবে। একটা বড়ো পরিবারের সবাই কি কাজের লোক হয়? দু-চারজন অপদার্থ তো থাকবেই। তাদের কাজ শুধু অন্ন ধ্বংস করা। কিন্তু তবুও সংসার চলে যায়। এদেশের মহান কর্মযজ্ঞে এইসব কর্মিদল হলো একধরণের পরগাছা। তারা

সরকারী মহীরুহকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। শোষণ করে চলেছে জনগণের পরিশ্রমের ফসল। রাজস্ব যার নাম তার বড়ো অংশীদার হলো সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের কর্মিদল। এই বিনা উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং ডাইরেকটার হয়ে এলেন সামন্ত সাহেব। ডক্টর কে কে সামন্ত।

সামন্ত সাহেব বেশ ভাল ভাবেই জানেন এই সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। টেক্নোক্র্যাটরা তাঁকে পাত্তাই দেবে না। তবুও মিনিস্ট্রির ইচ্ছা তাই তাঁর আগমন। এটা তাঁর স্টেপিং স্টোন। অন্য কোনো সুবিধাজনক ডাঙ্গায় লাফ দেবার জন্য এই পদটা তাঁকে সাহায্য করবে। কর্ম-জীবনের শীর্ষে পেঁছিতে এই মধ্যবর্তী ধাপটিরও প্রয়োজন আছে। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপই তাঁকে অতিক্রম করতে হবে অত্যন্ত সন্তর্পণে। বৃন্দাবন প্লেসে বসে তিনি শুধু কয়েকটি মিটিং করলেন। জি-এমদের ডেকে পাঠালেন। কারখানার জি-এমরাও জেনে গেছেন এই কৃষিবিদ এম ডি দিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা চলবে না। কিন্তু কিছুই করার নেই। মিনিস্ট্রিতে খুঁটি পাকা আছে ডক্টর সামন্তের। ওঁকে না ঘাটানোই মঙ্গল।

কর্পোরেট অফিসে জমজমাট মিটিং। গাঙ্গুলী সাহেব সেখানে অনুপস্থিত। তিনি বৃন্দাবন প্লেসের এক কোনের ঘরে বন্দী-জীবন কাটাচ্ছেন। নেই সেই জমিদারী মেজাজ। নেই হাঁকডাক আর আত্মম্ভরিতা। কোলকাতার ঝাউতলা অফিসে শোনা গেল গাঙ্গুলী সাহেব বেশ আরামেই আছেন। কোনো দায়িত্ব নেই, নেই কোনো চাকরীর চ্যালেঞ্জ বনাম টেনশন। বীরভূমের কবি কুমুদ-রঞ্জন মল্লিককে নিয়ে তিনি পড়াশুনায় ব্যস্ত। তাঁর সখ সেই গ্রাম্য কবির মেঠোসুরকে বিশ্বসভায় পেঁছে দেবেন। সেজন্য প্রয়োজন ভালো অনুবাদ এবং অবশ্যই তা হতে হবে ইংরেজিতে। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর আজন্ম অধিকার। ইংরেজিতে অনুবাদ তাঁর আয়ত্বের মধ্যে। ইতিমধ্যে ঝাউতলা লেনের অফিসে বসে বেশ কয়েকটি কবিতা পাঠের আসর বসিয়েছেন। সেইসব আধুনিক কবিদের আমন্ত্রণ, আপ্যায়ন এবং অনুষ্ঠান শেষে এক একটি করে উপহারের প্যাকেটও ব্যবস্থা করেছিলেন কোম্পানীর খরচে।

এইসব সৌখিন সাহিত্যের মজদুরি দেখার জন্য ছিল একজন পিয়ারো। পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার (পোয়েটস্)। ব্র্যাকেটে দেওয়া পদবী অবশ্য দেওয়া হয়েছিল ব্যঙ্গ করে। গাঙ্গুলী সাহেবের সাহিত্যপ্রীতি মার্কেটিং ডিভিশনের সর্বত্র প্রচারিত। ইংরেজি ভাষায় যে কী অদ্ভুত দখল তার পরিমাপ ক্ষমতা মিনি কেরাণীদের নেই। তবে অনেক কঠিন, অপ্রচলিত ইংরেজি শব্দের ব্যবহার দেখে বস্‌কে তারিপ না করে উপায় ছিল না। যে কথা শুনে অভিধান খুলতে হয় তার অর্থ জানতে, সে শব্দ ব্যবহারের কি দরকার? গাঙ্গুলী সাহেবের ওখানেই ছিল বৈশিষ্ট্য। বাহাদুরী। এ একধরণের চাতুরীও বটে। প্রতিটি শব্দ যদি সবাই সহজে বুঝে নেয় তবে সেই শব্দ প্রয়োগের গাম্ভীর্য কোথায়? এ নিয়ে তিনি ঝাউতলা অফিসের কয়েকজন পদস্থ অফিসারকেও জব্দ করেছেন। একজন অফিসার তাঁর মুখে মুখে তর্ক করেছিলেন। তাঁকে শাস্তি-মূলক বদলী করা হলো বিহারের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে।

একবার এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। লালতু চক্রবর্তী কোলকাতায় এসেছে। জি-এম সাহেবের কাছ থেকে একটা ফিনান্‌সিয়াল অ্যাপ্রুভাল নিতে। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় একটি প্রদর্শনী মঞ্চ করাতে চান বিধাননগরের আর এম বিজি সাহেব। এলসিকে পাঠিয়েছেন ট্যুরে। কোলকাতা থেকে হাতে হাতে স্যাংশন করাতে হবে। তাই হাতে নোটশীট নিয়ে এলসি উপস্থিত গাঙ্গুলী সাহেবের কামরায়। সাহেব তো নোটশীট পড়েই এক বাজখাই গলায় চিৎকার ছাড়লেন। প্রদর্শনীর ইংরেজি প্রতিশব্দ এগজিবিশন তা সবাই জানে। সেই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ন'বার। এবং প্রত্যেকবারই বানান ভুল।

গাঙ্গুলী সাহেব বল্লেন, বুঝলে শ্রীমান লালতু। তুমি একটি ফালতু অফিসার। একেবারে অপদার্থ, ইউসলেস্। এগজিবিশন বানান জানো না। কোথাকার স্কুলে পড়েছ হে?

স্যর, ওটা আমার ভুল নয়। ওটা টাইপিং মিস্টেক।

শাট্ আপ্ ইউ ইডিয়ট। ইউ হ্যাভ নো নলেজ অ্যাবাউট ইট্। ধানচাল দিয়ে পড়াশুনা করেছ নাকি? টাইপিস্ট ভুল করলো

আর তুমি অন্ধের মতো একটি সই মেরে দিলে। আবার সেই নোটশীট বগলে নিয়ে কোলকাতায় চলে এলে ট্যুরে। তুমি একটি গর্দভ। ম্যানেজার হয়ে ভুল নোটশীটে সই করলে কোন্ আক্কেলে? তোমার দ্বারা কোম্পানীর কোনো উপকার হবে না। ক্যান ইউ জাস্টিফাই য়ুয়োর স্যালারী? আমি এক্ষুণি এস টি ডিতে বৃন্দাবনকে বলে দিচ্ছি তোমার ট্যুর ক্যান্সেল করতে।

স্যর, ভুল হয়ে গেছে। একবারটি মাপ করে দিন। অতটা নির্দয় হবেন না। আমি ভাবলাম একদিন ছুটি নিয়ে বাড়ীর নকশাটা করিয়ে আনি কোলকাতা থেকে। বিজি সাহেব বল্লেন, এলসি হোয়াই ডু ইউ স্পেণ্ড ফ্রম য়ুয়োর পকেট। এই নোটশীটটা সঙ্গে নিয়ে যাও। পাঁচ মিনিটের কাজ। আর যাতায়াত খরচ হয়ে যাবে কোম্পানীর খাতে। খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। নোটশীট পড়ার সময় হয়নি। স্যর, প্লীজ ফরগিভ মী। এমনটি আর কখনো হবে না।

তুমি যেতে পার। আমি এখানে বসেই পৌষমেলায় পার্টিসিপেট করার বন্দোবস্ত করছি।

*   *   *

গাঙ্গুলী সাহেব কর্পোরেট অফিসের ঘরে বসে অনুবাদ করে চলেছেন কুমুদরঞ্জনের কবিতা। একেবারে খাস রাজভাষায়, ইংরেজিতে। অল্পদিনের মধ্যেই কবির সমগ্র কবিতা অনুবাদ সমাপ্ত। এবার চাই প্রকাশক। কোলকাতায় থাকলে এ ব্যাপারে কোনো সমস্যাই হতো না। অনেক পার্টিই দু-একটা কাজের বিনিময়ে এ ধরণের অনুরোধ সহাস্যে পালন করে থাকে। এক ভল্যুম বই ছেপে প্রকাশ করতে কতোই বা খরচ? কিন্তু খাস দিল্লীতে বসে তা সম্ভব নয়। ইণ্টারকামে ডেকে পাঠালেন কর্পোরেট পিয়ারোকে।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায় বৃন্দাবন প্লেসের মুখ্য জনসংযোগ অফিসার। দীর্ঘদিন এ অফিসে আছে। খুঁটি পাকা। এক নম্বর মাল খাওয়া পার্টি। ওর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজধানী শহরে প্রতিষ্ঠানের প্রচার করার। যে জাহাজ ডুবে যাচ্ছে তাকেও

জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে হবে, জাহাজ ডুবছে না। ওটা মিডিয়াম্যানদের ভুল তথ্য পরিবেশনের নেশা। তাদের দেখার ভুল। জনসংযোগ বিভাগ কি না পারে? গল্পের গরুকে গাছে তুলে দিতে পারে। আবার নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে পয়লা নম্বর সাহেবকেও পাতালে পাঠাতে পারে। গাঙ্গুলী-সাহেব অভিজ্ঞ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। কৌশলে কাজ হাসিল করতে ওস্তাদ। তিনি ডেকে পাঠালেন বিপুলকে। জি-এমের কল পেয়ে বিদ্যুৎগতিতে এসে উপস্থিত সে। ওকে সামনে পেয়ে গাঙ্গুলীসাহেব শুরু করলেন।

বুঝলে বিপুল, এ হলো কোম্পানীর কর্পোরেট অফিস। সর্বদাই ভি আই পির আগমন। ওঁদের কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি তুলে ধরা দরকার। ইমেজ বিল্ডিং-এর জন্য কিছু করা প্রয়োজন। এখানে বিধাননগর, পানীটোলা, রামনগর এমন কি নন্দীগ্রাম প্রকল্পের কয়েকটি মডেল রাখলে কেমন হয়? কতো ডিগনিটারীজ আসেন এই অফিসে। কতো মিটিং, কতো সীটিং তাঁদের সঙ্গে। তাঁদের সামনে তুলে ধরা দরকার আমরা কি করতে চলেছি পূর্বাঞ্চলের চাষীদের জন্য। ভারতবর্ষ হলো কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষকের জন্য একটু মায়াকান্না দেখাতে পারলে লাভ অনেক।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায় ঝানু পিয়ারো। এই অফিসে বসার সুবাদে কতো সি এম ডিকে আসতে দেখলেন। আবার চলে যেতেও দেখলেন। ওঁদের আগমন মুহূর্তে ফ্লাওয়ার-বোকে নিয়ে তাকেই দাঁড়াতে হয়েছে। আবার বিদায় বেলায় সেই ফুলের তোড়াতেই সম্পর্কের ইতি টানতে হয়েছে। গাঙ্গুলীসাহেবের মুখের হা দেখেই খিদের পরিমাপটা বুঝে গেল বিপুল। কাল বিলম্ব না করে খবর পাঠালো কোলকাতার ডায়নামিক কমিউনিকেটরকে।

কোম্পানীর এক নম্বর এক্সিকিউটিভ মিস্টার নাহাটা পরবর্তী উড়ানে চলে এলো দিল্লী। তারপর গাঙ্গুলীসাহেবের ঘরে বসেই আলাপ, আলোচনা এবং কাগজপত্তর তৈরী হয়ে গেল। মাত্র বিশ লাখ টাকায় রাজী হয়ে গেল মিস্টার নাহাটা। বৃন্দাবন প্লেসে তাদের তৈরী একটি মডেল থাকবে এতো খুবই সুখের কথা।

প্রথমে দুটো মডেল তার কোম্পানী তৈরী করবে। কর্তৃপক্ষ কাজ দেখে খুশী হলে অর্ডার রিপিট হবে। বিপুল তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পথ ধরে গাঙ্গুলীসাহেবকে বুঝিয়ে দিল যে, এই ধরণের কাজে এই কোম্পানীই সর্ব ভারতে একমাত্র বিশেষজ্ঞ। একস্‌পার্ট ইন মডেলিং তথা মডেল মেকিং। মডেল তৈরীতে এদের কোন জুটি নেই। সরকারী নিয়মে দুশ টাকার কোনো কাজের জন্য টেণ্ডার ডাকা আবশ্যক। এটাই প্রথা। প্রচলিত নিয়ম। নিয়ম থাকলে অবশ্যই তার ব্যতিক্রম থাকবে। জেনারেল ম্যানেজারের ক্ষমতা আছে যে কোনো জিনিস তিনি কিনতে পারেন সিঙ্গল কোটেশনে। শুধু টাকার অংক যেন পঁচিশ লাখ অতিক্রম না করে। গাঙ্গুলীসাহেব নিজেই কমিটিতে থেকে দশ সপ্তাহের দীর্ঘ প্রথাগুলো দশ ঘণ্টায় সমাধান করে দিলেন। একই দিনে আলাপ, কাজের প্রস্তাব, দাম-নির্ধারণ এবং কাজের বরাত পেয়ে গেল ডায়নামিক কমিউনিকেটর অফ ক্যালকাটা। পারচেস্‌ অর্ডারটি মিস্টার নাহাটার হাতে তুলে দেওয়ার সময় বিপুল শুধু একবার কি একটা ইঙ্গিত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর শোনা গেল, নো প্রবেল্পম। নো প্রবেল্পম! ইটজ্‌ মাই প্লেজার।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সমগ্র কাব্য ইংরেজিতে প্রকাশিত হলো। একখণ্ডে সমগ্র রচনা সন্নিবিষ্ট করার কৃতিত্ব গাঙ্গুলীসাহেবের। ইংরেজিভাষায় কতোটা দখল থাকলে একাজ সম্ভব সেকথা সাহিত্য সমালোচকেরা জানেন। তিনি ভেবেছিলেন এ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর সারা শহরে সাড়া পড়ে যাবে। কিন্তু তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্তাবক ছাড়া আর কোনো পাঠক এই অমূল্য গ্রন্হকে ততটা গুরুত্ব দিল না। সমালোচকেরা প্রায় সবাই একবাক্যে লিখলেন, এই দুর্মূল্যের বাজারে অতটা কাগজের অপব্যবহার না করলেই ভাল করতেন এই উচ্চাকাংক্ষী অনুবাদক। তবে সেজন্য গ্রন্হটির অমর্যাদা হলো না। ঝাউতলা অফিসের বেশ কয়েকজন সেলস্‌ অফিসার বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। সারের ডিলারের হাতে তুলে দেওয়া হলো গ্রাম্য কবির মেঠো সুরকে। তবে ভাষা জানা না থাকলেও অনুবাদক কোম্পানীর একজন বড়কর্তা। তাঁকে

খুশী করতেই তারা সাগ্রহে সেই গ্রন্থ সংগ্রহে আগ্রহ দেখালো। প্রতিটি ডিলারের গদীতে শোভা পেল 'লিরিকস অফ আ বেঙ্গলী পোয়েট'।

অশোককে ডেকে বিকিরণ সাহেব বল্লেন, মিস্টার মিট্রা। দেখুন তো কয়েক কপি বিক্রি করতে পারেন কিনা? গাঙ্গুলী সাহেব এস টি ডি করেছিলেন দিল্লী থেকে। তিনি জানতে চান মোট ক'কপি পাঠকের হাতে পেঁছলো।

অশোক গ্রন্থখানি স্পর্শ করেই অনুভব করলো গাঙ্গুলী সাহেবের সৃষ্টিকে। কে বলে জি-এম সাহেব চিরকুমার? এই সৃষ্টির মাধ্যমেই তিনি বেঁচে থাকবেন সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জির পাতায়। কোনো রাজনৈতিক নেতা অথবা মন্ত্রীর রচনা হলে তবু বলা যেতো, যুগ যুগ জিও। কিন্তু কোনো চাকুরীজীবির পক্ষে সে প্রচার অসম্ভব। সার্ভিস কনডাক্টে আটকাবে। তারপর উঠবে ভিজিলেন্সের হ্যাপা। বই ছাপার আগে কর্তৃপক্ষ পাণ্ডুলিপি দেখেছিল কিনা, প্রকাশনার অর্থব্যয় কে বহন করলো ইত্যাদি ইত্যাদি।

বঙ্গের রাজধানী শহর কল্লোলিনী কোলকাতায় সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের যতটুকু প্রচার তার মূলে গাঙ্গুলী সাহেবের অবদান। কবি সম্মেলন ডেকে, প্রেস কনফারেন্স করে, সাংবাদিকদের রসেবশে রেখে তিনি এই কোম্পানীর নাম-প্রচারে কসুর করেননি। সেজন্য কোম্পানীর খরচ হতো। সে ব্যাপারে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। জনসংযোগ বিভাগকে রাখা হয়েছে এই ধরণের খরচ করার উদ্দেশ্যে। তিনি এসব কাজ বুঝতেন ভাল। তবে হ্যা, তাঁর চাল চলনে এবং আচরণে জমিদারী আমেজ এনেছিলেন। এসব অনেকেরই সহ্য হলো না। কর্পোরেট অফিসে যাওয়ার ফলে তাঁর উপকারই হয়েছে। কোলকাতার ব্যস্ততায় যে কাজ শুরু করতে পারেন নি তা সম্পন্ন হলো বৃন্দাবন প্লেসে বসে।

গাঙ্গুলী সাহেব আছেন কবিতার জগতে। মাত্র ছ'মাসের মাথায় অনুবাদ, প্রকাশনা সব শেষ। কিন্তু তিনি জানেন না ইতিমধ্যে কর্পোরেট অফিসে এসেছে রাজা বদলের পালা। ডক্টর সামন্ত চলে যাচ্ছেন মহারাষ্ট্রের এক কোম্পানীতে। সেই নতুন কোম্পানী তৈরী

করবে কিচেন গার্ডেনের জন্য সারের প্যাকেট। সেই প্যাকেট পাওয়া যাবে মহানগরীর সব সুপার মার্কেটে। ওরা সামন্ত সাহেবের মতো একজন কৃষি বৈজ্ঞানিকই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। খবরটা পেয়েছিল ঐ কোম্পানীর এম ডি মিস্টার প্রেমচাঁদ পটেল। সে তখন লণ্ডনের কোভেণ্ট গার্ডেনে মার্কেট স্টাডিতে ব্যস্ত। সেখানেই খবর পায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর। এবং দেশে ফিরে সরাসরি অফার। সামন্ত সাহেব ছমাসেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিদায় নিলেন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক সি এম ডি এলেন। অনেকেই অনুমান করেছিল এবার হয়তো গাঙ্গুলী সাহেবের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। কিন্তু দেখা গেল নন্দীগ্রামের জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার প্রবাল মজুমদার নতুন সি এম ডি হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এমন একটি রাজকীয় পদ কি সভার ভাগ্যে জোটে? মন্ত্রী খুশী হলে কখনো বা ভাগ্যের দরজা যায় খুলে।

মজুমদার সাহেব ছিলেন দুর্দান্ত প্রতাপশালী জি এম। ভীষণ আদর্শবাদী এবং যুক্তি দিয়ে সব উপলব্ধি করতেন। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রচারের জন্য আপ্রাণ খেটে যেতেন। ওয়ার্কাররা ওঁর কাছে কেঁচো হয়ে থাকতো। ওঁর একটি মাত্র নির্দেশ—আগে কাজ, পরে দাবী দাওয়া। কিন্তু যেদিন ওঁর মতো সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে একজন কনিষ্ঠতম জেনারেল ম্যানেজারকে কর্পোরেট অফিসে বসানো হলো সেদিন থেকেই হাল ছেড়ে দিলেন। মন ভেঙ্গে গেলেও মুষড়ে পড়েন নি। বরঞ্চ আরো বেপরোয়া হয়েছেন। ডেস্পারেট হয়েছেন। একদিন ছিল যখন এইসব অলংকৃত পদগুলো বঙ্গসন্তানেরাই দখল করতো। তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি আর মেধার জোরে তারা পেয়ে যেতো এইসব কী-পোস্ট। কিন্তু বাঙালীর আরো একটি বিশেষত্ব আছে। দলাদলির খেলায় তারা চিরদিনই খ্যাত। সেজন্য বহু নামী দামী বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ ধরাশায়ী হয়েছেন। আর সেইসব শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে পঞ্চনদের সাহসী পুরুষেরা।

ঋতু পরিবর্তনের মতো বৃন্দাবন প্লেসেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে লাগলো। কর্পোরেট অফিসের এক নম্বর একজিকিউটিভ হয়ে

এলেন মিস্টার মজুমদার। তবে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিল একটি চুক্তি। কার্যভার গ্রহণ করে মজুমদার সাহেবের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে কোম্পানীর কর্পোরেট অফিসকে কোলকাতায় স্থানান্তরিত করা। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। কার্যভারের সাতদিনের মধ্যেই খবর পাঠানো হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে। রীতিমতো সিক্রেট কোডে। নতুন বিগ বসের রুচি, অভ্যাস এবং ব্যক্তিগত দুর্বলতার তালিকা পেঁছে গেছে বৃন্দাবন প্লেসে। বসের সময় বিনোদনের কি কি উপাচার চাই সে সঙ্কেতও পাঠানো হয়েছে। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ফাগুলাল তার টেলিফোন ডায়েরীতে বিশেষ বিশেষ ফোন নাম্বারের পাশে লাল-চক্র এঁকে রেখেছে। যেমন দেবতা, তেমন তাঁর পুজো।

নতুন সি এম ডির প্রবল ইচ্ছা কোলকাতার অফিসে তাঁর একজন বিশ্বস্ত সৈন্যকে মোতায়েন করা। বৃন্দাবন প্লেসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমেই তিনি নন্দীগ্রাম থেকে বদলী করলেন প্রবীর বোসকে। পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার মিস্টার বোস। ট্রান্সফার অর্ডারের টেলেকস্ কপি নিয়ে সে সোজা হাজির ঝাউতলা লেনের অফিসে। বিকিরণ সাহেব এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তাঁর অধীনে তখন আধডজন পিয়ারো। কে কোথায় বসবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এ যেন গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। তিনি যোগাযোগ করলেন দিল্লীতে। সমস্যার কথা বললেন। ঝাউতলায় স্থানাভাব আছে সে কথাও জানালেন।

উত্তরে মজুমদার সাহেব শুধু বল্লেন, ডক্টর ভট্টাচার্য, প্লীজ সী দ্যাট মিস্টার বোস সেটলস্ দেয়ার ইমিডিয়েটলী। হী ইজ মাই ম্যান। নতুন সি এম ডি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রবীরকে যেন জনসংযোগের অধিকর্তা হিসেবে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়।

জনসংযোগের প্রধান কাজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্যকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। প্রতিষ্ঠানের প্রচার তথা ভাবমূর্তি গঠন করা। এ ব্যাপারে প্রবীর বোস দক্ষ কারিগর। নন্দীগ্রামে থাকা কালে কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরই সে স্বপ্নের জাল বুনেছিল। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ বাসীর সামনে তুলে ধরেছিল সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন।

প্রতিটি দেওয়ালে উজ্জ্বল অক্ষরে ঘোষণা করা হয়েছিল, নন্দীগ্রাম এনে দেবে প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সে কারখানায় কোনোদিনই সার উৎপন্ন হয়নি। সে একজন কেরিয়ারিস্ট। নিজের পদোন্নতির জন্য কখন কি করতে হবে তা ওর নখদর্পণে। শুধু কাজ করলেই তো আর প্রমোশন হয় না। কর্তৃপক্ষের সেবাও চাই। কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করার জন্য ওর তূণে আছে নানা কৌশল। ম্যানেজমেণ্টের দুর্বলতার ক্যাপসুলগুলো রাখা থাকে ওর পকেটে। আর কোলকাতার সাংবাদিকরা হলো ওর জিগরী দোস্ত। একেবারে ল্যাংটোকালের বন্ধু। ওর এইসব ব্যাকগ্রাউণ্ড কর্তৃপক্ষ জানে। কর্তৃপক্ষ একথাও জানে যে মিস্টার বোস বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরশীল। গোপনীয়তা বজায় রাখতে জানে। বিকিরণ সাহেবকে ইতিমধ্যেই •সি এম ডি বলে রেখেছেন। মিস্টার বোস যেন বিনা বাধায় সব কাজ করতে পারে। হী শুড্ বী কমফোটেবল অ্যাট ঝাউতলা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। বিকিরণ সাহেব তো উপলক্ষ মাত্র।

মজুমদার সাহেবের ইচ্ছায় প্রবীর বোস ঝাউতলা অফিসে বার্থ পেয়ে গেল। বড় সাহেবকে খুশী করার জন্য ওকে বসতে দেওয়া হলো ভিজিটিং ডিরেকটারের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। ঘরটি বেশ বড়, সাজানো এবং অতিথি আপ্যায়নের পক্ষে আদর্শ। প্রবীর বড় সাহেবের লোক এ সংবাদ কানাকানি প্রচারিত হয়ে গেল। রিজিওন থেকে মার্কেটিং ম্যানেজাররা কোলকাতায় ট্যুরে এসে প্রথমেই খোঁজ করেন ওকে। সি এম ডির প্রোগ্রাম এবং গতিবিধি ওর কণ্ঠস্থ। বিগ বস্ কোলকাতায় আসছেন কিনা তা জানার আগ্রহ সবার। মজুমদার সাহেবও এ শহরে এলে খুশী হন। দেহমন চাঙ্গা হয়। উৎফুল্ল থাকেন। অবসর বিনোদনের জন্য বস্ কি করতে ভালোবাসেন, কোন্ খেলা পছন্দ করেন প্রবীরের তা জানা আছে। আসলে একজন পারদর্শী জনসংযোগ অফিসারের প্রথম কাজই হলো বড় সাহেবের মন-মর্জি-রুচি সম্পর্কে সচেতন থাকা। কোম্পানী চার হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে রেখেছে কিসের জন্য ? বড় সাহেবকে সেবা করা আর ভগবানকে সেবা করা একই ব্যাপার। সেই সেবার সুবাদে তারও গুরুত্ব বেড়ে যায়।

অন্যান্য অফিসাররাও তাকে খাতির করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রবীর ঝাউতলা অফিসে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা জনসংযোগ নির্ভর। এই সংজ্ঞা মনে রেখেই গাঙ্গুলী সাহেব ঝাউতলা অফিসকে জনসংযোগ মুখর করে গেছেন। আধডজন পিয়ারো এখানে বসে বসে তামাক খায় আর অপরের নিন্দা স্তুতিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। এই বিভাগের মধ্যমণি সমর সাহা। পদবীতে কনিষ্ঠ জনসংযোগ অফিসার। তবে প্রতিষ্ঠায় এবং প্রতিপত্তিতে অদ্বিতীয়। একদা কনিষ্ঠ কেরাণী হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছিল। লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না বলে বাবা ভজন সাহা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সার্বজনিক সার কোম্পানীর চীফ সিকিউরিটি অফিসার। বড় সাহেবদের সঙ্গে সর্বদা ওঠা বসা। সুযোগ বুঝে অশিক্ষিত পুত্রের জন্য একটি ভিক্ষা চেয়েছিলেন। একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের কাজ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

সমর সাহা এই প্রতিষ্ঠানে ঢুকেই বুঝে নিয়েছিল এখানে সব এলো-মেলো ব্যাপার। আর এলোমেলো আছে বলেই লুটে পুটে খাবার সুযোগ। কনিষ্ঠ কেরাণী হয়ে অনুপ্রবেশ। তারপর প্রতি তিন বছরে এক একটি প্রমোশন। নিয়ম মাফিক প্রমোশনের সিঁড়ি বেয়ে আজ সে জুনিয়ার পিয়ারো। ইচ্ছা করেই সে জনসংযোগ বিভাগ বেছে নিয়েছিল। এখানেই কর্তৃপক্ষকে ভজনার পর্যাপ্ত সুযোগ। বিদ্যায় বুদ্ধিতে তেমন প্রাধান্য না থাকলেও দুষ্টবুদ্ধিতে তুখোর এই সমর চরিত্রটি। একজন ম্যানেজ মাস্টার। ঝাউতলা লেনের সব ম্যানেজারই ওর ওপর খুশী। ফাই ফরমাস খাটতে পারে অক্লান্তভাবে। সে জানে আজকের কুঁড়িই আগামীকালের ছুরি। আজ যে মার্কেটিং ম্যানেজার সেই হবে ভবিষ্যতের জেনারেল ম্যানেজার। তাই সেবার ইনভেস্টমেণ্ট যদি করতেই হয় তবে এটাই প্রকৃষ্ট সময়। সে জানে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম থেকে যেসব অফিসার কোলকাতা আসে ট্যুরে তারা কি চায়। তাদের অবসর সময় কিভাবে কাটবে। তাই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, সোনাগাছির গলিগুলো ওর বিশেষভাবে জানা। কোম্পানীর ড্রাইভারগুলোও জানে এইসব

ট্যুরিং অফিসারদের কোথায় নামাতে হবে সন্ধ্যার পর। ওরা ভালোভাবেই জানে বাইরে থেকে যে বাবুরা আসে অফিসের নাম করে তারা ফূর্তি করতে চায়। কোলকাতায় এসে ফূর্তি করার মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। সমর তার ডায়েরীতে সোনাগাছি পাড়ার কলগার্লের প্রাইভেট নাম্বারগুলো টুকে রাখে। বলা তো যায় না কখন কাকে পাওয়া যায়। পাটলীপুত্র থেকে সেলস্ অফিসার এসেই খোঁজ করে, হোয়ার ইজ আওয়ার সমরবাবু। সমরও এসব ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এ হলো কোলকাতার ইনভিসিবল্ ট্রেড। কোনো ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেণ্ট নেই। বিনা পুঁজিতে লাভ। একবার দোকান খুলতে পারলেই ভূরি ভূরি খদ্দের। ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা।

প্রবীর বোস ঝাউতলা লেনে কাজে যোগদানের এক সপ্তাহের মধ্যেই সমরের ক্ষমতার কথা জেনে যায়। ওর আভ্যন্তরীণ জনসংযোগের তারিপ করে। সে ঠিক করে নিয়েছে মার্কেটিং ডিভিশনে যদি জনসংযোগের গুরুত্বের কথা একবার বোঝাতে পারে তবে আখেরে অনেক লাভ। কর্তৃপক্ষকে কনফিডেন্সে আনতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। ধৈর্যের পরীক্ষায় ওকে পাশ করতেই হবে। ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর্ মেথডে কাজ করতে হবে। এগোতে হবে ধীর পদক্ষেপে। গ্রাম্য প্রবাদে আছে, মাণিকে মাণিক চেনে আর শুয়োরে চেনে কচু। প্রবীর সহজেই চিনে ফেলেছে সমরকে। সেও দেখলো যে লোক স্বয়ং চেয়ারম্যানকে মাল সরবরাহ করে সে সাধারণ চিজ নয়। ওর সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, সখ্যতা রাখা বাঞ্চনীয়। বস্ যদি খুশী থাকে তবে অন্য সবাইকে বশ করতে কতক্ষণ?

প্রবীর আর সমর বেশ ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। ঝাউতলা অফিসে ওরা এক মাণিকজোড়। জগাই মাধাই বলতে যা বোঝায় ওরা দু'জনে ঠিক তাই। সব সময়েই কানে কানে কথা। হুইস্পারিং ক্যাম্পেন। গোপনে কি যে পরিকল্পনা অথবা ষড়যন্ত্র চলে তা শুধু ঈশ্বর জানেন। কোনো একটা কাজের ছুতো করে অফিসের বাইরে চলে যায়। কোথায় যায় তা জানা শিবেরও অসাধ্য। কর্পোরেট অফিসে

স্বয়ং চেয়ারম্যানের কাছে যার খুঁটি বাঁধা তাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। বিকিরণ সাহেবকে পাত্তাই দেয় না প্রবীর। এ যেন বিবাহিতা যুবতী বৌ স্বামীকে উপলক্ষ্য রেখে সমাজে নষ্টামি করে বেড়ানোর মতো অবস্থা। সে কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। কোন্ বন্ধুকে পার্ক স্ট্রীটের বারবেকিউতে আপ্যায়ন করছে তা বোঝার উপায় নেই। সেই খানাপিনার বিল সংগ্রহ করছে সমর। এবং তা দেখানো হচ্ছে মিডিয়াম্যানের এণ্টারটেইমেন্ট হিসেবে। এসব ব্যাপার যাচাই করার হিম্মত নেই বিকিরণ সাহেবের। তাঁকেও তো আরো কয়েকটি বছর চাকরী করতে হবে। অযথা সাপের ল্যাজে পা দিয়ে লাভ কি? নিজের বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কোনো লাভ নেই।

প্রবীরের এটাই এক টেকনিক্। যেখানে সেখানে যথেচ্ছভাবে খরচ করবে। প্রতিষ্ঠানের পয়সায় ভূরিভোজ করবে। আর সেইসব বিলগুলো পাঠাবে বিকিরণ সাহেবের কাছে। তাঁকে সই করতেই হয়। চেয়ারম্যান ডিসায়ার্ড বলে এক ক্যাচ ফ্রেজ ব্যবহার করা হবে প্রতিটি বিলের ফরোয়ার্ডিং লেটারে। সে জানে বিকিরণ সাহেব চোখ বুঁজে তা সই করতে বাধ্য। সই মানেই সমর্থন। যতসব অনিয়মিত ব্যয়ের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে রাখায় প্রবীরের এক অদ্ভুত আনন্দ। পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকার বিধি বহির্ভূত খরচ অনায়াসই পাস করিয়ে নেয় সে। ফিনান্স ম্যানেজার সবই বুঝতে পারেন। তবুও তাঁকে সমর্থন করতে হয় এই অনিয়মিত খরচকে। সমর আছে এইসব বিলের টাকা সংগ্রহ করার জন্য। বিলবাবু থেকে ক্যাশিয়ার সবাইকে বাগবাজারের রসগোল্লার রসে চুবিয়ে রাখে সে। ওরাও জানে টাকা যখন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের তখন আর বাধা দিয়ে লাভ কি?

প্রবীর বোসের বিল কেউ আটকাতে সাহস পায় না। ওরা জানে দরকার হলে সি এম ডির ধোবীমার্ক পর্যন্ত নিয়ে আসতে সে সক্ষম। ওর গতিবিধি সাহেবের অন্দরমহল পর্যন্ত। তাই ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বরং ওর গুড-বুকে থাকলে আখেরে অনেক ফয়দা হতে পারে। বিকিরণ সাহেব পড়েছেন বিপদে। সত্যিই তিনি বেকায়দায় পড়েছেন এই পিয়ারোর আবির্ভাবে। ও যেন

লুকিয়ে আসা এক বহিরাগত। একজন ইমিগ্র্যাণ্ট হলেও প্রভাব অত্যন্ত প্রখর। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে চায়। অপরদিকে সমর নামক চামচেটা একেবারে জ্বালিয়ে খেলো। আসলে ঝাউতলার প্রতিটি লোক প্রবীর-সমর চক্রকে ভয় পায়। এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে ওদের সংস্পর্শ।

বিকিরণসাহেব শান্তিপ্রিয় লোক। স্বল্পভাষী। সেই যে কবে একবার অ্যামেরিকা সফর করেছিলেন তা হয়তো তাঁর নিজেরও মনে নেই। সে সফর ছিল পি এইচ ডি রত্ন আহরণের আহ্বানে। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাপার্টমেণ্টে বসেই তাঁর গবেষণাপত্রটি রচিত হয়েছিল। জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে কার অবদান বেশী এই ছিল বিষয়বস্তু। তিনি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতীয় জলবায়ুতে গুবরে পোকার অবদান সবথেকে বেশী। এবং এই বিষয়ের ওপর ডক্টরেট করে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। কিন্তু কোনোদিন হাতে কলমে কাজ করতে হয়নি। দেশে ফিরে সরাসরি বসেছিলেন সর্বজনিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারে। প্রথমে সেলস্ অফিসারের কাজ। তারপর বিদেশী ডিগ্রীর দৌলতে তর তর করে প্রমোশন পেয়েছেন। কেউ আটকাতে পারে নি তাঁর এই জয়যাত্রাকে। পনের বছর চাকরীতে ছ'খানা প্রমোশন। এটা ইতিহাস, না বিশ্বরেকর্ড তা বিচার করবে ম্যানপাওয়ার বিভাগের সংখ্যাতত্ত্ববিদরা। বিকিরণসাহেব ঝাউতলা অফিসের একই ঘরে বসেছেন। বছরে বছরে শুধু তাঁর চেয়ারের মডেল ও টেবিলের সাইজ বদলে গেছে। কে কতোবড়ো একজিকিউটিভ টেবিল ব্যবহার করেন তা দেখেই নির্ধারিত হয় ক্ষমতার পরিমাপ। ভাগ্য তাঁকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছে। প্রমোশন পেয়েছেন, প্রতাপ বেড়েছে। গাঙ্গুলীসাহেব তাঁকে অহেতুক স্নেহ করতেন। সর্বদা আগলে রাখতেন। নির্ভর করতেন। বেশ ভালভাবেই সময় চলেছিল আপন ছন্দে। কিন্তু কোথা থেকে আবির্ভাব হলো প্রবীর নামের এই ধূমকেতু ? মনে হচ্ছে পুরো পরিবেশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেন যে মজুমদার সাহেব এই ফক্কর ছোকরাকে ঝাউতলায় পাঠালেন তা ঈশ্বর জানেন। ঝাউতলা অফিসটাকে একেবারে ঝালাপালা

করে ছাড়লো। দিল্লীর কৌশলই কেমন যেন খটমটে। সর্বত্র এক কূটনৈতিক চাল।
ঝাউতলা লেনের বিপণন বিভাগ আপন কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত। কতো কবি, লেখক, ফুটবল প্রেমিক এখানে যাতায়াত করেন। অফিসটা সর্বদাই উৎসবের উত্তেজনায় সরগম। বিছুটিবাগানের সুপ্রীম স্কোরার হলো জনসংযোগ বিভাগের কর্মী। প্রদর্শনী ম্যাচ তথা যেকোনো বড় খেলার দিনক্ষণ ঘোষণা হলেই সমরের নৃত্য শুরু হয়ে যায়। গুচ্ছেখানেক কম্‌প্লিমেণ্টরী টিকিট পকেটে রেখে অফিসের লোককে দলে টানার এ এক অদ্ভুত সুযোগ। সবাইকে লোভ দেখিয়ে নিজের ঘরে লাভ তোলার একটি অভিনব পন্থা। বিকিরণ সাহেবের জন্য দুখানা কমপ্লিমেণ্টরী টিকিট রেখে অন্য সবাইকে প্রসাদ বিতরণ। অ্যাকাউণ্টস্‌ ডিপার্টমেণ্টে যে বাবু বিল থেকে ভাউচার তৈরী করে তাকে একখানা টিকিট দিতেই হয়। আবার বড়সাহেবের ড্রাইভারকেও খুশী রাখতে হবে। বসের গতিবিধির আগাম খবর ওর মাধ্যমেই পাওয়া যাবে। ওকেও দিতে হয় একটি টিকিট।
সংবাদ গ্রাহক যন্ত্রের অ্যাণ্টেনাকে সর্বদা সক্রিয় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রবীর জেনে গেছে এ ছোকরা এই ধরণের কাজে পটু। ওকে যদি দাসানুদাস করে রাখতে হয় তবে হৈ হুল্লোড়ের ব্যস্ততায় ডুবিয়ে রাখাই সঙ্গত। নকুড় নন্দীর সন্দেশ, ফ্লুরিজের কেক-পোস্ট্রি আর ডেকার্স লেনের ফিশ ফ্রাই বন্ধু বান্ধবীকে খাইয়ে কি ভাবে তা অফিসিয়াল খরচ দেখাতে হবে সে ব্যাপারে সমর সাহা ওস্তাদ। ও ডানহাতে বাঁহাতে সই করে কাঁচা রসিদে। পায়ের বুড়ো আঙুলে কালি লাগিয়ে টিপ সই লাগায় মিথ্যা রিকশাভাড়া দেখাতে। ও জানে পঁচিশ টাকার কোনো খরচ দেখাতে হাতেলেখা কাঁচ্চা বিলই যথেষ্ট। শুধু খরচের ধারাবাহিকতা দেখানোর জন্য ফলস্‌ ভাউচার বানাতে হয়। সপ্তাহে যদি আটখানা এই ধরণের ভাউচার বানাতে পারে তাতেও ওর নীট আয় দুশ টাকা। সপ্তাহের বাজার খরচ উঠে আসে। প্রবীর ওকে এইসব টাকা পয়সার ব্যাপারগুলো দেখার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সে নিজেও জানে এই ধরণের ব্যয়ের মধ্যে কতোটা সত্যিকারের আর কতোটা পকেটে

রাখার। এটা এক বিশেষ ধরণের বিদ্যা যা শেখার জন্য কোনো স্কুলে যেতে হয় না। এক প্রকারের শিল্প। আর্ট অথবা কৌশল। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের পয়সা গায়েব করার সবথেকে সুবিধাজনক বন্দোবস্ত।

সার্বজানক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট অফিস দিল্লীতে। তবে প্রতিষ্ঠানের পুরো সংসার বিস্তারিত রয়েছে পূর্বাঞ্চলে। কোম্পানীর সি এম ডি কে সরকারী তথা দরকারী সফরে আসতেই হয়। নেতাজী সুভাষ বিমান বন্দরে নেমে বিমান-ক্লান্তি বিমোচনের জন্য প্রয়োজন একটু বিশ্রামের। আরাম বলা ঠিক হবে না। নেহেরুজী আরামকে হারাম বলেছেন। ব্যস্ততার এক-ঘেয়েমি ভঙ্গের প্রয়োজনে বিশ্রাম।

মজুমদার সাহেব চেয়ারম্যান হয়ে প্রথমেই কোলকাতায় পোস্টিং দিলেন প্রবীরকে। নন্দীগ্রামে ওর কেটেছে বেশ কয়েকটি বছর। এবার আরো বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে আনতে হবে বোসকে। তাই খাস কোলকাতায় ওকে বদলী করা হয়েছে। মজুমদার সাহেবের ট্যুর প্রোগ্রামের বিশেষত্ব হলো তিনি কোনো জি এমের ওয়ার্কিং-ডে নষ্ট করতে চান না। তাই অধিকাংশ মিটিং ডাকেন উইক এণ্ডে। শনি-রবিবারে। সেই আলোচনা সভার ব্যস্ততার পর সাহেবের অবসর বিনোদের জন্য কিছু একটা বন্দোবস্ত রাখতেই হয়। চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টার বলতে কথা। তাঁর এই শহরে পদার্পণ মানেই একটা শুভ সংকেত। প্রবীর বড় সাহেবের মুড মর্জি রুচি সবই জানে। নন্দীগ্রামের সেবায় সন্তুষ্ট হয়েই বড়সাহেব তাকে এই অভিজ্ঞতার অধিকার দিয়েছেন। বলতে গেলে এইসব দেখার জন্যই তো তাকে আনা হয়েছে কোলকাতায়। ঝাউতলায় আধডজন পিয়ারো থাকা সত্ত্বেও আরেকজন পেয়ারের পিয়ারোকে পোস্টিং দেওয়া মানেই সে হবে খুব দায়িত্বশীল। সেদিক থেকে প্রবীরের সুখ্যাতি আছে। ওর বিশেষ কতকগুলো গুণও আছে। সে এই প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ সেবক। এ ম্যান অফ কোয়ালিটিজ। ওর বৈশিষ্ট্য হলো ও নিজে সবকিছু পরিবেশন করবে। কিন্তু কোনোকিছুই স্পর্শ করবে না। একেবারে জাত বাউলের দার্শনিকতা। জলে নামবো,

জল ছড়াবো, তবুও জল তো ছোঁব না। যেমন বেণী তেমন রবে, তবুও চুল ভেজাবো না।

ক্লান্ত দিনের শেষে বড়কর্তাদের ক্লান্তি বিমোচনের একমাত্র টনিক কারণ। সেবন, ভক্ষণ অপেক্ষা কারণ পানেই পরম তৃপ্তি। বিনা কারণে কারণ পানই যদি না হলো তবে একজিকিউটিভ পোস্টের আকর্ষণ কোথায়? অকারণে কারণ পান এবং সন্ধ্যায় একটু ফুর্তি টুর্তির ব্যবস্থা আছে তাই তো ট্যুরে আসা। এসব দিক দেখার জন্য চাই একজন প্রফেশনাল পিয়ারোর। যে দুচোখ দিয়ে সব দেখবে কিন্তু দু-ঠোঁটের কোনো নড়াচড়া করবে না। প্রবীর এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তার সঙ্গে আছে তস্য চামচা সমর সাহা। একেবারে জুতোর সুখতলা। দাসানুদাস।

বিধাননগরে মোটামুটি স্বাভাবিক কর্মজীবন ছিল। কিন্তু ঝাউতলা অফিসে এসে অশোকের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। যাকে বলে ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার। ছিল ফুস্কুরির ব্যথা, শুরু হলে ফোঁড়ার যন্ত্রণা। প্রবীর আর সমরের যৌথ চক্রান্তে ওর জীবন ত্রাহি ত্রাহি। যখন তখন ঘরে ডেকে একগাদা ভিজিটার্সের সামনে অপমান করা ওদের এক উল্লাস। আসলে উপস্থিত অতিথিদের দেখাতে চায় অফিসে তার কি দাপট! প্রবীর যেন হাতির পাঁচ পা দেখেছে। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। একে মা মনসা তার আবার ধুনোর গন্ধ। ব্যাটা সমরটা কার পেছনে কি করছে তা বোঝা মুস্কিল। পারে তো হাতে মাথা কাটে।

বৃন্দাবন প্লেসে বসে মজুমদার সাহেব কোলকাতার সব খবর পান। শাস্ত্রে বলে, রাজা কর্ণেন পশ্যতি। হ্যা, সত্যিই তাই। রাজারা চিরদিনই কান দিয়ে দেখেন। তাঁর কানে যেসব তথ্য তুলে ধরা হয়, যে ধরণের সংবাদ পরিবেশন করা হয় তাই তিনি দেখেন। এবং সেই দেখাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। শুনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজাদের স্তাবকের অভাব নেই। অতীতেও ছিল না। বর্তমানেও নেই। যুগে যুগে কিছু লোক সর্বদাই রাজা তথা বড়কর্তাদের কাছের মানুষ হয়। তারা যা বলে, যেভাবে বলে তাই রাজারা বিশ্বাস করেন। তাছাড়া উপায়ই বা কি? বিরাট রাজত্ব চালনা আর বিশাল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা একই কথা। সুষ্ঠু-

ভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সংবাদ সংগ্রাহক রাখতেই হয়। ওরা হলো রাজার ডানহাত। স্বয়ং রামচন্দ্র এই ধরণের গুপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে পতিব্রতা সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন।

ঝাউতলা অফিসে এসে প্রবীর দেখলো সবাই তাকে সমীহ করে। যে লোক স্বয়ং চেয়ারম্যানকে মাল সরবরাহ করে তাকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। সে কোনো উপকার হয়তো করবে না। কিন্তু অপকার যেকোনো মুহূর্তে সম্ভব। বিষধর সর্প থেকে দূরে থাকাই বাঞ্চনীয়। অন্তত শাস্ত্রে তাই বলে। খোদ বিকিরণ সাহেব পর্যন্ত প্রবীরকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু অশোক যেন কেমন। একটু বিদ্রোহী। সবকিছুর প্রতিবাদ করতে ভালোবাসে। তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করে পরে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে সে অনিচ্ছুক। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলাফেরা করে, আইন বাঁচিয়ে অফিসের কাগজে সই করে সে। বিধি বহির্ভূত প্রস্তাবে সমর্থন জানায় না। এতে প্রবীরের খুবই অসুবিধা। সে কিছুতেই অশোককে বোঝাতে পারে না। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে অনিয়মই নিয়ম একথাটা মুখে বলা যায়। কিন্তু কাগজে কলমে যুক্তির পাহাড় গড়ে তুলতে হয়। অশোক জানে প্রবীর যা করছে তা ক্ষমতার অপব্যবহার। কিছু করার নেই তবু।

উইক এণ্ডে মজুমদার সাহেব সফরে আসেন কোলকাতায়। নেতাজী সুভাষ বিমানবন্দরে প্রবীর উপস্থিত লাল গোলাপের স্তবক নিয়ে। চেয়ারম্যানকে সম্বর্ধনা জানানো এবং এস্কর্ট করে নিয়ে আসা ওর কর্তব্য। মজুমদার সাহেব কোম্পানীর গেস্ট-হাউজে থাকা পছন্দ করেন না। তাই সোজা চলে আসেন মহাবীর অ্যাপার্টমেণ্টে। আজকাল ইউনিয়নের যা জুলুম শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনকেও তারা পোস্টারের বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করছে। অযথা ভাড়া করা দলবল নিয়ে হাজির হলেই হলো গেস্ট হাউজের সামনে। তারা শুধু ভীড়ই বাড়াবে না, নানা দাবীর স্লোগানে গোটা পাড়াটাকে সজাগ করে রাখবে। আরে বাবা, যে প্রতিষ্ঠান কোনোদিনই লাভ করবে না, মুনাফার মুখ দেখবে না সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কি করে দেবে প্রতিশ্রুতি? ওদের

ওই লালরঙের পতাকা দেখলেই গায়ে জ্বর আসে। পশ্চিমবঙ্গ হলো লাল দুর্গ। এখানে বইছে লাল আবীরের ঝড়। এই আগুনে-রঙ যেন সবকিছু পুড়িয়ে দেবে। কোনো কিছু টিকবে না। যে কারখানায় নেই উৎপাদন সেই কারখানার ওয়ার্কারও ভয় দেখাচ্ছে। চিমনীর ধোঁয়া বন্ধ করে দেবার হুমকি। ব্যাপারটা যেমন হাস্যকর, তেমনি মরণাত্মক! এইসব সাত পাঁচ ভেবেই মজুমদার সাহেব গেস্ট হাউজ অ্যাভয়েড করেন। প্রাইভেট অ্যাপার্টমেণ্টে ওঠেন। কোনো ঝক্কি নেই, কোনো ঝামেলা নেই। একেবারে নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে নৈশবাস। নেই কোনো অফিসিয়াল ফর্মালিটি। খবরটা রাখবে শুধু একজন বিশ্বস্ত পি আর ম্যান। ম্যান অফ কনফিডেন্স মিস্টার বোস। শনিবার বিকেলের মধ্যে দু-চারটে মিটিং করতে পারলেই দ্য ট্যুর ইজ অফিসিয়াল। তারপর সেই স্যাটারডে নাইট ফীভার। যেসব ম্যানেজার চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন তাঁরাও জানেন সাহেবের শনিবারের সন্ধ্যাটা মাটি করা ঠিক হবে না। ভক্তের ভক্তিতেই দেবতা তুষ্ট। আলোচনা স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত হয়।

তারপর সবাই বিদায় নিলে ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা। থাকে শুধু অন্ধকার আর প্রবীর-সমর দুই অতন্দ্র প্রহরী। এটাও এক ধরণের সেবা। কবি মিল্টন এই সেবাকেই কাব্য করে বলেছেন, দে অলসো সার্ভ দোজ হু স্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েট। বিগ বস্ ইন দ্য টাউন। পিয়ারোকে সন্ত্রস্ত থাকতেই হয়। ইণ্ডাস্ট্রির ভগবান ভোগে ব্যস্ত। এতে যেন কোনো ব্যাঘাত না হয় সেজন্য নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা। মজুমদার সাহেবের চাহিদা মতো কখন কি প্রয়োজন হয় সেজন্য উভয়ের যেন শবরীর প্রতীক্ষা।

প্রতীক্ষা আর পরিসেবায় যে সত্যিই কর্তৃপক্ষের হৃদয় জয় করা যায় প্রবীর তা জানে। মজুমদার সাহেবের রাজত্বকালে ওর দু দুটো প্রমোশন হয়ে গেল। প্রথম পদোন্নতি হলো অন ফুলফিলমেণ্ট অফ স্পেসিফেকেশন। আর দ্বিতীয় পদোন্নতির মূলে রয়েছে প্রতিদান। কর্তৃপক্ষকে বিশেষ সেবার প্রতিদান হিসেবেই এই দৃষ্টান্ত স্থাপন। প্রবীরের প্রমোশনের বহর দেখে বিকিরণ সাহেব

একেবারে ভ্যাবাচেকা। কর্তৃপক্ষের ভাবটা বিশ্লেষণ করলে মনে হবে জনসংযোগের লোকই এই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরে আছে।

ওরে ভীরু, তোর পরে নেই এই জগতের ভার। বুক ফুলিয়ে সেবা করতে হবে। সেবাই পরম ধর্ম। বস্‌কে খুশী করো। বশে রাখো নানা প্রলোভনের আবরণে। আসলে যে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন নেই অথচ ও টির টাকা যোগাড় করতে কর্তৃপক্ষ হিমসিম তার ইমেজ বজায় রাখতে প্রয়োজন যথার্থ জনসংযোগ। জনসংযোগ নামক শিবকে তাই পুজো করতেই হয়। প্রবীর এ ব্যাপারে একজন ডাক্তার। রোগীর নাড়ী স্পর্শ করেই বুঝতে পেরেছে পরমায়ু সীমিত। কর্তৃপক্ষকে ভজিয়ে অল্পসময়ে যতটা আদায় করে নেওয়া যায়। সে যেন কোলকাতার ডাক্তারদের মতোই লুটেরার ভূমিকায় অবতীর্ণ। রোগী মরে মরুক। তার ভিজিট তিন ডিজিটের হওয়া চাই। তারপর আছে নানা রকম প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার কমিশন। যতটা আদায় করা যায় ডেথ্‌ সার্টিফিকেট লেখার আগে। রোগবিলাসী সমাজ ডাক্তারকে ভগবানই ভাবে। যদিও ডাক্তার জানে তার করার কিছুই নেই। সবই ঈশ্বরের খেলা, অথবা লীলা।

বিকিরণ সাহেব শুধু ভাবেন। কোথাকার এক নন্দীগ্রামের ছোকরা পিয়ারো এসে বিপণন বিভাগটাকে তছনছ করে দিল। সেই সঙ্গে জুটেছে ওই পিম্প্‌টা। ব্যাটা সমর হলো মাগী ধরার এক নম্বর দালাল। সময় মতো যোগান দিতে না পারলে ঘরের বৌকেই পাঠিয়ে দেবে প্রক্‌সি দিতে। বিকিরণ সাহেব বুঝে উঠতে পারেন না কি হচ্ছে ব্যাপারখানা। প্রবীর তো তাঁকে প্রায় ছুঁয়েই ফেললো। আর তস্য সাকরেদ সমর যেন আনন্দে আটখানা। সকালে স্নানান্তে ঈশ্বর চিন্তার পরিবর্তে বস্‌-বন্দনা করে। হে ভগবান, যুগে যুগে যেন প্রবীর সাহেবের মতো ওপরওয়ালা পাই। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্যে এম এ পাশ বস্‌ তো শুধু জনসংযোগ বিধাতা নয়। ও একজন আধুনিক মধুসূদন। মাইকেল মধুসূদন।

কয়েক বছর আগেও জনসংযোগের পদগুলো কর্তৃপক্ষ যাকে ইচ্ছা তাকে দিতেন। মুলতঃ গেস্ট হাউজ কীপার অথবা সুন্দরী স্ত্রীর

স্বামীদের জন্য পদগুলো সংরক্ষিত থাকতো। নায়েবগিরির কাজ, সময়ে অসময়ে হুজুরের মর্জিমাফিক সবকিছু তামিল করা কি ভদ্রলোকের পোষায়? এই পদগুলো ছিল বোনাস পোস্ট। বড় সাহেবের বদ খেয়াল মেনে চলতে পারলে একজন পারচেস্ ক্লার্কও পিয়ারো হয়ে যেতো। প্রয়োজন ছিল না বিদ্যার অথবা বুদ্ধির। তবে হ্যা, অতি বিনয়ী এবং তোয়াজের ভাষা জানা থাকলে একাজে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। প্রবীর বিপণন বিভাগে এসে জনসংযোগের নতুন সংজ্ঞা আরোপ করলো। মজুমদার সাহেবের তক্‌মা পেয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা করে নিল। তপসিয়ার জনসংযোগ ফোরামে সে বক্তৃতা করে। জনসংযোগের নতুন সংজ্ঞা শেখায় আধুনিক ছাত্রকে। তাদের কাছে প্রবীর বোস এক আদর্শ আধিকারিক। এতো অগাধ যার জ্ঞান তাকে রোখে কে? উন্নতি তার অবধার্য। জনসংযোগের আকাশে সে যেন এক উজ্বল জ্যোতিষ্ক। তরুণ শিক্ষানবীশের দল ওকে গুরুর মর্যাদা দেয়। অশোক সব জানে। বুঝতে পারে ওর উন্নতির গুহ্য কথা। তবুও বোবা থাকতে চায়। তার এই মৌনতার সুযোগ নিয়ে সমরের দল তাকে বোকা বানাতে ব্যস্ত। অশোক শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করে। যতদিন বাঁচা, ততদিন শেখা। শেখার শেষ নেই।

মহামানব, ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা, ডক্টর আম্বেদকরের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করতে হবে। ঝাউতলা অফিসে সার্কুলার এসেছে রাজধানী দিল্লী থেকে। সমাজে ব্রাত্য হয়েও যিনি শিক্ষায়, মেধায় সমগ্র দেশের মঙ্গলচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে একাগ্র চিত্তে। সবার জন্য বাক্ স্বাধীনতা, বেঁচে থাকার অধিকার সম্পর্কে আইনসিদ্ধ সংবিধান রচনা করে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁকে বার বার, সহস্রবার প্রণাম করতেই হবে। নেহেরুজী যাঁকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন সেই আম্বেদকরের জীবনাদর্শ প্রতিটি শিশুর মনে অঙ্কুরিত করতে হবে। স্বাধীন ভারতবাসীকে গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার যিনি দিয়েছিলেন সেই মনীষীকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান স্কুল কলেজে কতোটা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হবে সে

ব্যাপারে ভি পি সরকার সন্দিহান। তাই বাধ্যতামূলকভাবে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই উৎসবে অনুপ্রাণিত করার এক প্রয়াস দিল্লী সরকারের। মণ্ডল কমিশনের ঘা তখনো শুকোয়নি! নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, পুরস্কারের প্রলোভনে অন্ততঃ কিছু লোককে তো ব্যস্ত রাখা যেতে পারে। টাকা দেবে সরকার। মানব সম্পদ বিভাগ কয়েক কোটি টাকার হরিলুট দেবে এই জন্মোৎসবের কীর্তনে।

কর্পোরেট অফিস থেকে সার্কুলার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণ সাহেব ডেকে পাঠালেন প্রবীরকে। এ ধরণের ব্যয়বহুল একটি অনুষ্ঠানের জন্য জনসংযোগ বিভাগ তৈরী হয়েই ছিল। বিকিরণ সাহেবের ঘরে বসেই তৈরী হলো আম্বেদকর শতবার্ষিকী উৎযাপন কমিটি। তাতে ইঙ্গিত থাকলো মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ। ফিনান্স ম্যানেজার ভীমসেন সবুজ সঙ্কেত দিলেন।

তিনি বল্লেন, মানি? নো প্রব্লেম। আসলে টাকাটা দেবে মানব-সম্পদ বিভাগ। তাই কাজ করুন আনন্দে। হ্যা, আরেকটা কথা। দেখবেন খরচ যাই হোক—কাঁচা অথবা পাকা একটা বিল অবশ্যই রাখবেন। এবং এই বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন সমর সাহার দিকে।

সমস্ত ব্যাপারটা দেখার দায়িত্ব পড়লো প্রবীরের ওপর। ওকে করা হলো অর্গানাইজিং সেক্রেটারী। কার্যনির্বাহক সম্পাদক। তস্য চামচে সমরকে দেওয়া হলো কনভেনারের পোস্ট। সে আবার এমনি পণ্ডিত যে কখনো শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে না। কারখানার ভাষায় বলে কনভেয়ার। ওর কাছে কনভেনার আর কনভেয়ার বেল্ট একই অর্থবাহক। ওই হলেই হলো। মারাত্মক তফাৎ কিছু নেই। সার্বজনিক সার প্রতিষ্ঠানের এখানেই বৈশিষ্ট্য। বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন। সমাজের উপকারের জন্যই বহুপদের সৃষ্টি। আর সেই পদ পূরণের জন্য আছে সমরের দল। আধ ডজন পিয়ারোর দৌড়োদৌড়ি।

অনেক আলোচনা, কবিতা পাঠ এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হলো আম্বেদকর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে। কবীন্দ্র-

কক্ষ ভাড়া নিয়ে চললো অনুষ্ঠানের আড়ম্বর। কিন্তু মুস্কিল হলো সভীয় লোক যোগাড় করা। এতবড়ো হলের এক চতুর্থাংশও ভর্তি করা গেল না। সম্প্রতি মণ্ডল কমিশনের হুংকারে বহু মধ্যবিত্ত লোক এসব ব্যাপারে থাকতে চায় না। ভিপির ভোটযুদ্ধে এ এক নবপন্থা। লড়ে যাও ভাইয়ে ভাইয়ে। বর্ণ হিন্দু বনাম অন্যান্য সবাই। আসন সংরক্ষণের শাসনে শিক্ষিত লোক একটু বীতশ্রদ্ধ।

গোখ্‌লে সাহেব একদা বলেছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে, সমগ্র ভারতবর্ষ ভাবে তার পরদিন। বঙ্গ দেশ ভঙ্গ হলেও চিন্তায়, বুদ্ধিতে এবং কৌশলে অগ্রণী ভূমিকায় আছে। কবীন্দ্রকক্ষকে পরিপূর্ণ দেখানোর এক টেকনিক বের করলো ঝানু পিয়ারো প্রবীর বোস। সে জানে জনগণেশকে কিভাবে পুজো করতে হয়। সভার আকর্ষণ বাড়ানো হলো অন্য এক কৌশল অবলম্বনে। আগেই বলা ছিল এবং সমরের দল তৈরী হয়েই ছিল জনতার মন জয় করার জন্য। কানাকানি প্রচার হলো, আপনারা কেউ চলে যাবেন না। সভাশেষে লান্‌চের ব্যবস্থা আছে। বিজলী গ্রীলের প্যাকেটগুলো এই এসে পেঁছলো বলে। সভাকক্ষের সামনের তিনটি সারিতে এমনভাবে লোক বসানো হলো যে ফরটি ফাইভ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে ছবি তুললে মনে হবে কবীন্দ্রকক্ষ যেন উপচে পড়ছে শ্রোতার স্রোতে। এ ব্যাপারে ট্যাংরার বাদলবাবুকে আগেই বলা আছে। ছবিগুলো এমনভাবে তুলতে হবে যাতে দিল্লীর মন্ত্রণালয় খুশী হয়। বাবাসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে। এমন একটি মুখচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে বাদলবাবুর জাপানী ক্যামেরায়। সে এ বিষয়ে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ।

প্রবীর মাণিক চেনে। সে জানে এই সভা, এই কোলাহল মিলিয়ে যাবে। বিজলী গ্রীলের প্যাকেট উদরস্থ হবার পর সব হয়ে যাবে অতীত। কিন্তু ছবি থাকবে সাক্ষী হয়ে। প্রমাণ করে দেবে প্রবীর বোস একজন জনসংযোগ অফিসার হিসেবে কতোটা কৃতকার্য। সত্যিই, প্রবীরের পাঠানো সভার বিশদ বিবরণ পড়ে, এবং অনবদ্য ছবিগুলো দেখে মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় খুব খুশী।

অনুষ্ঠান যেন শেষ হতে চায় না। কিশোর কিশোরীদের জন্য রয়েছে ক্যুইজের ব্যবস্থা। ইংরেজ ভারত ছাড়ো, নেতাজীর দিল্লী চলো থেকে আরম্ভ করে নেহেরু-ইন্দিরা রাজীবের বহুমুখী প্রতিভাকেন্দ্রিক নানা প্রশ্নের মালা গাঁথা হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। পানীটোলা, নন্দীগ্রাম, বিধাননগর এবং রামনগর কারখানা থেকে বহু প্রতিনিধি এসেছে। শিশু প্রতিযোগীর সঙ্গে তার অভিভাবকের দল। সবাই এসেছে সরকারী সফরে। দিল্লীর নির্দেশে এমন একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে কোলকাতায়। এ সুযোগ কেই বা ছাড়তে চায়?

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কিশোর কিশোরীরা স্বাধীন দেশের ভাবী নাগরিক। দেশ এগিয়ে চলেছে একবিংশ শতাব্দীর পথে। ইতিহাসকে জানা চাই। ইতিহাসের সব চরিত্রের চাই পরিচয়। তাই ক্যুইজের মাধ্যমে দেশবরেণ্য নেতাদের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রতিযোগিতায় সবাইকে পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করলো সমর পুত্র ভ্রমর। বিধাননগরের নকুল নন্দী প্রতিবাদ করেছিল এই ফলাফল ঘোষণার পর। কোনো কাজ হয়নি। বিচারকের বিধানই সর্বশেষ কথা। ঘটনাটা অবশ্য পরে জানা গেল। প্রবীর ক্যুইজের প্রশ্নোত্তরগুলো গচ্ছিত রেখেছিল সমরের কাছে। সে প্রবীরের একান্ত আপনজন। গোপনীয়তা বজায় রাখতে পটু। কিন্তু সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্যুইজে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার প্রলোভন কে ছাড়তে চায়? সমর নন্দন ভ্রমরকে তাই বাড়ীতে বসিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ধারাকে সে অনুসরণ করেছে। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস। প্রশ্ন শুনে অন্যান্য প্রতিযোগী যখন স্মৃতির মণিকোঠায় হাতড়ে বেড়াচ্ছে উত্তর, সমর তনয় তখন গ্যাক্ গ্যাক্ করে শুট করছে প্রত্যেকটি সঠিক সমাধান। দর্শকরা স্তম্ভিত! তারা তো আর জানে না ভেতরের রহস্য। ক্যুইজ মাস্টার ঘোষণা করছেন, কা-রে-ক্-ট! বাহবা দিচ্ছেন ভ্রমরকে। একেই বলে কোলকাতার অহংকার। একেবারে অলরাউণ্ডার। ক্যুইজে ভ্রমর প্রথম হওয়া মানেই সমর খুশী। প্রবীরের এখানেও খেলা করছে এক ফন্দি। সে নিশ্চয়ই চেয়েছিল পুরস্কার ওর সহকর্মী নন্দনই নিক। সমরকে

বশে রাখার এটাও জনসংযোগের এক বিশেষ কৌশল। প্রকৃত জনসংযোগের, মানে কার্য সিদ্ধির জন্য, নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। প্রবীর তা ভালভাবেই জানে এবং নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগেও বিশেষ পারদর্শী।

ঝাউতলা অফিসের সবাই খুব বেশী। তাদের এক সহকর্মীর ছেলে ক্যুইজে প্রথম হয়েছে। সবার অনুরোধে গর্বিত পিতা সমর সাহা লানচ টাইমে পরিবেশন করলো নবীন ময়রার স্পঞ্জ রসগোল্লা। ঝাউতলা থেকে বাগবাজার গেল কোম্পানীর দুখানা গাড়ী। কেনা হলো মিষ্টান্ন। আবার সেই মিষ্টির একটা বিলও তৈরী করিয়ে নিলো সমর। সে প্রবীরের কর্মশিষ্য। এই বিলও সময় মতো সদ্ব্যবহার করা যাবে এ কৌশল ওর কাছেই শেখা। একজন জনসংযোগ অফিসার সব পারে। কোন্‌টা ব্যক্তিগত খরচ আর কোন্‌টা বিভাগীয় ব্যয় তা সার্টিফাই করবে প্রবীর বোস।

আম্বেদকর সাহেবের অনুষ্ঠান রাজধানীতে সবার চিত্তজয় করেছে। খবরটা পেঁাছে গেছে ঝাউতলায়। প্রবীর তথা সমরের দৌরাত্ম ক্রমশঃ বেড়েই চলে। বলাটা হয়তো ভুল হলো। বলা উচিত ওদের উভয়ের অবস্থা তখন তুঙ্গে। একেবারে তুঙ্গে বৃহস্পতি। তুঙ্গে বৃহস্পতির অধিষ্ঠান তাই প্রবীরের অবস্থা রমরমা। বিকিরণ সাহেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে হৈ হৈ করে অফিস করছে। এক নেতা আর তার পঞ্চপান্ডব শিষ্য। ঝাউতলাতে জনসংযোগ বিভাগই আসল অফিস। সার বিক্রি, কৃষক সমৃদ্ধি, দেশের অর্থনৈতিক উপকার ইত্যাদি ইত্যাদি সবই ফাইল বন্দী। শুধু জনসংযোগের জয় জয়াকার। প্রবাল মজুমদারের আশীর্বাদে মোটা অংকের বাজেট প্রবীরের পকেটে। রেভিনিউ একস্‌পেনডিচার। শুধু খরচ করে যাও। পুরো বাজেটের টাকা খরচ না দেখাতে পারলে আগামী বছরের বাজেট কমে যাবে। সে জানে তাকে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। কর্পোরেট অফিসে বসে আছেন মজুমদার সাহেব। প্রতিষ্ঠানের সর্বশক্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন সি এম ডি। মহাপ্রভু চেয়ারম্যান যাকে অভয়দান করেছেন তাকে ছোঁয় কে? অঘটন আজও ঘটে। দিল্লীর আকাশে কোনো সমস্যার মেঘ ছিল না। কেন যে বজ্রপাত হলো হঠাৎ তা ঈশ্বর জানেন।

সকাল দশটায় সুসজ্জিত সি এম ডি মিস্টার প্রবাল মজুমদার এসে পেঁছিলেন বৃন্দাবন প্লেসের কর্পোরেট দপ্তরে। ট্যুরে না থাকলে উইকডেতে অফিসে আসাই স্বাভাবিক। সেদিন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রামনগর কারখানায় একশ' ষাটজন কর্মী নিয়োগ করেছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সি বি আইয়ের খবর প্রতিটি চাকরীর পেছনে পঁচিশ হাজার টাকার লেনদেন হয়েছে। এ ব্যাপারে পার্সোনাল ম্যানেজারও জড়িত। এবং দিল্লীতে খবর এসেছে সে নিরুদ্দেশ। অ্যাবস্‌কণ্ডেড! এমত অবস্থায় জি এমকে দোষী সাব্যস্ত করবেন, না পার্সোনাল ম্যানেজারকে করতে হবে সাসপেণ্ড? সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে। অপরদিকে রয়েছে বার্নিং ইস্যু—প্রতিষ্ঠানের পরিণতি কি? কারখানায় উৎপাদন হবে তো? কোন্‌ বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে—কারখানার উৎপাদন, না ট্রেড ইউনিয়নের প্রাধান্য?

কোলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ইতিমধ্যেই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কর্পোরেট অফিস স্থানান্তরিত করা হয়নি। অথচ সপ্তাহান্তের বেলেল্লাপনার সব খবর এখন নেতাদের কাছে এক বিশেষ খোরাক। কোলকাতা নিয়ে অবশ্য তিনি ততটা চিন্তিত নন। সেখানে আছে একান্ত আস্থাভাজন পিয়ারো। দ্য গ্রেট জাগলার প্রবীর বোস। ইউনিয়নের দাদাদের কেমনভাবে রসেবশে রাখতে হয় সে কৌশল ওর নখদর্পণে। ও জানে এইসব দাদার দল ঝাউতলার অফিসে লানচ টাইমে গেট-মিটিং করতে অভ্যস্ত। দু-একটা ছোটখাটো ইস্যু জিয়িয়ে রাখতেই হয়। তবে অম্লভূক এইসব নেতারা অল্পেতেই খুশী হয়। দিল্লীতে একটা ট্যুর পেলেই ওরা সন্তুষ্ট। রাজধানী শহরে অনেকেরই আত্মীয় স্বজন আছে। পরের পয়সায় ভ্রমণে কার না আনন্দ হয়? বন্ধু বান্ধবীরা ভাবে ওরা এক একজন কেউকেটা। স্বয়ং সি এম ডির সঙ্গে মিটিং করতে আসে। তাও আবার ট্রেনে নয়, প্লেনে। পুরো ব্যাপারটাই স্ট্যাটাস সিম্বল। প্রবীর ওদের ভ্রমণকে কষ্টমুক্ত করার জন্য বিমানযাত্রার ব্যবস্থা করিয়ে দেয়। চেয়ারম্যানের বিশেষ ক্ষমতাবলে ওরা বিমানেই যাতায়াত করে। নেতা বলতে কথা। প্রবীর চেয়ারম্যানের আপনজন। ওকে কোলকাতায় রাখা হয়েছে

এইসব স্পর্শকাতর এলাকায় জনসংযোগ রাখার উদ্দেশ্যে। ও সুবিধামতো সি এম ডির দুর্বলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নেয়। ও জানে, আইন যেখানে পোষ মানে না সেখানে প্রয়োগ করা হয় একটি বিশেষ শব্দ—প্রেরোগেটিভ।

মজুমদার সাহেব দ্বিধাগ্রস্থ মন নিয়ে শোফার-ড্রিভেন গাড়ীতে আসছিলেন অফিসে। মেঘ-কাঁচের আড়ালে বসে ভাবছিলেন রামনগর কারখানার কথা। পার্সোন্যাল ম্যানেজারের লোভ যেন মাত্রার বাইরে চলে যাচ্ছে। ভেবেছে সুদূর বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশে পড়ে আছে, কেউ কোনো খবর পাবে না। তাই পুকুর চুরি। আরে বাবা, এ হলো লক্ষ বেকারের দেশ। তুমি না হয় একশ' ষাটের জন্য একটা ব্যবস্থা করলে। কিন্তু যারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। তারা কি করবে? অবশ্যই কর্তৃপক্ষের ত্রুটি খুঁজে বের করবে। তুমিও তো ধোওয়া তুলসীপাতা নও। বেশ মোটা অঙ্কের মালকড়ি পকেটে পুরে চাকরী দিয়েছ। এবার হজম করো সেই কিক-ব্যাক্।

রামনগরের কেচ্ছাটা তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারম্যানের গাড়ী বৃন্দাবন প্লেসের পার্কিং জোনে দণ্ডায়মান। ড্রাইভার দরজা খুলে সাহেবের ভূমিস্পর্শের জন্য অপেক্ষমান। তারপর লিফটম্যান সাষ্টাঙ্গ অভিবাদনে তাঁকে পেঁৗছে দিল সেভেনথ ফ্লোরে। নরম কার্পেটের উষ্ণ চুম্বন গ্রহণ করতে করতে মজুমদার সাহেব প্রবেশ করলেন তাঁর বসার ঘরে। চেম্বারে। চেয়ারে তখনো বসেন নি তিনি এমন সময় তাঁর পি এ মিস্টার জোসেফ ঘরে ঢুকলো। গুডমর্নিং জানানোর আগেই বসের হাতে তুলে দিল একটি সীল করা খাম। খামটি খুলেই সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া। মিনিস্ট্রি থেকে লিখিত আদেশ, ইউ আর রিকুয়েস্টেড টু হ্যাণ্ডওভার চার্জ টু মিস্টার গুলাবখাস ভার্মা। জি কে ভার্মা শুড টেকওভার চার্জ টুডে বাই সিক্সটীন আওয়ার্স। ইউ মে গো অন লঙ্ লীভ্। অর্ডারে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা আছে আজই যেন দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। অর্ডার ইজ অর্ডার। ইট মাস্ট বী ক্যারেড আউট। আদেশ অমান্য মানেই কর্তব্যে অবহেলা। মিস্টার মজুমদার বাধ্য হয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে

দিলেন ভার্মা সাহেবকে। আধঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক কারখানায়, ঝাউতলার বিপণন বিভাগে, কার্ল মার্কস স্কোয়ারের পারচেস্ অফিসে টেলেক্স মেসেজ পৌঁছে গেল। বাদশা বদলের সংবাদ চর্বিত চর্চিত হবার আগেই মিস্টার মজুমদার বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের সর্বসুখ থেকে। রাজা বিদায় নিলেন বটে কিন্তু রাজার সিংহাসন তো খালি থাকতে পারে না?

প্রবাল মজুমদারের প্রস্থান বড়ই করুণ। তাঁর এই বেদনাদায়ক বিদায় হলো খিড়কী দরজা দিয়ে। অনেকের মতে এটা পলায়ন। যাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনায় আপ্যায়ন করা হয়েছিল তাঁর প্রস্থান হলো অনাড়ম্বরভাবে। সেখবর ঝাউতলার অফিসকে বেশী আঘাত করলো। তবুও একজন বঙ্গসন্তান নৈবেদ্যের চূড়োয় বসেছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের সেই ভাগ্যবান বীরপুঙ্গব দিল্লীর মসনদে বসে বিস্মৃত হয়েছিলেন স্বীয় অঙ্গীকার। কর্তব্য অপেক্ষা সুখ সম্ভোগ তাঁকে আঁকড়ে ধরলো। বৃন্দাবন প্লেসের সব কর্মচারী জানে মিস্টার মজুমদার প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছুই করেন নি। শুধু ব্যক্তি পুজোয় আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। আর ভোগবিলাসের আকর্ষণে সফর করতেন কোলকাতায়। দেওয়ালেরও কান আছে। বুরোক্র্যাটদের কাছে খবর পৌঁছে গেছে। সার্বজনিক সার কোম্পানীর সি এম ডি ভোগ বিলাসে মত্ত। সাকী আর সুরায় তাঁর আঁখি ঢুলু ঢুলু। এমন একজন বদ-মাতালকে দিয়ে তো কোম্পানী চলে না। ভার্মা সাহেব উদবেড়ালীর মতো ওৎ পেতেই ছিলেন। সুযোগ এসে গেল।

সত্যিই, মিস্টার মজুমদার কথা রাখতে পারেন নি। এত ঘটা করে তাঁকে বসানো হলো চেয়ারম্যানের চেয়ারে অথচ সব ভুলে গেলেন আরামে ডুবে। কর্পোরেট অফিস কোলকাতায় আনতে পারেন নি। আনতে চান নি। ওখানে কর্পোরেট অফিস শিফট করার অনেক হ্যাপা। ওখানে কম্যুনিস্ট সরকার এবং প্রতিদিনের আন্দোলন। নেতাদের আস্ফালন। প্রতি মুহূর্তের হুমকি। লাল ঝাণ্ডার দৌরাত্ম। আর কমরেডদের কথা না শুনলেই নানা বিপত্তি। ঘেরাও অথবা চড়াও। বড় সাহেবের বংশ উদ্ধার করেও ক্ষান্ত

নয় ওরা। শান্ত নয় ওরা ঘেরাও নামক নাটক করে। পরিস্থিতিতে ক্লাইম্যাকস্ আনতে, আন্দোলনকে আরো উত্তেজক করতে ওরা গায়ে থুথু দেয়। নিতম্বে চিমটি কাটতেও দ্বিধা করে না। গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা তো অতি সাধারণ ব্যাপার। শুধু তাই নয়।

কোলকাতায় আছে আরেক বিপদ। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলো লোডশেডিং। অন্ধকার নিত্য সঙ্গী। অফিসে আলো নেই, নেই পাখার বাতাস। লিফট বন্ধ। হেঁটে ওঠ দশতলায়। এ হলো মার্কস্‌বাদের দেশ। দুনিয়ার সবাই মজদুর! মজদুরের আবার আরাম কি? গায়ের ঘাম পায়ে ফেলেই তো মেহনতী মানুষের ইমারত গড়ে ওঠে। তা ভোগ করে ভাগ্যবানেরা। ওখানকার নেতারা ফিবছর অন্ততঃ একবার বিশ্বভ্রমণ করেন। বিমানে ওঠার আগে পশ্চিমী পুঁজিবাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। এবং তারপরই য়ুরোপ-আমেরিকা সফরে চলেন। নতুন দেশে পা ফেলেই আরামে আহ্লাদে যান আত্মহারা হয়ে। তখন শিল্পোন্নত দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মিস্টার মজুমদার নন্দীগ্রামে থাকাকালীন এইসব হিপোক্র্যাটদের জীবনযাত্রা দেখেছেন। তাঁর মতে, এইসব কুটিল রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই ভালো মানুষের কর্তব্য। বুদ্ধিমানের বিধান। দুষ্ট গরু আর ভণ্ড নেতায় কোনো পার্থক্য নেই। তাই মিস্টার মজুমদার কোলকাতায় উইক এণ্ড কাটাতে ভালোবাসতেন। কিন্তু কর্পোরেট অফিস স্থানান্তরিত করার কথা কখনো ভাবেন নি। যে মন্ত্রীর কৃপায় একদা চেয়ারম্যানের শিরোপা পেয়েছিলেন সেই জনপ্রতিনিধির আক্রোশেই তাঁকে বিদায় নিতে হলো। বৃন্দাবন লীলা সাঙ্গ করে অবশেষে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন।

বিজ্ঞান বলে কোথাও শূণ্যতার সুযোগ নেই। প্রকৃতি সর্বদাই ভরপুর। মিস্টার মজুমদারের প্রস্থান মানেই ভার্মা সাহেবের মঞ্চে অবতরণ। ঘটনাটা প্রবীরের কাছে বৈধব্যের যন্ত্রণা নিয়ে এলো। পূর্ণ যৌবনা নারীর কাছে পতি বিয়োগের বেদনার মতো ওর কাছে এই প্রস্থান যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ালো। কথায় বলে, ছাগল লাফায় খুঁটির জোরে। ওর যত লম্ফ ঝম্ফ সবই ছিল মিস্টার মজুমদারের আশীর্বাদে। সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন তার উত্তাপে

বহু জিনিসই জ্বলে যায়। সমরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কতো লোককেই না অপমান করেছে প্রবীর। ওর ক্ষমতা তখন তুঙ্গে। সি-এম-ডির এক একবার কোলকাতা সফর ওর কাছে সঞ্জীবনী সুধা পানের প্রেরণা যোগাত। কত কেচ্ছাই না প্রচার করেছে তখন। ঝাউতলা অফিস দাপিয়ে বেড়াত। অমন বিনয়ী-স্বভাবের বিকিরণ সাহেবকে পর্যন্ত নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। ওই দুই জগাই মাধাই তখন ছিল উগ্র এবং উন্মত্ত। কিন্তু আজ মিস্টার মজুমদার নেই। সে কথা ভেবেই প্রবীরের মুখ শুকিয়ে আমসি। এবার বদলা নেবার পালা। বিকিরণ সাহেব নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবেন। অশোককে নিয়ে ওর কোনো ভয় নেই। পয়লা নম্বরের তাবেদার কি কখনো খুঁদে অফিসারকে সমীহ করে? তবে ও মোদ্দাকথা বুঝে নিয়েছে। ঝাউতলায় আর বেশী দিন নয়। এবার যে করেই হোক, কোনো এক লাউতলায় জায়গা খুঁজে নিতেই হবে। সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্র প্রবীর ভালোভাবেই জানে, যঃ পলায়তে, স জীবতি!

বেড়ালের ভাগ্যেও কখনো কখনো শিকে ছেঁড়ে এই যে গুলাবখাস ভার্মা, ওরফে জি কে ভি, তিনি কি কখনো ভেবেছিলেন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হবেন। অস্থায়ী চেয়ারম্যান হলেও প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা। রাজা চিরদিনই রাজমর্যাদার অধিকারী। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের সি-এম-ডিও ক্ষমতায় রাজার সমান। জি কে ভির সামনে বহুদিন হলো কাঁঠাল ঝুলছিল। এবার তা পেকেছে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে বাস্তবে তার রূপ নেয় বিপরীত। ম্যান প্রপোজেস্, গড ডিস্পোজেস্। জি কে ভি শুধুই অস্থায়ী পদে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকলেন বৃন্দাবন প্লেসের বাতানুকূল কামরায়। চেয়ারম্যানের খাস কামরায় বসার অধিকার পেলেন না। ঘরে, মানে নিজের ঘরে, বসেই সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজে সই করেন। অ্যাক্টিং সি এম ডি কথাটি তাঁর আদৌ মনঃপূত নয়। অ্যাকটিং শব্দটি তাঁর কানে কটু শোনায়। হৃদয়ে বেদনার উদ্রেক করে। কাঁটার মতো বিঁধে যায়। সরকার তাঁকে দায়িত্ব দিল কিন্তু পুরো কর্তৃত্ব দিল না।

হে ভগবান! দয়ার নিধান! তোমাকে পুজো না করে কোনোদিন অন্নগ্রহণ করি না। এ তুমি কি বিচার করলে? ভার্মাসাহেব সখেদে সংলাপ করে যান। দেব দ্বিজে তাঁর অসীম ভক্তি। তবে আদর্শ পুজোরীর মতো মনটা সরল নয়। সর্বদাই একটা কূটনৈতিক চালে ব্যস্ত থাকেন। দাবার ঘুঁটি চালনার মতো মনে মনে অঙ্ক কষেন। প্রতি প্রভাতে প্রার্থনা জানান। হে দয়াময় ঈশ্বর, এ ক্ষমতা কদিনের? বোর্ডের মিটিং ডাকতে পারেন না। জেনারেল ম্যানেজারদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। তাও হয়ে ওঠে না। কেমন যেন মনমরা অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। এম পি লবী মাধ্যমে খবর পেয়ে গেছেন। মিনিস্ট্রি কিছুতেই তাঁকে পুরো ক্ষমতা দিতে অনিচ্ছুক। একডজন এম পি তাঁর পকেটেও আছে। কিন্তু এম পি থাকলেই কি সব মিটে যাবে? মন্ত্রীর ক্ষমতাই সব। তাঁর সিদ্ধান্তই সবাইকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে।

জি কে ভির কাছে খবর পেঁছে গেছে। নতুন কে একজন আসছেন শীগগীরই। আসছেন সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লী দখল করতে। উত্তর ভারতের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এবার দক্ষিণীরা দাপিয়ে বেড়াবে। রাজনীতিতে অথবা শিল্পনীতির ক্ষেত্রে ওরাই হবে প্রধান। প্রধানের বিধানই শিরোধার্য হবে। দিল্লীতে বসেই নতুন সি এম ডি নিয়ন্ত্রণ করবেন সমগ্র পূর্বাঞ্চল। রিমোট কণ্ট্রোল বিষয়ে তিনি একজন বিশারদ। একজন জাঁদরেল কর্মকর্তাও বটেন। কেরালার লালদুর্গে সবুজের স্বপ্ন বপন করে তিনি ইতিমধ্যেই উদ্‌ভিদ চূড়ামণি পুরস্কার পেয়েছেন। সম্পর্কে আবার মন্ত্রীর মামাতো ভাই। ওদের ওই মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের ব্যাপারটাই একটু খটমটে। ভাগ্নীর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে মামার। সবকিছুতেই ডবল আব্দার। মামার প্রতি আব্দার আর স্বামীর সোহাগ। এবার বৃন্দাবন প্লেস প্রেমের বন্যায় হাবুডুবু খাবে।

খুব বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয়নি ভার্মাসাহেবকে। নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হয়ে গেছে। বম্বের হাই টাইড পত্রিকায় তাঁর নির্বাচনের খবর ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। অভিনন্দন সদাশিবম্ মহালিঙ্গম হবেন সার্বজনিক সার প্রতিষ্ঠানের নতুন কর্ণধার। ভদ্রলোকের নামটি সুবৃহৎ এবং বানানে উচ্চারণে ত্রুটি

হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি শিবসেনা-গন্ধী সাংবাদিক চঞ্চল ভূসোয়াল। তিনি পাঠকের সুবিধার্থে নতুন চেয়ারম্যানকে এ এস এম নামে ভূষিত করেছেন। ভারতবাসী যে ভাষাভাষীই হোক না কেন এ এস এম কথাটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। নতুন সি এম ডির বায়োডাটা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন ভার্মা সাহেব। যাঁর সঙ্গে পাশাপাশি ঘরে বসে কাজ করতে হবে তাঁর পূর্ণ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে বৈকি! কেরালায় সবুজ বিপ্লবের জয়গান এ এস এম সাহেবকে সম্মানিত করতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু তবুও বিনা সেলামীতে কাজ হয়নি। নতুন প্রতিষ্ঠানে পা ফেলার আগে দু-কোটি টাকার ফিকির করতে হয়েছে পার্টি ফাণ্ডে। দেবতার পুজোয় দক্ষিণা দিতেই হয়। বিনা দর্শনীতে কি কোনো কাজ হয়? বিনা দক্ষিণায় পুরোহিত কখনো খুশী হতে পারে না। তুরুপের তাস এখন জি কে ভির হাতে। তিনি আপন অফিসকক্ষে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে ষোড়শ দেবতার পুজো করেন। দিনের প্রথম ভিজিটারকে পরসাদী পরিবেশন করে হাতে কলম ধরেন। দেব দ্বিজে অদ্ভুত ভক্তি। দেবতার চরণে আত্মসমর্পণের এমন জ্বলন্ত উদাহরণ সমগ্র সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে পাওয়া মুস্কিল। কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাবে কে? হোয়াট ইজ লটেড, ক্যানট বী ব্লটেড। কোথায় যাবে গোপাল, সঙ্গে যাবে কপাল।

*　　　*　　　*

আবহাওয়া অফিসের সঙ্কেত রেডিওতে ঘোষণার আগেই দিল্লীতে ভূমিকম্প হয়ে গেল। হ্যা, ভূমিকম্পের অতর্কিত আক্রমণের মতো একদিন হৈ হৈ করে এ এস এম সাহেব এসে হাজির হলেন। মানে অভিনন্দন সাহেব কাউকে আপ্যায়নের সুযোগও দিলেন না। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। বৃন্দাবন প্লেসের সবকটি চেয়ার টেবিল যেন ভূমিকম্পের দোলায় কেঁপে উঠলো। সেই কবে, কোন যুগ থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে সার্বজনিক সংস্কৃতি।

নেহেরুজীর স্বপ্নের শিশুরা মেতে থাকে কলকাকলিতে। সেখানে কাজের কালচার নেই। সকালে হাজিরা খাতায় ঢ্যাঁড়া মেরে সব

উধাও। চেয়ারের গায়ে সোয়েটারকে প্রতিনিধি রেখে অন্তর্ধ্যান। অফিসে বসলেও গুচ্ছেখানেক শেয়ার-মার্কেটের কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া। লানচ-ব্রেকে তাসখেলা এবং মাঝে মাঝে নন্দীগ্রামের ওয়াকারদের নিয়ে হাসি-মস্করা করা। কারখানার জি এমগুলো তো হাঁদাভোঁদা। একমাত্র বৃন্দাবনের বালগোপালেরাই বিশ্বরূপ দর্শন করাতে পারে। ওরা সবজান্তা। ওরা জানে চার চারটে কারখানা উৎপাদনহীন। সমগ্র প্রতিষ্ঠান চলছে ভর্তুকীর টাকায়। আর সেই ভর্তুকীর অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব কর্পোরেট অফিসের। ওরা যদি মিনিস্ট্রিতে যায় সেখানে বরাদ্দ আছে দাঁতখিচুনীর। ওরা যদি সেই দুর্ব্যবহার সহ্য করতে পারে তবে প্রতিদানে অন্য সবাইকে অপদার্থ বলার অধিকারও আছে।

কারখানার ইউনিট-ডিভিশনের ম্যানেজারদের কটু মন্তব্য শুনতেই হবে। অবশ্যই শুনতে হবে। আলবাৎ, ওদের অধিকার আছে টেকনোক্র্যাটদের কেচ্ছা নিয়ে নরকগুলজারের। কর্পোরেট দপ্তরের কনিষ্ঠ কেরাণীও জানে প্রতিষ্ঠানের করুণ অবস্থা! লোকসানের গ্রাফ্ অপ্‌টিমামে পেঁছে গেছে। তবুও মিনিস্ট্রি টাকা দিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ভর্তুকীই যেখানে ভরসা সেক্ষেত্রে নিন্দে হজম করতে হবে। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। স্বাধীন দেশের গৌরী সেন হলো সরকার। সরকার মানেই সবাইকার তাবেদার। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান হলো তাবেদারের প্রতিষ্ঠান।

পরিবারে পিতার ভূমিকা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের কাছে সব থেকে মূল্যবান এবং মেনে চলার চরিত্র হলো পিতৃপ্রভাব। সেই পিতাই যদি দোনামোনায় সংসার চালায় তবে সে প্রভাব পড়বে সর্বত্র। বিশেষ করে, পুত্রকন্যার ওপর। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে কোনো সি এম ডিই দীর্ঘায়ু হন নি। অথবা ধোপে টেকেন নি। এসেছেন, দেখেছেন এবং করেছেন প্রস্থান। একেবারে রোমসম্রাট সীজারের স্টাইল্। তারপর আবার কেউ এসেছেন। লেগেছে ঢেউ সর্বত্র। তটের বুকে ঢেউ আছাড় খেলেই তো কলতান ওঠে। কিন্তু যে পরিবেশে নেই কাজের মর্যাদা তাকে বাঁচাবে কে? স্বয়ং ব্রহ্মাও এক্ষেত্রে বেকায়দায়। দশচক্রে ভগবান ভূত। মানবরূপী ম্যানেজিং ডিরেক্টার তো অতি সাধারণ লোক।

এনজিনীয়ারিং ডিগ্রীর ভারে চাকরী হতে পারে। মন্ত্রীর কৃপায় সি এম ডির কুর্শিও পাওয়া সম্ভব। তবে কাজের লোক হিসেবে প্রমাণ করতে চাই নিষ্ঠা, দৃঢ়তা তথা আত্মসংযম।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের নতুন কর্মকর্তা অভিনন্দন সাহেব। বিরাট বপুধারী চেহারার অধিকারী তিনি। অতবড় এক হেরো-কোম্পানীর পয়লা নম্বর। একটু রাশভারী না হলে মানাবে কেন? তালপাতার সেপাইকে কেউ সম্ভ্রম দেখায় না। মানতে চায় না। অভিনন্দন সাহেব বৃন্দাবন প্লেনে ঢুকেই রণমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন এ হলো একটি সিংকিং বোট। এ ডুবন্ত-তরীর কর্ণধার হওয়ার ঝুঁকি হলো এক ঝাঁক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা। মন্ত্রীমশাই তাঁকে অভয় দিয়ে পাঠিয়েছেন। গো অ্যাজ ইউ লাইক। মন্ত্রীর যন্ত্রীরা, অর্থাৎ ব্যুরোক্রাটরা জানেন এ এস এমের কলজের জোর তেমন নেই। তবে জিভের জোর আছে। ভীষণ, ভয়ংকর সব কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত। একেবারে ঠোঁট কাটা। কোনো অফিসারকে যদি অপমান করতে হয় তবে প্রথমে ডাকবেন একজন পিয়নকে। তারপর ওই পিয়নের উপস্থিতিতে শুরু করবেন ভর্ৎসনা। সেই শাসনের ভাষাও তীব্র। খুবই কঠিন, কঠোর। শুধু অফিসারই বা কেন? দু-একজন জি এমকে এমন কটূকথায় তিরস্কার করেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁর জলবিয়োগের বাসনা জাগে। কোম্পানীর ভগ্নদশায় দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে অবতাররূপে আবির্ভূত। বিয়ের রাতে বেড়াল মারার মতো তিনি এসেই শুরু করেছেন ওলট-পালট। পুরো কর্পোরেট অফিসকে ঢেলে সাজাবেন।

বৃন্দাবন প্লেসকে সুস্থ করার পর নজর পড়লো অন্যান্য অফিসের ওপর। আজ পানীটোলা থেকে, তো কাল রামনগরের কাউকে ডেকে পাঠান এবং দিনশেষে হাতে চিঠি ধরিয়ে দেন। সেই চিঠিতে কি লেখা আছে তা জানা যাবে নিজের হেড কোয়ার্টার্সে প্রত্যাবর্তনের পর। আতংক এবং রহস্যের এক অভিনব ফর্মুলা।

এটা বিশুদ্ধ এ এস এম ব্র্যান্ড। আবিষ্কার। পিতৃদত্ত নাম অভিনন্দন সত্যি অভিনন্দন যোগ্য।

সে ছিল এক কাল। প্রবীর বোস ডি-ফ্যাক্টো জেনারেল ম্যানেজার। বৃন্দাবন প্লেসে তখন মজুমদার সাহেবের রমরমা অবস্থা। চেয়ার-ম্যানের চেলা প্রবীরেরও জয় জয়াকার। বাতানুকুল বসার ঘর। দেড় ইঞ্চি পুরু কার্পেট। টেবিলে তিন রঙের তিনটি ফোন। বাড়ীতে কর্ডলেস্। সবই হুজুরের কৃপায়। বসের আশীর্বাদ আর দেবতার পুষ্পবৃষ্টি একই ব্যাপার। প্রবীরের ল্যাঙ্গোঠী সমর। মুখে তার সদা সর্বদা ভগবানের নাম। কলিযুগে বস্ই হলো দেবদূত। তাকে পুজো করো। প্রসাদ প্রাপ্তির মতো তৃপ্তি আর কিছুতেই নেই। প্রবীর ঝাউতলা অফিসে চন্দ্রের শোভা বর্ধন করে। সূর্য রয়েছে সুদূর বৃন্দাবনে। তবুও তার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত চন্দ্রের কতোই না শোভা। সে শোভার সৌন্দর্য বর্ণনায় কতো কবিত্ব। শিল্পীর তুলিতে চন্দ্রমহিমা। গায়কের কণ্ঠে চন্দ্র বন্দনা। কবির কাব্যে প্রিয়ার মুখ। প্রবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঝাউতলার অফিসাররা। ওর সঙ্গে মৃদুহাস্য বিনিময়ের জন্য কতো সেলস্ অফিসার অপেক্ষমান। সে তাদের ভ্রূক্ষেপও করে না। একেবারে ডোণ্ট কেয়ার মনোভাব। ক্ষমতার গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। তোয়াক্কা বলে কোনো শব্দ ওর অভিধানে নেই। বিকিরণ সাহেব তাঁর ক্ষমতা জানেন। তিনি জানেন মিস্টার বোস তো শুধু পিয়ারো নয়। সে হলো পার্সোনাল ম্যান অফ এম ডি। দিল্লীর বড়কর্তার নিয়োজিত একজন ভদ্রবেশী গোয়েন্দা। হিটলারের গেস্টাপো। জনসংযোগের নামে ব্ল্যাক মেইল করাই ওর কাজ। কাজ না কারসাজি। যে কোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। দুষ্ট গরুর গুঁতো খাওয়া অপেক্ষা দূরত্ব বজায় রাখাই শাস্ত্রসম্মত বিধেয়। মাউথপীস্ সমর খুবই সক্রিয়। ও ব্যাটা যেন প্রবীরের থেকেও এককাঠি ওপরে। এটাই স্বাভাবিক। রাজা একবার বলেন তো পারিষদ বলে শতগুণ। কারণে অকারণে গণ্যমান্য ব্যক্তিকে অপদস্থ করে বেড়ায়। কিন্তু অভিনন্দন সাহেব যোগদানের পর কেমন যেন চুপ্সে গেছে এই জগাই মাধাই। কথায় কথায় দিল্লীতে ফ্লাই করছে না। ফাইল ধরছে অতি সন্তর্পণে।

নতুন চেয়ারম্যানের অর্ডার, স্টপ আননেসেসারী একস্‌পেন্সেস্‌। ব্যয় সংকোচ করো। সংযমী হও। সংযত হয়ে জনগণেশের হৃদয় জয় করো। ভিক্ষুকের অতো দেমাক ভালো নয়।

বৃন্দাবন প্লেসে মাত্র তিনটি সপ্তাহ কেটেছে। অভিনন্দন সাহেবকে সবাই ভালো করে চেনেও না। শুনেছে কে একজন এসেছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে। মহামানবের আবির্ভাব। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে পাপের বোঝা কমাতে অপদার্থকে সংহার করতে এসেছেন এ এস এম সাহেব। নাম তাঁর অভিনন্দন বটে। কিন্তু সত্যিই কি অভিনন্দন যোগ? তিনি ডেকে পাঠালেন অশোক মিত্রকে। দিল্লীতে দরকার। বিকিরণসাহেব এস টি ডিতে খবর পেয়েছেন। চেয়ারম্যান ওয়াণ্টস্‌ টু মীট মিস্টার মিট্‌রা। রাজ দরবার থেকে হুকুম এসেছে। সামান্য প্রজার প্রাণ ধিকি ধিকি। অনেক আতংক, অজানা শংকায় অশোকের মন ভারাক্রান্ত। তাকে যেতেই হবে বৃন্দাবন প্লেসে। অল্প সময়ের নোটিশে ট্রেনে টিকিট পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। রেলের রিজার্ভেশনবাবুকে সেলামী দিয়ে একটা বন্দোবস্ত হলো। দিল্লী থেকে খোদ বড়সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর আদেশ শিরোধার্য। তিনি পছন্দ করেন ডিসিপ্লিন। তিনি আদেশ করেছেন, সোমবার সকাল দশটায় হাজির হওয়া চাই বৃন্দাবন প্লেসের সাত তলায়।

অশোক বড় সাহেবের নির্দেশ মেনেছে। দিন তারিখ সময় সবকিছু অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছে। নতুন সি এম ডি কি বলবেন তা তখনো বিরাট এক সাসপেন্স্‌! তাঁর সঙ্গে মোলাকাৎ খুবই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু অকস্মাৎ কেন এই সাক্ষাৎকার? অশোক এ এস এম অলিন্দে উপবিষ্ট। ডাক পড়লো জেনারেল ম্যানেজার পার্সোনাল মিস্টার ভাণ্ডারীর। জি এম পি ভাণ্ডারীসাহেব মিলিটারী কায়দায় তিন বার ইয়েস স্যর, ইয়েস স্যর, ইয়েস্ স্যর বলে এবং মোগল ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন বিগ বসের পাশে।

একজিকিউটিভ স্টাইলে ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সি এম ডি বল্লেন, ভাণ্ডারী। প্লীজ ইস্যু অর্ডার। অশোক মিট্‌রা টু রামনগর অ্যাণ্ড ব্রিং যমুনা প্রসাদ হিয়ার অ্যাট্‌ ডেলহী।

ভাণ্ডারী সাহেবের নতুন চাকরী। প্রবেশন পিরিয়ড শেষ হয়নি। চাকরী হয়নি পাকা। বিগ বস্‌কে খুশী করা তাঁর একমাত্র ধর্ম। ইয়েস স্যর বলে তিনি প্রস্থান করলেন আপন কক্ষে। আর ব্যাঘ্রগুহা থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে ইশারা করলেন অশোককে।

একদিন দিল্লীতে থেকে পরদিনই কোলকাতায় ফিরে এলো অশোক। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার দিল্লী জীবনে সে উপলব্ধি করেছিল এই নরখাদক কাউকে দয়া করবে না। ওঁর আগমন শুধু সবকিছু ওলট পালট করার জন্য। লণ্ডভণ্ডের নায়ক এখন মঞ্চে উপস্থিত। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে প্রলয় নাচনের জন্য ওঁর আবির্ভাব। সমর্থন করার জন্য আছেন মাননীয় মন্ত্রী। মহারাজা অপেক্ষা তাঁদের শ্যালকদের প্রতাপ হয় বেশী। যুক্তি, শুভবুদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলকামনা ভাবলে কখনো অশোককে রামনগর বদলী করতেন না। কি করবে সে ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে। একজন অহিন্দীভাষী অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে হিন্দীবলয়ে। বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশে ওকে স্থাপন করতে হবে জনসংযোগের সেতু। হিন্দী যেখানে যোগাযোগের প্রধান ভাষা সেখানে অশোক কতটুকুই বা কাজ দেখাতে পারবে? সে হিন্দী জানে না। অথচ তাকেই পাঠানো হচ্ছে হিন্দীর রাজত্বে। যে লোক হিন্দী ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানে না তাকে আনা হচ্ছে রাজধানী শহরে। মিডিয়াম্যানদের সঙ্গে সখ্যতার ইমারত গড়তে। অশোকের দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাকে গঙ্গায় বিসর্জন প্রয়াসেই এই হীন পরিকল্পনা। স্বাধীন দেশের মাটিতে এই ধরণের বদখেয়ালী বস্‌ই আদর্শ দেশপ্রেমিক।

অফিসারকে আতংকে রাখো, সংশয়ে রাখো ডুবিয়ে। প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের কাজ অপেক্ষা অকাজের ইন্ধন সরবরাহ করো। অভিনন্দন সাহেব সত্যিই কি একবার চিন্তা করেছেন? অশোকের বনবাসের আদেশ দিতে এতটুকু ভেবেছেন এতে কোম্পানীর কি উপকার হবে? তাঁর ক্ষমতার উৎস কোথায় তা আভাসে উপহাসে উপলব্ধি করেছে অশোক। দিল্লীতে আর কালক্ষেপ নয়। পরবর্তী রাজধানী একস্‌প্রেসেই কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলো সে। ভাণ্ডারী সাহেব যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অশোকের হাতেই তার

বনবাসের আদেশ তুলে দিয়েছেন। নিজের বনবাসবার্তা সে নিজেই বহন করে চলেছে। একনিষ্ঠ জনসংযোগ প্রতিনিধির এটাই তো সততা। সে জানে কালের অমোঘ অভিশাপে সে নিজদেশে পরবাসী হতে চলেছে। তবুও কর্তব্যে কাতর হলে চলবে না।

ঝাউতলা অফিসে বসে বিকিরণসাহেব সময় মেপে চলেছেন। অশোক কখন আসবে। ওর হাতে দিয়েছেন একটি বিশেষ বার্তা। অর্ডার অফ সি এম ডি। কোলকাতায় পেঁাছে অশোকের প্রথম কাজ চিঠিটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া। ওর ধারণা ছিল তিনি হয়তো এ ব্যাপারে কোনো উপকার করতে পারবেন। বিকিরণ ভট্টাচার্য নরম প্রকৃতির মানুষ। প্রবীরের বহু দুর্ব্যবহারও তাঁকে গরম করতে পারেনি। আসলে তাঁর মধ্যে উত্তেজনা বলে কোনো অনুভূতিই নেই। জন্ম এবং মৃত্যু সবই সমান।

অশোকের চিঠিখানা খুলে একবার পড়লেন এবং ভুরুতে তা' দিয়ে বল্লেন, তা বেশ। কবে যাচ্ছেন রামনগর ?

আমার ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আপনি একটু অনুরোধ করুন নতুন এম ডিকে।

এম ডি কি আমাব কথা শুনবেন ? যা একরোখা লোক। দেখি চেষ্টা করে।

বিকিরণ সাহেব কোনো চেষ্টা করেন নি। ওটা তাঁর ভদ্রতা। তাঁর বিনয়। তাঁর ঘর থেকে বিদায় করার ভণিতা। আসলে তিনিও মনে মনে কুঁকড়ে আছেন। কখন কি হয় ? তাঁকেই যে অন্য কোনো অপরিচিত জায়গায় ঠেলবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? পরোপকার অপেক্ষা আত্মরক্ষাই শ্রেয়। তিনি জানেন, অশোক শিক্ষিত, রুচিবান এবং কর্তব্য সচেতন অফিসার। তাকে ঝাউতলায় রাখলে প্রবীরকে টেক্কা দেওয়া যাবে। কিন্তু তাতে কি হবে। এ হলো সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান। যত উটকো লোকের আধিপত্য। এখানে নেপোয় মারে দই।

এই শিল্প-সংস্কৃতিতে অশোক বেমানান। এতদিন হয়ে গেল তবু কারও সঙ্গে মিশতে পারে নি। নিজেকে মেশাতে পারেনি। তার

এই স্বাতন্ত্র্যই এক অভিশাপ। অভিশপ্ত লোককে কষ্ট পেতেই হবে। বিন্ তুঘলক রাজত্ব শুরু করেছে দিল্লীতে। বাংলার সুবেদারের কি ক্ষমতা তার ভুল ধরে। এম ডির খেয়ালীপনা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কখন কার ঘাড়ে কোপ পড়ে কে বলতে পারে? প্রবীর বোসের চক্র দিল্লী কোলকাতা নিয়ন্ত্রণ করছে। ওর ওই এক বিশেষত্ব। আমার ছাতার নীচে চলে এসো বাছাধন। সব প্রটেকশন পাবে। যদি স্বাতন্ত্র্যই তোমার মূলমন্ত্র হয় তবে বুঝবে কতো ধানে কতো চাল।

অশোক প্রবীর-ষড়যন্ত্রের যন্ত্রণায় জর্জরিত। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে পাত্তা পেতে হলে হতে হবে সমর সাহা। এখানে বিদ্যা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই। মানুষের মর্যাদা এখানে বিসর্জিত। শুধু বস্‌কে ভজনা করো এবং তার মনোরঞ্জনের মাল যোগাও। অশোক কিছুতেই বুঝতে পারে না। এ আবার কোন ধরণের শাস্তি। মরার ওপর খাড়ার ঘা। সে দীর্ঘদিন প্রমোশন বঞ্চিত। ইনক্রিমেণ্ট স্থিতাবস্থায়। বছরের পর বছর বিনা বেতন বৃদ্ধিতে কাজ করে চলেছে। এই তো চরম সাজা। এর ওপর আবার দ্বিতীয় শাস্তির কি প্রয়োজন ছিল! তবে কি কর্তৃপক্ষের অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে? রামনগরে বদলী করে বোঝাতে চাইছে তার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

অফিসারকে এলোমেলো বদলী করে একটা আতংকের সৃষ্টি করাও কর্তৃপক্ষের এক কৌশল। মান সম্মানের ভয়ে অনেকেই ছেড়ে দেবে চাকরী। কেউ বা দ্বিতীয় কোনো পথ খুঁজে নেবে। অশোক এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ। গবেষণাগারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বদলীর একস্‌পেরিমেণ্ট। তবুও তার মনে ক্ষীণ আশা বিকিরণ সাহেব যদি কিছু একটা করেন। দিল্লীতে নেই প্রবাল মজুমদার। তাঁর যবনিকা পতনের সঙ্গে কমেছে প্রবীরের ফোঁস ফোঁসানী। সমরের আস্ফালনও স্তিমিত। বিকিরণ সাহেব হয়তো এস টি ডিতে কথা কইবেন। তিনিও প্রবীরের ব্যবহারে মর্মাহত। সমরের অশালীন আচরণে অসন্তুষ্ট। সেই পর্বটা ছিল মিস্টার প্রবাল মজুমদারের।

পট পরিবর্তন হয়েছে। মঞ্চে অবতীর্ণ নতুন নায়ক। আচরণ

আলাদা হতেও পারে। আলাদা আবহাওয়ায় অশোকের অর্ডারের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিকিরণ সাহেবকেও পরামর্শ দেবার অনেক লোক। দিল্লী থেকে ফিরে সকাল দশটায় কথা বলেছে অশোক। যথাযথ আশ্বাসও পেয়েছে বিকিরণ সাহেবের কাছ থেকে। কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যেই সে রিলিজড হয়ে গেছে। ঝাউতলা লেনের মায়া কাটিয়ে তাকে যেতেই হবে বিহারের রামনগরে। মহানগরী কোলকাতার ব্যস্তজীবন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে নানা কর্মসূচীর ইতি টেনে সে চলে যাবে রামনগরে। জনসংযোগের মুখ্য ভূমিকায় তাকে কাজ করতে হবে সেখানে। সেখানে নেই প্রেস, নেই মিডিয়াম্যান, নেই কোনো প্রচারের প্রয়োজন। তবুও অশোককে প্রমাণ করতে হবে হিন্দি বলয়েও এই কাজে সে কতোটা কৃতকার্য!

*　　　*　　　*

কার্ল মার্কস স্কোয়ারের বড়বাবু সমর্পণ সেন। অশোকের হাতে রিজার্ভেশন টিকিট দিয়ে সে বললো, উইশ হউ আ হ্যাপী জার্নি। বিকেল চারটেয় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন। গোরক্ষপুর একসপ্রেসের এ সি স্লীপারে উঠে বসলো অশোক। তারপর মহানগরীর কোলাহল পেছনে রেখে সে চলেছে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে সেবার উদ্দেশ্যে। অভিনন্দন সাহেবের ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে। একদা লণ্ডনের ব্যস্ত জীবন। তারপর কোলকাতার কোলাহল। হৈ চৈ করা জীবনকে পেছনে রেখে সে চলেছে বনবাসে। পিতৃআজ্ঞা পালনের ব্রত নিয়ে নয় এ যাত্রা। এ শুধুই কর্তৃপক্ষের খেয়ালের মাশুল মেটানোর দায়িত্ব।

বৃন্দাবন প্রেসের কর্তৃপক্ষ ভালোভাবেই জানে অশোকের কিছুই করার নেই রামনগরে। জাতপাতের রাজত্বে সার্বজনিক জনসংযোগের পরিকল্পনা আকাশকুসুম মাত্র। তাছাড়া স্থানীয় ভাষা যার অজানা সে করবে জনসংযোগ? যে অঞ্চলের অধিবাসীরা অভাবের তাড়নায় চলে আসে প্রতিবেশী রাজ্যে। দিন মজুরের কাজ করেও দিন চলে যায়। কুলিগিরি করে, রিকশা টেনে, ধোপার কাজ করে, এমন কি জুতো সেলাই করে ওদের জীবিকা অর্জন করতে

হয়। রাতের আস্তানা ফুটপাত। তাদের জন্মভিটায় স্থাপন করতে হবে জনসংযোগের কাঠামো। সেইসব পতিত, অপাঙ্‌ক্তেয় লোকের মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য, শিক্ষার জন্য জনসংযোগের জাল বুনতে হবে অশোককে। রামনগরকে রাম রাজত্বের মর্যাদা দিতে হবে। সত্যিই, বিচিত্র এই দেশ!

ট্রেন চলেছে আপন ছন্দে আর নিরানন্দ মনে সে শুধুই ভাবছে। সারা রাত তার চোখে ঘুম নেই। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ট্রেন থামলো বারাউনীতে। এবার অনন্ত অন্ধকার। অজানা পৃথিবী, অপরিচিত মানুষ। ততোধিক শংকা সেইসব মানুষ নামক জন্তুর হুংকারে। শুধু সমস্যার কথা ভেবেই অশোক কেমন আধখানা হয়ে গেল। আবার নিজের মনেই খুঁজে পেলে সান্ত্বনা। এ দেশ তার নিজের দেশ। এ মাটি তার চেনা। আর জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী। সেখানকার লোকগুলোও তো সে দেখেছে প্রতিদিন। কোলকাতার জনজীবনের প্রবাহ তো ওরাই বজায় রেখেছে। ওরা পরিশ্রমী। সব থেকে কায়িকশ্রমের কাজ গুলো তো ওরাই করে। ভাষা, সে তো শৈশব থেকে শুনে আসছে। সঠিক বলতে না পারেলেও বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই! বৃন্দাবন প্লেসের মানবরূপী অবতার অশোককে পরীক্ষা করতে চাইছেন। অধ্যাবসায়ের পরীক্ষা। ধৈর্যের পরীক্ষা।

উত্তরপূর্ব রেলওয়ের অন্যতম রেল স্টেশন বারাউনী। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ কেন্দ্র এই স্টেশনটি। রাত তখন সাড়ে তিনটে। অশোক ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো। টিকিট বাবু ওকে সতর্ক করে দিল। এত রাতে বাইরে যাওয়া উচিৎ হবে না। নিরাপত্তার অভাব আছে। ওয়েটিং রুমে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় বসে থাকাটা কষ্টকর হবে। ওয়েটিং রুমে তিলার্ধ স্থান নেই। চেয়ারে, সোফায় ভর্তি লোক। সবাই যে উঁচু শ্রেণীর যাত্রী তা বলা মুস্কিল। তবে তাদের পোষাকে এবং চালচলনে বোঝা যায় সবাই রেলের কর্মচারী। কেয়ারটেকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এই রাত্রিযাপন। যারা সরকারী লোক নয় তারা কেয়ার টেকারকে খুশী রাখে। পকেটে পয়সা পুরে দেয়। শুধু সোফায় নয়। মেঝেতেও

খবরের কাগজ পেতে শুয়ে আছে কিছু যাত্রী। অশোকের মনে হলো, এরাই সত্যিকারের আজাদ। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর জন্য যে ব্যবস্থা তা এরা ভোগ করছে গণতন্ত্রের অধিকারে। ওরা জেনে গেছে আজকাল কেউ গ্যাটের কড়ি নষ্ট করে ফাস্টো কেলাশে সফর করে না। তোমরা যাচ্ছ কোম্পানীর পয়সায়। আমরা সেই পয়সার যোগানদার। অধিকার আমাদেরই অধিক। প্রতিটি নিদ্রিত যাত্রীর মুখে যেন এই ঘোষণা প্রস্ফুটিত। স্বাধীন দেশে অধিকার সবার সমান।

অশোক কোনোরকমে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে ভি আই পি ব্যাগের ওপর বসলো। টেলিভিশনের পর্দায় এই শক্তিশালী ব্যাগের প্রচার দেখেছে। এই ব্যাগ এতই শক্ত এবং পোক্ত যে হাতি দাঁড়ালেও ভাঙে না। সে ভাবে এই একটি মাত্র ব্যাগের ব্যবসা করেই মালিক পক্ষ কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। দ্রব্যের মান বজায় রাখা তাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যে অবহেলা দেখা দিলে গণেশ ওলটাবে। অশোকের কিই বা ওজন। বড়জোর ষাট কেজি। সে ওজন তো কোলকাতায় ছিল। এখন নিশ্চয়ই অনেক কমে গেছে। চিন্তায় তথা দুশ্চিন্তায় কমতেই পারে। সে শুনেছে, শুধু চিন্তায় চিন্তায় লোকের হার্টের অসুখ হয়। চিন্তা বড়ো কঠিন ব্যাধি। সে ভাবে চিন্তা করে কি লাভ? ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করতেই হবে। ভি আই পি ব্যাগে বসেই সে দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। অবশেষে পূবাকাশে দেখা গেল প্রভাতের আলো। শীতের রাত তাই সূর্যের মুখ দেখা যাবে আরো পরে। ভোরের আলো এবং বিহঙ্গের প্রভাতসঙ্গীতে বারাউনীতে নতুন দিন জন্ম নিল। অশোক দুহাত তুলে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো :

ওঁ জবাকুসুম সংকাশ্যং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বন্তারিং সর্ব পাপঘ্ন প্রণতোস্মি দিবাকরম্॥

দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে অশোক স্টেশনের বাইরে এলো। কার্লমার্কস্ স্কোয়ারের সমর্পণবাবু টেলেকস্ পাঠিয়েছে রাম নগরে। সে এ ব্যাপারে খুবই তৎপর। ভুল হবার কথা নয়। আসলে রেলের টিকিট কেনা, গেস্ট হাউজের বন্দোবস্ত করাই তার

কাজ। কোনো ভিজিটিং অফিসার যেন অসুবিধায় না পড়ে সেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বলতে গেলে জনসংযোগের প্রথম পাঠ তার কাছেই গ্রহণ করা উচিৎ। প্রতিদিন কতো ম্যানেজারের আনাগোনা কোলকাতা মহানগরীতে। প্রত্যেকের তদ্বির তদারকির জন্যই তো তাকে রাখা হয়েছে। অশোকের মনে হলো, হয়তো এবারের যোগাযোগ ততটা কার্যকরী হয়নি। মেসেজটা পাঠানো হয়েছে। তবে তা যোগ্য লোকের হাতে পড়েনি।

স্টেশনের বাইরেটা একেবারে শুনশান্। একটিও গাড়ী নেই। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের গাড়ী তো দূরের কথা ভাড়া করার মতো গাড়ীও নেই। দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষা করলো সে। নতুন পরিবেশে প্রাণভরে ভোরের বাতাস গ্রহণ করলো। দু-একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি আসতে শুরু করেছে। ড্রাইভারগুলো সোয়ারী খোঁজা-খুঁজি করছে। ওদের একজনকে অশোক জিজ্ঞাসা করলো, ভাই রামনগরকা কোই গাড়ী আয়া?

সে দিনের প্রথম রাউণ্ড খৈনী তৈরীতে ব্যস্ত। বাঁহাতে তামাক পাতাকে চূর্ণ করে, চূণে জর্জরিত করে বেশ কয়েকবার তালি বাজিয়ে তা মুখে পুড়লো। এবং থুক্ করে থু থু ফেলে নেশাটাকে চাঙ্গা করলো। তারপর সহজ উত্তর, সাব, ও লোক শোওয়া হ্যায়। কোম্পানীকা নোকরি। এত্না কষ্ট্ কিউ করেগা। আপ্ চলিয়ে। পেঁাছ দুঙ্গা। ঘণ্টাখানের অপেক্ষার পরও রামনগরের কোনো গাড়ী চোখে পড়লো না। অবশেষে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সিতে চেপে বসলো। সার্বজনিক কারখানার অতিথিশালায় পেঁাছে দেবার নির্দেশ দিল।

শীতের সকালে ১৯৫২ মডেলের হিন্দুস্থান ফোরটিন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না। তার জর্জরিত দেহখানি আরাম চায়। অবসরের বয়স পেরিয়ে গেলেও নিস্তার নেই। তার মালিকের কাছে অবসর বলে কোনো শব্দ নেই। যে করেই হোক সোয়ারী বহন করতেই হবে। অশোক নিজেও নীচে নেমে অন্যান্য দু-তিনজন মুটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দুস্থান গাড়ীর এঞ্জিন চালু করলো। তারপর এক্সিলেটারে পা রেখে, জয় বজরঙ্গবালী ধ্বনি দিয়ে ড্রাইভারের যাত্রা শুরু। সেইসঙ্গে শুরু হলো অশোকের নবজীবনের যাত্রা।

সে যাত্রা শুভ, কি অশুভ তা বিচার করবে ভবিষ্যত। মহাকালের চক্রে সময়ের পরিমাপ কে করবে? অনাগত দিনের অপরিকল্পিত ভবিষ্যতের পানে অগ্রসরমান ভাড়াকরা প্রাইভেট ট্যাক্সি। অশোককে পেঁছে দেবে আজকের পান্থশালায়।

শীতের কুয়াশায় ঘেরা বারাউনীর রেল বাজার। ঝুপড়ির দোকানে তখনো উনুনে আঁচ পড়েনি। একটু চা হলে অশোকের দেহটা চাঙ্গা হতো। আর অপেক্ষা অথবা সময়ের অপচয় ঠিক হবে না। রেল বাজার অতিক্রম করে ট্যাক্সি চলেছে জিরো মাইলের অভিমুখে। সামনেই লেভেল ক্রসিং। রেলগেট বন্ধ। কাটিহার প্যাসেঞ্জার আসছে। দাঁড়াতেই হলো। ট্রেন চলে গেছে। আবার যাত্রা। আখবন, গমখেত পেরিয়ে সর্পিল পথ দিয়ে ট্যাক্সি চলেছে পান্থনিবাসের অভিমুখে। মিনিট পনেরও লাগলো না। একেবারে পান্থনিবাসের পোর্টিকোর নীচে দণ্ডায়মান অশোক। শীতের সকালে অতিথিরা নিদ্রামগ্ন। সূর্য তখনো ওঠেনি। শুধু পূবাকাশে দেখা দিয়েছে নবীন কিরণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই রামনগরের বুকে সূর্য আলোকিত হবে। অশোকের চিন্তার অন্ধকার কাটবে কিনা তা ঈশ্বর জানেন। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দেবার আগেই তার সামনে কে একজন এসে সম্বর্ধনা জানালো।

আপনি কি মিত্র সাহেব? কোলকাতা থেকে এসেছেন? আসুন। বসুন। এই কেরামৎ চা লাও। এক পেয়ালা গর্ম চা লাও। এই ছুটু যাও চোদ্দ নাম্বার বানাও। চাবি লাও। কামরা খোলো। নয়া চাদ্দর লাগাও। লোকটি একদমে সব বলে গেল। মনে হলো যেন একটা রেকর্ড করা ক্যাসেট কেউ বাজিয়ে দিয়েছে। অশোক কল্পনাও করতে পারেনি এমন উষ্ণ আপ্যায়ন। তাও আবার স্পষ্ট বাংলায়। এই খোট্টার দেশে এমন ভদ্র বাংলা শিখলো কি করে? লোকটি তাকে চমকে দিয়েছে।

পান্থনিবাসের রক্ষক মহম্মদ আকরম আলী স্থানীয় লোক। এই অতিথিশালায় কাজের সুবাদে এবং বাঙালী সাহেবদের সেবা করার সুযোগে বাংলা ভাষাটাই শিখে নিয়েছে আকরম। শুধু শেখার জন্য শেখেনি। রীতিমতো বাঙালীর মতো উচ্চারণ করে। ও জানে এই পান্থনিবাসে অতিথির দলে বাঙালীর ঝাঁক। তাদের

খুশী করতে হলে তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে। অশোক এ ব্যাপারে অভিনন্দন সাহেবকে ফুল মার্কস দিতে নারাজ। উনি খুব ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অশোক এখানকার ভাষা জানে না। অথচ তাকেই স্থাপন করতে হবে যোগাযোগের কঠিনতম কাজ। আকরমের আপ্যায়নে সে মুগ্ধ। তবে রিসেপশন কাউণ্টারে নিজের নাম ঠিকানা লেখার আগে দেওয়ালে লেখা একটি স্লোগান তার চোখে পড়লো। 'হিন্দী গরব কা ভাষা হ্যায়, হিন্দী মে বাত কীজিয়ে।' পান্থনিবাসের প্রবেশ পথে আকরমের অভ্যর্থনায় আন্তরিকতা থাকলেও এই স্লোগানটি অশোকের কাছে সতর্ক-বাণী।

লাউঞ্জে বসে প্রবাস জীবনের প্রথম এক কাপ চায়ে চুমুক দিয়ে অশোক ভাবছে দিনটা ভাল যাবে তো? ইতিমধ্যে ছোটু চৌদা নাম্বার ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করছে।

সাব, কামরা তৈয়ার। চা পানান্তে আকরম নিজেই এস্‌কর্ট করে ঘরে নিয়ে এলো। অশোককে ভরসা দিয়ে বললো, কোনো চিন্তা করবেন না। পাশের ঘরেই থাকে ব্রজবাসী দাস। আরেক বাঙালী সাহেব। নতুন এসেছেন আমাদের এই কারখানায়। গত একবছর হলো এই পান্থনিবাসেই আছেন। উনি আমাদের হর্তা কর্তা বিধাতা। আমাদের বিভাগীয় প্রধান। ম্যানেজার পার্সোন্যাল অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

অশোকের মনে একটু ভরসা এলো। পাশের ঘরেই আছে ব্রজবাসী। আকরমও বাংলা জানে। মনোবল সঞ্চারের আগেই দুই সহায়ক চরিত্রকে সম্বল হিসেবে পেয়ে গেল। প্রবাসে বাঙালী মাত্রই সজ্জন। এক সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার কথাটা তার মনে পড়লো। ব্রজবাসী নিশ্চয়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেউ। বৈষ্ণবেরা বিনয়ী হয়। নাম শুনে তার এ ধারণা আরো দৃঢ় হলো। তাহলে কোনো ভয় নেই। এই অজানা দেশে তবু মাতৃভাষায় কথা বলা যাবে। পাণ্ডববর্জিত দেশে এমন যোগাযোগ হবে তা ভাবা যায় নি। পাণ্ডববর্জিত কথাটা সঠিক হলো না। আসলে এ হলো অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত সহচর বজরঙ্গবালীর দেশ। হনুমানজীর জয়গান চারি-দিকে। সবার মুখে ধ্বনি, জয় বজরঙ্গবালী। পবনপুত্রের প্রচারে

গোটা গ্রামটি মুখরিত। সেই নাম জপে যুবগণ পায় বাহুতে বল, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পায় মনোবল। আর পরপারের কথা যদি ভাবতেই হয় তবে সেক্ষেত্রেও হনুমানজীর অসীম কৃপা।

চোদ্দ নম্বর ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে অশোক স্নানের ঘরে ঢুকলো। দূরে বাজারের দিক থেকে ভেসে আসছে রামায়ণ পাঠের সুর। জয়, বজরঙ্গবালীর জয়! নাম সংকীর্তনে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠক একেবারে গদগদ। হাওয়ায় ভেসে আসছে সেই একাত্ম গীতের সঙ্গে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ। শীতের সকাল। গ্রাম্য পরিবেশে সঙ্গীত ধ্বনি বেশ ভাল লাগছে অশোকের। অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে হবে। আজই সকাল দশটায় কাজে যোগদান করার নির্দেশ আছে। ভাণ্ডারী সাহেবের কড়া নির্দেশ। ইউ জয়েন রামনগর অ্যাণ্ড দেন অ্যাভেইল ট্রান্সফার লীভ। তার মানে আগে নতুন জায়গায় শাণ্ট আউট করো অফিসারকে। তারপর দেখা যাবে জল কোন্ দিকে গড়ায়।

অশোককে নিয়ে কর্পোরেট অফিসের কর্তৃপক্ষের তেমন ভয় নেই। অভিনন্দন সাহেব দিল্লীতে বসেই সে খবর যাচাই করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের লোক একটু বেশী লড়াকু। তারা কংগ্রেসের জন্মদাতা হলেও বর্তমানে কম্যুনিজমের সঙ্গে বসবাস করছে। নতুন আত্মীয়তা করছে নকশালের সঙ্গে। ঘেরাও, লে-অফ, ক্লোজার ওই রাজ্যেই বেশী। কে বলতে পারে কার মধ্যে কি লুকিয়ে আছে? প্রতিভা এবং ক্ষমতা উভয়েই সুপ্ত থাকতে ভালোবাসে। মন্ত্রী টন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকতেও পারে। তবে সেই সমস্যা, মানে প্রতিবাদের প্রসঙ্গটা, ওখানেই মিটে গেছে। তার কোনো খুঁটি নেই। রাজনীতিতে নেই কোনো মামা। সে একজন বিদেশী। তবে স্বদেশ প্রেম প্রবল। সেই জন্যই তো বেচারার যত ভোগান্তি। বিলেতের প্রাচুর্য ছেড়ে কেউ এই মরার দেশে চাকরি করতে আসে? সে একটা মূর্খ। স্বাধীন দেশের লোক যে কতো পরাধীন তা জানতো না বলেই তো আজকের এই মরন ফাঁস তার গলায়।

অশোক রাজনীতি করেনা। যদি এতটুকু রাজনীতির গন্ধ থাকতো তবে কিরণ অবশ্যই জানিয়ে দিত। অভিনন্দন সাহেবের এ দৃঢ়

বিশ্বাস আছে তাঁর সাব অর্ডিনেটের ওপর। কোলকাতায় বসে জি-এমদের প্রথম কর্তব্য হলো কর্পোরেট বাবুদের কাছে খবর পাচার করা। প্রতিটি অফিসারের ব্যাকগ্রাউণ্ড, এমন কি পলিটিক্যাল কানেকশন জানিয়ে রাখা। কর্তৃপক্ষ সেখানেই আঘাত হানবেন যেখান থেকে প্রত্যাঘাতের ভয় নেই। অভিনন্দন সাহেব নিজে এসেছেন রাজনীতির রথে চেপে। তাই কোনো এম পিকেই অসন্তুষ্ট করতে চান না। অপরদিকে তাঁর একান্ত আস্থাভাজন বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসাতে চান কোলকাতার ঝাউতলা অফিসে। বেচারীকে ভার্মাসাহেব চিঠি ধরিয়ে দিয়েছেন। পানীটোলায় বদলীর আদেশ বুকপকেটে নিয়ে সে নির্বিকার ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজধানীর রাজপথে। সে জানে তার পরিত্রাতা এলো বলে। শুধু একটু সময়ের ব্যবধান মাত্র। জয় তার সুনিশ্চিত।

বিপুল জনসংযোগ বিভাগের আদি লোক। একজন ঝানু পিয়ারো। রাজধানীর সাংবাদিক মহলে খুব ঘনিষ্ঠতা। ওরা সবাই এক গেলাসের বন্ধু। যেমন ভাবে খবর খাওয়াবে ওরা তাই খাবে। এখানেই তো জনসংযোগের জাদু। দীর্ঘদিন দিল্লীতে বাস। কথায় পাঞ্জাবী সুর, খিস্তিতে ওস্তাদ। চোখের সামনে আট আটজন সি এম ডি কে আসতে দেখলো। আবার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চলেও গেলো। তাই ভার্মাসাহেবের বদলীর অর্ডার ওর কাছে একখণ্ড কাগজের চিরকুট ছাড়া কিছুই নয়। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান হলো সব ঘুঘুর বাসা। প্রতি পদক্ষেপে রাজনীতির চাল। সবাই যেন স্পাইয়িং করছে। কেউ বা আবার ডাবল স্পাইয়িং। কে যে কার দলে তা বোঝা মুস্কিল।

বিপুলের অবহেলা সূচক আচরণ ভার্মাসাহেবকে ভাবিয়ে তুলেছে। চাল চলন যেন অনেকটা পাড়ার মাস্তানের মতো। প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করে বুক ফুলিয়ে চলা। ভার্মাসাহেবের সন্দেহ হচ্ছে। বিপুল ওকে খুব সম্ভব ডীচ্ করছে। অভিনন্দন সাহেব নির্বাচিত হয়েছেন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে। সি এম ডির পদে যোগদান করার কথা। অথচ কাজে যোগদান করছেন না। ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে জি কে ভির। ভেবেছিলেন এবার

হয়তো একটানা কয়েক বছর অস্থায়ী পরিচালকের কাজ চালিয়ে যাবেন। তারপর ঐ অস্থায়ী কথাটা মুছে যাবে। চাকরীটা পাকা হবে এবং সেই মসনদ থেকেই নেবেন অবসর। এই পোড়ার প্রতিষ্ঠানে উচ্চমার্গের লোক আসবে কেন? ডুবন্ত জাহাজের কাণ্ডারী হওয়ার বাসনা কোনো কোয়ালিফায়েড লোকের থাকতে পারে না। নন্দীগ্রামের এণ্ড টু এণ্ড সার্ভের কাজটা হয়তো তাঁর হাতেই হবে। চারশ কোটি টাকার প্রকল্প। শতকরা দশভাগ যদি ওরা কীক্-ব্যাক দেয় তাই বা মন্দ কি?

সারা বিশ্বে চলেছে কমিশনের ক্রিয়াকলাপ। এতে দোষেরই বা কি আছে? যে কোনো কোম্পানীই এই ধরণের একটা টেণ্ডার ধরার জন্য বড় কর্তার ব্যাঙ্কে কিছু উপঢৌকন দিতে চাইবে। এটা খুশীর ব্যাপার। বিদেশী কোম্পানীগুলোর এই এক রীতি। তারা কস্টিং করার সময় কিক্ব্যাক নামে একটি আইটেম রাখে। যে অর্ডার দেবে তার ঘরে পেঁছে যাবে সার্ভিস চার্জ। টাকা তো ভারতে আসছে না। থাকবে বার্ন শহরের ব্যাঙ্কে। একটা সাঙ্কেতিক নাম্বার মাধ্যমে লেনদেন। পি আই এন, পিন জানিয়ে দেওয়া হবে বিশেষ দূত মারফৎ। পিন, মানে পার্সোনাল ইনডেকস্ নাম্বার, কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না। তাই ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পাবে না। বিপুল যে অভিনন্দন সাহেবের সঙ্গে সকাল বিকেল খবর পাচার করছে তাই কি তিনি জানতেন? হঠাৎ রাজধানীর ইংরেজি দৈনিকে দেখা গেল খবরটা। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের সামনে বিরাট বাঁধা। গুণী একজন টেক্নোক্র্যাটকে প্রবেশাধিকার দিচ্ছেনা বৃন্দাবন প্লেসের এক দুষ্টচক্র। নাম উল্লেখ না করেও সাংবাদিক তা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কে বা কারা এই চক্রের পরিমণ্ডলে আছেন তা ওয়াকিবহাল পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় নি।

সকালের সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে জি কে ভির চক্ষু চড়কগাছ। অফিসে এসেই প্রথমে ডাকলেন বিপুলকে। তিনি জানেন এ কর্ম কার? এবারের খেলায় জনসংযোগই জয়ী।

আরে বাবা, পিয়ারোকে নিয়ে পেঁয়াজী। জনসংযোগকে অবহেলা!

আজ পর্যন্ত কোনো কেষ্ট বিষ্টু পারে নি যে দুঃসাহস দেখাতে তুমি ভার্মা ভয় দেখাবে তাকে। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে তবে পিয়ারোর শান্তি। গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য চাই অনেক কাঠখড়।

ভার্মা সাহেব তখনো ক্ষমতায় সি এম ডি। ডেকে পাঠালেন ভাণ্ডারী সাহেবকে। শালে কো আভি হঠাও ইধার সে। একটু চড়া সুরেই নির্দেশ দিলেন তিনি। এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রান্সফার অর্ডার তৈরী। যাও বাঙালীবাবু এবার আসামের পানীটোলায়। দেখ সেখানকার জলের স্বাদ কেমন। বিপুল ভেবেছিল সংবাদ-পত্রের খবরটা মিনিস্ট্রি খাবে ভাল। কিন্তু তা যে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে নিজের ঘাড়ে তা কল্পনাও করতে পারেনি।

বিজিনেস্ ফোরাম পত্রিকায় অসিতাভ মণ্ডলের প্রতিবেদনে খবরটি পড়েই ভার্মা সাহেবের মাথায় কিসের যেন একটা ঘণ্টা বেজে গেল। কে এই অসিতাভ মণ্ডল ? এই ভদ্রলোকই তো গতবছর নন্দীগ্রাম প্রকল্প দেখতে গিয়েছিল সপরিবারে। কর্তৃপক্ষ তার আদর আপ্যায়নের ত্রুটি করেনি। খানাপিনার ছিল পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। রিপোর্টও বেশ ভাল করেছিল। দু-কলম জুড়ে প্রায় ষোল সেণ্টিমিটার কভারেজ। সেই একই সাংবাদিক আবার কোন্ মুখে নিন্দা করছে ভার্মা সাহেবের।

গোপনে এস টি ডি গেল ঝাউতলা অফিসে। আভি ভেজো প্রবীর বোসকো। রাজধানী একস্প্রেস মে টিকিট নেই হোগা তো প্লেনমে ভেজো। তুরন্ত! জি কে ভির টেলিফোন বার্তা পেয়েই বিকিরণ সাহেব সব ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রবীরকে পাঠালেন দিল্লীতে। প্রবীর জাত জনসংযোগের লোক। সে জানে নাটকের পরিবর্তন কিভাবে করতে হয়। আত্মরক্ষা জীবের ধর্ম। আত্মপ্রতিষ্ঠা জনসংযোগের কর্ম। সেলফ ডিফেন্সের সব অস্ত্র শানিত করে সে দৌড়ালো দিল্লীর পথে। কর্তৃপক্ষকে বিপদে ফেলা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। বিশেষ করে কোলকাতার সব রিপোর্টারের সঙ্গে তার দারুণ র‍্যাপোর্ট। ওরা সবাই তার ইয়ার বন্ধু। জিগরী দোস্ত। কিন্তু কাদা ছিটে যেন নিজের গায়ে না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। সে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে তৈরী।

প্রবীরের ইনটিউশন বড়ো প্রখর। পুলিশী কুকুরের মতো তার ঘ্রাণশক্তি। সব কাজের ভবিষ্যৎ তার মনের দর্পণে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। হঠাৎ দিল্লী থেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন ভার্মা সাহেব। ডালমে কুছ কালা জরুর। আরে অবোধ, কোথায় খুলিছ খাপ পলাশীর প্রান্তরে। তুমি যদি বাঁশ হও আমি তবে কঞ্চি। বেঁকবো তবু ভাঙ্‌বো না। এসব ভাবতে ভাবতে প্রবীর তার বিশবস্ত সেনাপতি সমরকে ডেকে পাঠালো। তারপর সে লেগে পড়লো কেজিবি তৎপরতায়। ঐ যে যাকে বলে ষষ্ঠেন্দ্রিয়। তার মাধ্যমেই আঁচ করেছে সে। নন্দীগ্রামের সাংবাদিক বন্ধুকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়ই কোথাও জল ঘোলা হয়েছে। দাসানুদাস সমর খুঁজে খুঁজে বের করলো সেই সফরের দিন তারিখ। দেখা গেল ঐ বিশেষ দিনটিতে বস্‌ ছিলেন অন্‌ ক্যাজুয়াল লীভ। নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে চেপে বসলো আই সি ৪০১ বিমানে। সঙ্গে নিয়ে গেল নকুড় নন্দীর এক বাক্‌স সন্দেশ। প্রবীর জানে ভার্মা সাহেব ক্যালকাটা স্পেশাল এই দ্রব্যটিকে দারুণ ভালোবাসেন। তাছাড়া রসের মিষ্টি প্লেনে নিয়ে যাওয়াও অনেক ঝামেলা। বড় সাহেব তলব করেছেন। কোলকাতার স্পেশাল হাতে দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হবে যথার্থ জনসংযোগের কাজ। ব্যয় সংকোচের কোনো চিন্তা নেই। সবই হুজুরের আদেশ। অস্টারিটি, ইকনমিক অস্টারিটি কথাটি শুধু সাব-অর্ডিনেটদের কাছে বক্তৃতার শব্দগুচ্ছ-মাত্র। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের স্তোত্রপাঠ অনেকের মুখেই শোনা যায়। কিন্তু কেউ মেনে চলে না।

বিমানপথে দিল্লী কতটুকুই বা পথ? প্রবীর সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই পালাম পেঁছে গেল। পরদিন সকাল দশটায় নাটকের যবনিকা উত্তোলন হবে বৃন্দাবন প্লেসের মঞ্চে। চিন্তা মনের মধ্যে বাসা বেঁধেই থাকলো। অনেক সময় সবথেকে একসপার্ট ড্রাইভারই গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে। রাতের প্রহরগুলো যেন কাটতে চায় না। ঘুমের আরাধনায় একটা ফাইভ এম জি ভ্যালিয়াম খেতেই হলো। মিসেস্‌ বোস বাড়ী থেকে রওনা হওয়ায় মুহূর্তেও মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে। নো টেনশন্‌ প্লীজ। স্টে ফ্রী। কোনো চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবে না। ওরা রাস্তার কুকুরের মতো। প্রশ্রয় পেলেই

মাথায় চেপে বসে। চিন্তা মাথায় চাপলেই বিপদ। যে কোনো সময় কামড়ে দিতে পারে। তাই চিন্তা নামক শত্রুকে মনের সীমানার বাইরে রাখবে। স্ত্রীর কথা মনে আছে তবুও চিন্তাকে বিসর্জন দিতে পারছে না সে। বৌ বল্লেই কি মনকে মুক্ত করা যায়? চিন্তা হলো এক দুষ্ট ব্যাধি। মনকে কুরে কুরে খায়। ভ্যালিয়ামের বড়িটা গলাধঃকরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে ভেবেছে চিন্তাকে মনের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবে না। কিন্তু ব্যাটা বিপুল কি বিপদেই না ফেলেছে। আরে, তোর এতো ঝামেলায় যাওয়ার কি প্রয়োজন? কে এলো, কে গেল তাতে জনসংযোগ বিভাগের কি এসে যায়? নিজের গদী ঠিক রাখা হলো কৌশলের কাজ। ছেলে নেই, পুলে নেই। নিতান্তই নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। নেই কোনো অভাব অনটন। দিব্বি ঘরসংসার করছিস রাজধানী শহরে। কোম্পানীর পয়সায় মাল টানছিস। মাস গেলে পাঁচহাজারের একখানা চেক। তার ওপর আছে ক্যাণ্টিন অ্যালাউন্স একশ টাকা। কার অ্যালাউন্স পাঁচশ টাকা। জীবনে তো একদিনও গাড়ী আনিস না অফিসে। যাতায়াত চলে চার্টার্ড বাসে। বছরে দু সেট ট্রাউজার-শার্ট, একসেট জ্যাকেট, একজোড়া অ্যাম্বাসেডার জুতো। রীতিমতো সুখের জীবন। এমন কি করে বসলো সে যাতে ভার্মা নামক বাজপাখীর আক্রমণ হলো ওর ওপর। সুখের জীবনে কেন এই ছন্দপতন? বৃন্দাবন প্লেস ছেড়ে সুদূর বর্মা বর্ডারে বদলীর নির্দেশ। ভ্যালিয়াম ফাইভের ক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবীর ভেবে চলেছে। দেয়ার মাস্ট বী সামথিং রঙ্!

সকাল দশটায় সোজা বৃন্দাবন প্লেস। জিকেভির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দিনের শুরুতে দরজা বন্ধ করে, সম্পূর্ণ নাঙ্গাবস্থায় ছত্রিশ দেবতার চরণে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা তাঁর অভ্যাস। পুজোর সব বন্দোবস্ত তৈরী। ধূপকাঠিতে অগ্নিসংযোগ করতে যাবেন এমন সময় দরজায় করাঘাত, নক্ নক্! সকাল দশটা, বৃন্দাবন প্লেসে খোদ অ্যাক্টিং ম্যানেজিং ডিরেকটারের দরজায় করাঘাত? ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যথারীতি দেবতাদের চরণে প্রণাম সেরে দরজাটা একটু ফাঁক করে

উঁকি দিলেন। সামনেই করজোড়ে দণ্ডায়মান প্রবীর বোস। প্লীজ কাম ইন। একথা বলেই স্বয়ং সি এম ডি কোলকাতার মহামান্য পিয়ারোকে নিজের ঘরে বসতে বল্লেন।

শুধু বসার অনুরোধ নয়, এ যেন আবাহন। ওকে তাঁর ভীষণ দরকার। তাঁর চিন্তার জট ছাড়াতে, সমস্যার আবরণ উন্মোচন করতে ওই কেবল সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া ওর সুনাম আছে গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে। আধুনিক ইণ্ডাস্ট্রিতে একজন সত্যিকারের জনসংযোগের লোক। একবার তাজবেঙ্গলের এক চায়েয় আসরে সাহিত্যিক ভীষ্মলোচন শর্মা ওকে জনসংযোগের জাদুকর বলেছিলেন। সত্যিই, বড়ো বড়ো বস্‌কে কথার কারসাজিতে বশ করায় ও ওস্তাদ। তাই তো মজুমদার সাহেব ওকে নন্দীগ্রাম থেকে তুলে এনে ঝাউতলায় ট্রান্সপ্লাণ্ট করেছিলেন। মিস্টার মজুমদারের খাই খাই রোগের দাওয়াই শুধু ও জানতো। ওর বাইরের ভদ্রতা, দু-একটা হিউমারের মারপ্যাঁচে কতো জটিল ঘটনাকে ছাই চাপা দেওয়া হয়েছে জি কে ভি তা অবগত আছেন।

প্রবীর ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাঁ পাশের পিয়ানো সুইচটি টিপে জেবলে দিলেন 'ডু নট ডিস্টার্ব'-এর লাল বাতি।

অব বোলিয়ে বোস সাব, ক্যায়ছে হ্যায়? বলে ভার্মা সাহেব ডান দিকের ড্রয়ারটি খুললেন। যেমন করে হলিউডের ভিলেন বের করে থাকে পিস্তল ঠিক সেই কায়দায় তিনি টেনে বের করলেন একগোছা কাগজ। তারপর সব মেলে ধরলেন টেবিলে। ফ্লাশ খেলার বিজয়ীর মতো তিনখানা টেক্কা যেন শো করলেন অপর পক্ষকে। একেবারে প্রবীরের সামনে ডিসপ্লে করলেন তাঁর সব রসদ। এমনভাবে সাজিয়ে রাখলেন যাতে সে দেখতে পায় স্পষ্টভাবে।

তারপর অত্যন্ত সহজ সুরে বল্লেন, নাউ মিস্টার বোস। ইউ টেল মী হু ইজ দিস্ অসিতাভ মণ্ডল? গতকালের বিজিনেস্ ফোরামে বৃন্দাবন প্লেসের কেচ্ছা ছেপেছে। ইজ ইট দ্য সেইম ম্যান হু কাভারড আওয়ার নন্দীগ্রাম প্রজেক্ট? ওকে আমরা যথেষ্ট

আপ্যায়ন করেছি। এই দেখ পনের হাজার টাকার বিল। সঙ্গে সব ভাউচার লাগানো আছে। অবশ্য সবকিছুর তো ভাউচার হয় না। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের একটা প্রথা আছে। একমাত্র বিদেশী ছাড়া কাউকে তরল পানীয় সার্ভ করার নিয়ম নেই। অথচ সাংবাদিক সম্মেলনের নামে আট হাজার টাকার ড্রিংকস্‌ সরবরাহ করা হয়েছে। এই দেখ বিপুলের নিজের হাতের লেখা কাঁচা ভাউচার। আমি আমার বিশেষ ক্ষমতাবলে সব পাশ করে দিয়েছি। পেমেণ্টটা ওকে নগদে দেওয়া হয়েছে। আর ঠিক এক বছরের মাথায় দ্য সেইম রিপোর্টার সেণ্ট আ ডেস্‌পাচ্‌। ডেস্‌পাচ্‌ উইথ সাচ্‌ আ নাস্টি নিউজ। ভার্মা সাহেব একদমে বলে গেলেন বিপুলের বেইমানীর ইতিহাস।

প্রবীর সব শুনে একেবারে স্তম্ভিত! অনেক জাগ্‌লার জেনারেল ম্যানেজার সে দেখেছে। অনেক বদ জি এমের হুকুমও তামিল করেছে। রমণীবিলাসী বড় সাহেবকে সন্ধ্যার পর শান্ত করার বন্দোবস্তও করেছে। কর্তৃপক্ষের কথার সুরে সুর মিলিয়ে বহু সঙ্গীত বিতরণ করেছে সে। জনসাধারণকে তুষ্ট করাই ওর কাজ। ও একজন আদর্শ আজ্ঞাবাহী পিয়ারো। হোটেলের ম্যানেজার হলেও জীবনে উন্নতি করতে পারতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে জনসংযোগের বৃত্তিকেই লোভনীয় মনে করেছে। লাভজনক তো বটেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ভার্মা সাহেবের প্রশ্নের উত্তর কি দেবে? প্রথমতঃ গতবারের নন্দীগ্রামে প্রেসটীমের সঙ্গে অসিতাভ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সেই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকৃতপক্ষে কোনো খরচই হয়নি। যাতায়াত কোম্পানীর গাড়ীতে। রাত্রিযাপন সমুদ্র সৈকত হোমে। তাও আবার সরকারী অতিথি হিসেবে। লানচ-ডিনার সবই আমন্ত্রণমূলক। পানীয় বলতে ক্যাম্পাকোলা। সেই নরম পানীয়ের জন্য আট হাজার টাকা? সব কথাগুলো ওর মনের পর্দায় ছবির মতো ভেসে উঠলো। মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারিত হলো,

স্যর। আমি যদিও ওদের সঙ্গে ছিলাম কিন্তু সেই সফর ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। একদিনের ক্যাজুয়্যাল লীভ নিয়ে অসিতাভের

সঙ্গে যাব ভেবেছিলাম। মিসেস্ মণ্ডল আমার স্ত্রীর বান্ধবী। তার অনুরোধেই আমি রাজী হয়েছিলাম। ও শেষ মুহূর্তে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেছিল। বিপুলের অনুরোধে আমি ব্যক্তিগত সফর করেছিলাম। যদ্দুর মনে পড়ে ঐ প্রেস্ টীমের জন্য কোনো নগদ পয়সা খরচ হয়নি।

দেখো শালা বিপুল ক্যায়া লিখায়া। আকবারমে ক্যায়া ছাপ দিয়া। বাঞ্চোৎকো হাম আভি ভাগায়েগা। ভার্মা সাহেব উত্তেজিত হয়েই সব উদগীরণ করলেন।

আসলে প্রবীরের বক্তব্য শুনে তিনি পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। বিপুলের লোভ, অর্থলালসা এবং অস্থায়ী চেয়ার-ম্যানকে অপমান করার ষড়যন্ত্র সবই প্রবীরের স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট হয়ে গেল। সে আর একবার পিয়ারোর কর্তব্য পালন করে দেখালো জীবনে বড়ো হতে গেলে এ ধরণের প্যাঁচ একটু কষতেই হয়। যারা তা করতে চায় না তারা বোকা পাঁঠা। এক নম্বর উল্লু কা পাটঠে।

বিপুলকে বদলী করা হল। কিন্তু সে কিছুতেই বৃন্দাবন প্লেস ছাড়লো না। ভার্মা সাহেব ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। তা কার্যকরী হল না। অভিনন্দন সাহেবের আগমনে সেই আদেশ হল পরিবর্তন। সে মহাপিতা সি এম ডির কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। ক্ষমা হি পরমং বলম্। গান্ধীজী বলেছেন, ক্ষমা করো দীনজনে। লোকে বলে, শত্রুর শত্রু হতে পারে শ্রেষ্ঠ মিত্র। অভিনন্দন সাহেব সেই প্রবাদে নির্ভর করেন। ভার্মা দমন নীতিতে বিপুল পেল শেলটার। ভার্মা সাহেব নিজের ওগরানো থুথু চেটে খেলেন। মনে মনে একটা আক্রোশ থেকেই গেল। তিনি দাবার ঘুঁটির চাল সব হিসেব করে ফেল্লেন। এ এস এমের যদি মন্ত্রী সহায় তবে তাঁরও আছে তিন ডজন এম পি। একজন মন্ত্রীর ক্ষমতা অপেক্ষা ছত্রিশজন মেম্বার অফ পার্লামেণ্টের ওজন ভারী হতেই হবে। তিনি ভবিষ্যতের ছবি দেখলেন মানস নেত্রে। সাময়িক অস্বস্তিকে ভুলতে চাইলেন। এ পৃথিবীতে কেউই অমর নয়। বৃন্দাবন প্লেসের চেয়ার বড় নড়বড়ে। কোহিনুরের অভিশাপ আছে এই

কুঁশিতে। বসার বাসনা যত প্রবল আবার অধঃপতনের সম্ভাবনাও তেমনি তীব্র। ব্যাপারটা শুধু ধৈর্যের। ধৈর্যের পরীক্ষায় জি কে ভিকে পাশ করতেই হবে। সবুরে মেওয়া ফলে।

* * *

স্নান সেরে অশোক তৈরী। আজ তার নতুন কর্মস্থলে যোগদানের দিন। শুভ আরম্ভ অথবা অশুভ সংকেত যাই হোক না কেন যোগদান তাকে করতেই হবে। দোতলা থেকে নেমে পান্থনিবাসের ম্যানেজার রামপ্রসাদের ঘরে বসলো। তারপর প্রাথমিক পরিচয় এবং সংক্ষিপ্ত সংলাপ। আধা ইংরেজি আধা হিন্দিতে ভাব বিনিময়। কথার মাঝখানে একজনকে দেখে হঠাৎ রামপ্রসাদ দাঁড়িয়ে পড়লো চেয়ার থেকে। পরনে তার ডোরাকাটা লুঙ্গি এবং হাতে চারমিনারের রোশনাই। চেহারায় তেমন চাকচিক্য নেই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নাকের নীচে হিটলারী গোঁফ। এবং তার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে একজোড়া খরগোসের দাঁত। অশোক ম্যানেজারের সামনে বসে। লোকটা বাগানের মালীও হতে পারে, আবার বাজারের মুটে হওয়াও অস্বাবিক নয়। কিন্তু তাকে দেখে রামপ্রসাদের সম্মান প্রদর্শনের কি আছে? ক্ষাণিক বাদেই অশোকের সঙ্গে পরিচয় হল লোকটির। রামপ্রসাদই পরিচয় করিয়ে দিল।

মিলিয়ে হাম্ লোগকা বস্ ব্রজবাসী দাস সাব্‌কো। হামারা এইচ ও ডি, ম্যানেজার পার্সোনাল। আপ কো ভি বস্ হোগা। ব্রজবাসীর সঙ্গে পরিচিত হবার পরই অশোক আগামী দিনগুলোর ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল মনের পর্দায়। রামনগর কারখানার অনেক কাহিনী তার শোনা। আজই সে কাজে যোগদান করবে। পূর্ববর্তী পিয়ারো যমুনাপ্রসাদ নিজের কুকীর্তি অক্ষয় রেখে প্রস্থান করেছে বৃন্দাবনে। এ এস এম সাহেবের ভাবমূর্তি তাঁকেই রচনা করতে হবে। বৃন্দাবনবাসীকে স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে তুলনা করার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। আর অশোক জনসংযোগের সেতুবন্ধন করবে রামনগরে। ব্রজবাসী দাস তার বস্। বিচার করবে জনসংযোগের কাজ। তাকে প্রতিপদক্ষেপে এই বসের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বন্দোবস্ত।

জনসংযোগের সংজ্ঞা যার অজানা সেই হবে বিভাগীর কাজের বিচারক। মন্তব্য করবে নোটশীটে। বছরের শেষে সি আর, মানে কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট, লিখবে অশোকের। রামপ্রসাদ এ কথাও উল্লেখ করতে ভোলে নি যে, এই বস্ একেবারে নতুন। মাত্র কয়েকমাস হলো রামনগরে এসেছে। এখনো প্রবেশন শেষ হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে প্রবেশন শেষ হলেই প্রমোশন। ডি জি এমের পদটি শূন্য পড়ে আছে। ভাণ্ডারী সাহেব ওকে কথা দিয়েছেন। আসলে ব্রজবাসীর হাতে বাঁশীটি উনিই ধরিয়ে দিয়েছেন।

সকাল দশটায় নতুন কর্মস্থলে যেতে হবে। অশোক তৈরী হয়ে নিল এবং পান্হনিবাসের নাস্তার পর অপেক্ষা করতে লাগলো। কারখানা থেকে গাড়ী আসবে ওকে নিয়ে যেতে। গাড়ী আসতে খুবই দেরী হচ্ছে। রামপ্রসাদ দু-তিনবার ইন্টারকামে বস্‌কে স্মরণ করিয়ে দিল। তবুও আসছে না গাড়ী।

অশোক শুধু প্রতীক্ষা করে চলেছে প্রতি সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা। ভাবছে কেন এই প্রতীক্ষা, কিসের এই পরীক্ষা? একি দুর্ভোগ, না দুঃসহ জীবনের শুরু? শুধুই দেশের মায়া। দেশের প্রতি কোনো আকর্ষণই ছিল না ওর। লণ্ডনে বেশ ভালই ছিল। তবুও দেশের আকর্ষণী শক্তি ওকে টেনে আনলো। আঠারোশ' পাউণ্ডের চাকরী ছেড়ে ছ শ' টাকার খিতমতগারী। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান। সেখানে সর্বভারতীয় সুর। একতা, সংহতি এবং দেশের উন্নতির বিরাট সব স্লোগান। পাউণ্ডের প্রতি প্রলোভন ওর আদৌ ছিল না। দেশ, আমার দেশ! ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

সোনার বাংলার মোহে সাড়া দিয়েই যত দুর্গতি। বিধাননগরে ওর নবজন্ম। সার্বজনিক কারখানায় শিক্ষানবিশী। দয়াল সাহেবের কাছে হাতেখড়ি। জনসংযোগের কাজ ও কোনোদিন করেনি। তবুও চেষ্টা। মানিয়ে নেবার চেষ্টা। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের নানা নীতি, অদ্ভুত সব রীতি শেখা। না, নীতি বলে কিছু নেই এখানে। যদি নীতি থাকবে তবে প্রবীর বোসেরা এত

প্রাধান্য পায় কি করে? জনসংযোগের নামে রমণী সংযোগের ব্যবস্থা অথবা বেসাতি। লোভী বড় সাহেবদের খুশীর জন্য নানাবিধ উৎকোচ, উপঢৌকন। সে কি সহজ পথে এত অল্প সময়ে দুদুটো প্রমোশন পেত? সাহিত্যিক ভীষ্মলোচন শর্মা এই পথকেই বলেছেন, পিয়ার বাই সেক্স। সব রসের মূলে আদিরস। তাবড় তাবড় মানুষকে বস করার এ এক অব্যর্থ ওষুধ। প্রবীর সেই গুহ্যকথাটি শিখেছিল নন্দীগ্রামের জীবনে। তারপর সময়ের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করেছে। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে কর্মজীবনে সোনা ফলিয়েছে।

অশোক জানে সে এই প্রতিষ্ঠানে মিস্‌ফিট্। সম্পূর্ণ বেমানান। ডারউইন সাহেব ঠিকই বলেছেন, সারভাইবাল অফ দ্য ফিটেস্ট। যোগ্য লোকেরাই পৃথিবীতে টিকে থাকার অধিকারী। এত বড়ো ডাইনোসারসগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। অথচ পিঁপড়েগুলো কেমন চালিয়ে যাচ্ছে সাবলীল জীবনযাত্রা। এজগতে বাঁচতে হলে, টিকে থাকতে হলে মানিয়ে নেবার কৌশল জানতে হবে। পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরী করার জন্য জানা প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের মনোভাব, রুচি এবং তাঁদের কি অভিপ্রায়। যেমন দেবতা, তেমন তার পুজো। প্রত্যেকের মন্ত্র স্বতন্ত্র। প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস জানা চাই। ভূগোল জানা প্রয়োজন। কাঁচামাল কোথায়, কি দামে লভ্য সে খবরও রাখতে হবে নখদর্পণে। এর জন্য চাই দক্ষ পিয়ারো। জাঁকজমক পূর্ণ জনসংযোগ বিভাগ। বহু অর্থব্যয়ে শ্বেতহস্তী পোষা। অশোক বিধাননগরে প্রথম কাজে যোগদান করেছিল। প্রতিষ্ঠা পায় নি। ঝাউতলা বদলী হলো গাঙ্গুলী সাহেবের ফর্মুলায়। কিন্তু নন্দীগ্রামের ভূত এসে চাপলো ঘাড়ে। প্রবীর সমর নামক নন্দী ভৃঙ্গী সর্বদাই পশ্চাৎদেশে বংশদণ্ড নিয়ে তাড়া করেছে। গঠন মূলক কোনো কাজই করতে দেয়নি ওকে। প্রতি পদক্ষেপে নাস্তানাবুদ। ওরা দুজনে ঝাউতলাকে ঝালাপালা করে বেড়িয়েছে।

পান্থনিবাসের লাউঞ্জে বসে কতো কথাই না বিচলিত করে

অশোককে। রামনগরের অস্তিত্বই আজ বাস্তব। রূঢ় বাস্তব। কঠিন কর্মজীবনের প্রলেপবিহীন যন্ত্রণা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। গাড়ীর হুটারিং শুনে তার খেয়াল হলো এক্ষুণি যেতে হবে কারখানায়।

পান্থনিবাসের পোর্টিকোর নীচে একখানা জীপ দণ্ডায়মান। আকরম আলীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। হে ছোটু, নয়া সাবকো বোলাও। গাড়িয়া আ গেলাক। তাহলে ব্রজবাসী দাস নবাগত জনসংযোগ অফিসারকে বরণ করতে চাইছে। গাড়ী এসে পৌঁছানো মানেই শুভ সূচনা। প্রবাসে সব বাঙালীই সজ্জন। সেই মনোবল নিয়ে অথবা আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে অশোক চললো রামনগর অভিসারে। না অভিসারে কথাটা ঠিক হলো না। সে সতেজ মনোবল নিয়ে চলেছে অভিযানে। দুপুর বারোটার মধ্যেই রিপোর্টিং। প্রথমে উপস্থিত হলো পি এম মিস্টার ব্রজবসী দাসের ঘরে। সে কৃত্রিম ব্যস্ততার ভাণ করে পাঠালো তস্য অধঃস্তন সহকর্মী পার্সোনাল অফিসারের কাছে। গুরুদত্ত সিংহ এইসব নয়া অফিসারের অর্ডার দেখাশোনা করে। একজন অভিজ্ঞ কেরাণী। দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাশুল পেয়েছে। বর্তমানে পি ও। অশোকের সব কাগজপত্তর খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সন্দেহবাতিক ইমিগ্রেশন অফিসারের মতো। নতুন দেশে প্রবেশের পূর্বে সবকিছু যাচাই করে প্রবেশাধিকার দেওয়া তার কাজ।

অশোককে প্রায় হাত ধরে একগোছা কাগজে সই করিয়ে নিল সিংহজী এবং ওকে একটি কোড নাম্বার দিয়ে বললো, নাউ মিস্টার মিট্রা, ইউ আর ওয়ান অফ আওয়ার অফিসার্স। ওয়েলকাম টু রামনগর। তারপর ইণ্টারকামে একজনকে ডেকে পাঠালো। ওয়েলকাম-টী শেষ হওয়ার আগেই উপস্থিত হনুমান প্রসাদ। রামনগরের হিন্দী অফিসার। গোটা রামনগরের পরম্পরা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাকে রাখা হয়েছে। রামনগরকে হিন্দীনগর গড়ে তোলার দায়িত্ব তার ওপর। ভারত সরকারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এই পরিকল্পনা। গুরুদত্ত পরিচয় করিয়ে দিল।

মিলিয়ে হামলোগকো হিন্দী আধিকারিক সে। তারপর তাকে দায়িত্ব দিল অশোককে সব বুঝিয়ে সুজিয়ে দেবার জন্য। হনুমানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে পবনবেগে হাজির দ্বিতীয় ব্যক্তি। গুরুদত্ত তার দর্শনে খুব খুশী।

বহুত আচ্ছা। আপকা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ভি আ গয়া। মিলিয়ে শ্যামসুন্দর যাদবজীকো। এপিয়ারো যাদবজী বহুৎ শান্দার আদমী। রামনগরের জি এম আর পি এমের ঘনিষ্ঠ লোক। ওরা উভয়েই একে সমঝে চলে। অসীম ক্ষমতা এর। দশ মিনিটের নোটিশে কারখানায় ধর্মঘট করিয়ে দিতে পারে। প্রথম পরিচয়ে এবম্‌বিধ গুণাবলী শ্রবণে অশোকের অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু গুরুদত্তের হয়তো এটাই কৌশল। নতুন কোনো অফিসার এলে তাকে অনুগত করে রাখার এই মন্ত্রই সে উচ্চারণ করে থাকে। অতিশয় বিনয় সহকারে শ্যামসুন্দর তার নতুন বস্‌ মিস্টার মিট্‌রাকে প্রণাম জানালো। অশোক ভাবলো, প্রথম পরিচয়ে নমস্কার জানানো ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু যাদবজী নমস্কার না জানিয়ে পরনাম করছে কেন? অতি বিনয়ও ভয়ের ব্যাপার। অতি ভক্তি নাকি চোরের লক্ষণ। অশোক সবই বুঝতে পারছে। তবে কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না। তার কোনো উপায় নেই। তাকে কামড়ে দিয়েছে পাগলা কুকুরে। নাভি কুণ্ডের চতুস্পার্শে চোদ্দখানা সূঁচ ফোটাতেই হবে। ভয় পেলে চলবে না। সব যন্ত্রনা সহ্য করতে হবে। নতুবা জলাতঙ্কে মৃত্যু বরণ। সত্যিই, অশোকের কাছে অভিনন্দন একটা পাগলা কুকুরই বটে। দুখানা বিষওয়ালা দাঁত বের করেই আছে। যে কোনো মুহূর্তে কামড়ে দিচ্ছে যাকে সামনে পাচ্ছে। অশোক কি বিপদেই না পড়েছে। শান্তি বলে কিছুই নেই তার জীবনে। শুধুই শাস্তি। সার্বজনিক কর্মপ্রবাহে উল্টো স্রোতে চলেছে তার জীবন। এখন প্রাণ বাঁচানোই দায়।

রামনগরের আশে পাশে সবই চেনে যমুনাপ্রসাদ সিংহকে। স্থানীয় ভূমিহারদের দলনেতা। মুখে পান আর পকেটে পিস্তল নিয়ে তার যাতায়াত। দাপটে সবাই কাপড়ে পেচ্ছাপ করে। তাইতো কর্তৃপক্ষ তাকে পিয়ারো করে রেখেছিল। ভূমিহারের রাজত্বে

বসবাস করতে হলে ভূমিহারকেই আত্মীয় করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সে নিজের ক্ষমতায় যেমন ছিল উদ্ধত, তেমনি কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ঢাকতেও ছিল উদগ্রীব। একজন আদর্শ জনসংযোগের লোক। মানুষের মন জয় করা অপেক্ষা বাহুবলকে দিত মর্যাদা। বেশ ভালই সময় চলে যাচ্ছিল যমুনা প্রসাদের। হিরো হণ্ডায় কারখানায় এসে এক চক্কর মেরে চলে যেতো গ্রামে। সেখানে জমিচাষের তদ্বির, মুদিখানার তত্ত্বাবধান, স্থানীয় স্কুলমাস্টারের সঙ্গে পরবর্তী নির্বাচনের কৌশল ইত্যাদি আলোচনা করে সারাটা দিন কেটে যেত। জি এম খুব একটা খোঁজ নিতেন না। কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণ।

একই ছাদের নীচে সিংহ আর তার শিকার থাকতে পারে কি? যাদবরা ভূমিহারের চিরদিনের অবজ্ঞার পাত্র। তারা অন্ত্যজ। অবহেলিত যাদবরাই বা ছাড়বে কেন? সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল শ্যামসুন্দর যাদব। তারপর একদিন মওকা মিললো। তেঘরা চেতাবনীতে বেশ বড়ো করে প্রকাশিত হলো পিয়ারো মিস্টার সিংহের সারাদিনের কর্মধারা। অফিসে হাজিরা দিয়ে সে কোথায় যায়, কি করে বেড়ায় তার ধারাবাহিক নির্ঘণ্ট। জাত পাতের লড়াই নিয়ে অফিসের সময় নষ্ট করেন না জি এম নির্মলকুমার। স্থানীয় পত্রিকায় কেচ্ছা প্রকাশের পর তাঁর হাতে মোক্ষম অস্ত্র এসে গেল। রামনগরের বাসিন্দারা খইনির সঙ্গে চুটকি খায় ভাল। অফিসারের কেচ্ছা তাদের আলোচনার অলঙ্কার। চায়ের আসরে কেচ্ছা লেড়ে-বিস্কুটের মতো মচ্‌মচে। নির্মলকুমার অনেক সিনিয়ারকে ল্যাং্ মেরে হয়েছেন জেনারেল ম্যানেজার। সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে উঠে দার্শনিক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ও সব গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী, সাগর, মহাসাগর তাঁর কাছে গোষ্পদ-তুল্য। ওরকম বেয়ারা পিয়ারোকে কি করে টিট্ করতে হয় সে ফর্মুলা তাঁর জানা আছে। শুধু একটি এস টি ডি কল। কর্পোরেট অফিস কানপেতেই ছিল। বেচারার ওজর আপত্তি কেউ শুনলো না। দিল্লীতে তাকে যেতেই হলো। ইংরেজি নিয়ে তার একটু সমস্যা আছে। তাতে কি?

রামনগর হিন্দী রাজত্ব। বেশ ভালই ছিল যমুনাপ্রসাদ। খাঁ

দাও আর রামগিরি গাও। বজরঙ্গবালীর কীর্তন করলেই সব সমস্যার সমাধান। হিন্দু-হিন্দী-হিন্দুস্তান কোনো রাজনৈতিক দলের স্লোগান হতে পারে। তাই বলে একটি আন্তর্জাতিক ভাষাকে অবজ্ঞা করলে চলবে কেন? এখনো দেশের অর্ধেক লোক এই ভাষাতেই একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ভাব বিনিময় করে। সমাজতন্ত্রের তীর্থক্ষেত্র রাশিয়া চীনেও বর্তমানে এই ভাষা শেখার আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে এদেশে চলেছে ইংরেজি হঠাও-এর জোয়ার। এই আন্দোলন অবশ্যই যমুনা প্রসাদের এক অমোঘ অস্ত্র হবে। তরী ডোবার ভয় নেই। তেঘরা চেতাবনীর প্রকাশিত কেচ্ছাকে কেন্দ্র করে নির্মলকুমারের রিপোর্ট এবং এ এস এমের বদলী নীতি যেন এক বিন্দুতে মিশে গেল। তাকে দিল্লীতে বসানোর অজুহাতে বিপুলকে কোলকাতায় পাঠানোর সম্ভাবনা হলো উজ্বল। বিপুলকে পাঠানো হল বিকিরণ সাহেবের অধীনে। অভিনন্দন সাহেব আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে গোটা ব্যবস্থাই সাময়িক। ভার্মা সাহেবের ফাঁড়া কাটানোর জন্য ঝাউতলার রক্ষাকবচ পরানো হলো ওকে। শ্রীমান অশোকের জন্য রামনগর। রামনগরে বনবাস। সে সদ্য সমাপ্ত টি ভি সিরিয়াল রামায়ণ শ্রদ্ধাসহকারে দেখেছে। স্বয়ং রামচন্দ্র যদি পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য সোনার রাজত্ব ত্যাগ করতে পারে তবে তারই বা আপত্তি কিসের?

পিতৃ আজ্ঞা পালন পুত্রের একমাত্র কর্তব্য। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের মাননীয় পিতাশ্রী হলেন স্বয়ং সি এম ডি। তাঁর আদেশ পালন করার অর্থ ধর্মে বিশ্বাস। প্রতিটি কর্মচারী তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সুখ পায়। পিতা যদি অবুঝও হয় তবুও তিনি জন্মদাতা। তিনি যদি পাগলও হন তবুও তিনি অন্নদাতা। পিতার অবদান কতো গভীর সে কথা অশোক জানে। যে সব প্রাণী পরিশ্রমের বিনিময়ে অন্ন সংস্থান করে এবং সেই অন্নের যিনি মালিক তিনি অবশ্যই চাকুরেলোকের পিতৃতুল্য! শুধু তার কেন? প্রতিটি ওয়ার্কারের অন্নদাতা তিনি। তাই তিনি পিতৃস্বরূপ। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের কোনো উৎপাদন ক্ষমতা নেই। তবুও তিনি সরকারের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেও পরিবারের মুখে

অন্নের যোগান দিচ্ছেন। সত্যিই তিনি পিতৃসদৃশ্য। পিতা হি পরমন্তপঃ!

হিন্দী আধিকারিক হনুমান প্রসাদ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বরণ করে নিল অশোককে। সে জানে আজ থেকে মিস্টার মিট্রাই তার বস্। বস্‌কে বশ করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। যাদব কি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছে। সারাদিনটা তার আয়ত্বে। সে সহাস্যবদনে উপস্থিত হল বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানের ঘরে। তারপব পরিচয়েব পর্ব এবং খুশখবরি বিনিময়। আধা হিন্দী এবং আকারে ইঙ্গিতে সকালটা ম্যানেজ হল। দুটোয় পান্হনিবাসে লান্চ। সেখানেও চললো হনুমানেব লম্ফঝম্ফ। ডিপার্টমেণ্টেব সব কাহিনী আজই শেষ করতে হবে। শ্যামসুন্দরকে কোনো সুযোগই দেবে না মুখ খোলার।

আজ্কেব ভূমিকাপর্বই হবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। যে আছে বর্তমানে, যে ছিল অতীতে আর কি হতে পারে ভবিষ্যতে তার পূর্ণ বিবরণে সে তৎপর। প্রসঙ্গক্রমে যমুনাপ্রসাদের কথাও এসে গেল। ঐ যে আছে এক ডার্করুম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। ও হলো চলে যাওয়া পিয়ারোর লোক। লখীসারাইয়ে বাড়ী। চামার সম্প্রদায়ের লোক। ছিল যমুনাজীর বাড়ীর চাকর। ওকেও পঁচিশ হাজার টাকা সেলামী দিয়ে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার নিতে হয়েছে। অর্ধেক নগদ আর বাকীটা দুবছরের কিস্তিতে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মাইনের দিন যমুনাজী যেন এক কাবুলিওয়ালা।

লান্চ টেবিলে অশোক দু একটা ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করায় পাশের টেবিলের খানেওয়ালারা হনুমানকে দাঁত ভ্যাংচালো। তুমি হলে রামনগরের হিন্দী অফিসার। তোমার পক্ষে ইংরেজি শব্দ শোনাও পাপ। তুমি আজ বস্‌কে খুশী রাখার জন্য বিদেশী ভাষায় সায় দিচ্ছ। এ কেমন ব্যাপার? দিল্লীর হিন্দী নিয়োগ সমিতিতে নালিশ হয়ে যাবে। খুব সাবধান। হনুমান প্রসাদ ওদের ভ্রূকুটিকে ততটা আমল দিল না। লান্চ শেষে উভয়ে প্রত্যাবর্তন করলো কারখানায়।

* * *

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় নন্দন রামনগর। প্রায় পনের শ'

একর জমি নিয়ে বিরাট এক কারখানা। চারদিকে জেলখানার মতো সুউচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর। দশফুট উঁচু দেওয়ালে ঘেরা কারখানার সীমানা। প্রধান ফটকে শ্যেনচক্ষু নিয়ে বসে আছে সিকিউরিটির লোক। প্রধান ফটকের দুশ মিটার দূরে রাজপথের ধারে ছোট্ট দুটি ঘর। জনসংযোগ তথা হিন্দীভাষা প্রচারের কারখানা। মূল কর্মশালা থেকে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন করে রেখেছেন জনসংযোগ নামক বিষফোঁড়াকে। এই ব্যবস্থায় কারখানার টেক্নোক্র্যাটদের দিবানিদ্রার সুবিধা হয়। যখন তখন স্থানীয় লোকের উৎপাতের ভয় থাকে না। পিয়ারোর কাজ হল ঠগ, চোর, জুচ্চোর বাছাই করে গেট থেকে বিদায় করে দেওয়া। তবুও যেসব উটকো পত্রকার এক কাপ চা খেয়ে গলা ভেজাতে আসে তাদেরও অনেক সুবিধা। এখানে কোনো টেলিফোন নেই। পি অ্যাণ্ড টি ফোন রাখার ক্ষমতা আছে বিভাগীয় প্রধানের। সেজন্য রয়েছে ব্রজবাসী দাস। সংযোগ ব্যবস্থার আধুনিক হাতিয়ার পিয়ারোকে দেওয়া হয়নি সেই যন্ত্রটি। বাজে খরচ বাঁচানোই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

হনুমান প্রসাদ অশোককে কারখানার সেই আউট হাউজে নিয়ে এলো। তার বসার ঘর, চেয়ার, টেবিল সব নিজে হাতে ডাস্টিং করে গুরুভক্তির নিদর্শন দেখালো। আগামীকাল কর্পোরেট অফিস থেকে এক ভি আই পি টীম আসবে রামনগর দর্শনে। তাই সবাই ব্যস্ত। এপিয়ারো চলে গেছে স্থানীয় সব এক নম্বরকে নিমন্ত্রণ করতে। অভিনন্দন সাহেব সর্বপ্রথম এই কারখানা পরিদর্শনে এসে সবার সাথে মোলাকাৎ করতে চান। সেজন্য চাই কক্টেল পার্টি। চাই বিদেশী গঙ্গাজল, মানে স্কচ্ হুইস্কি। কেরালার কাজুবাদাম আর সামিয়ানা হোটেলের শিক্ কাবাব অবশ্যই প্রয়োজন চাট হিসেবে। এপিয়াকো ব্যস্ত থাকতেই হয়। অশোক সদ্য যোগদান করেছে কাছে। তাই ওর ওপর নেই কোনো দায়িত্ব। শুধু কর্পোরেট কর্তাদের সামনে উপস্থিত থাকাই কাজ। হনুমানজী সারাদিন ওকে সঙ্গ দিল। মাঝখানে অবশ্য ব্রজবাসীর পি এ রামলছমন সিংহ ইণ্টারকামে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল। সব ঠিক হ্যায় তো মিত্রাসাব? সায়েব জানতে চাইছেন কোনো অসুবিধা আছে কিনা?

অশোকের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে হনুমান প্রসাদ বুঝে নিয়েছে তার বসের হিন্দীভাষার অজ্ঞতার কথা। মনে মনে ছক কষে নিয়েছে এবার কি কৌশলে সব কাগজপত্র সই করিয়ে নেবে। বিকেল চারটে নাগাদ অশোকের পি এ মহাবীর প্রসাদ এসে কানে কানে বলে গেল। স্যার, কোনো পেপারে চট করে সই করবেন না। জনসংযোগ বিভাগের সব নোটশীট, চিঠিপত্র, ব্যয়সংক্রান্ত প্রস্তাব হবে হিন্দীতে। খুব সাবধান! একবার যদি আপনার সই পেয়ে যায় তবে কেল্লা ফতে। সব দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে।

কথা শেষের আগেই হনুমানজী এসে হাজির। প্লীজ সাইন হিয়ার। হিন্দী মে লিখিয়ে। হিন্দী অফিসার প্রথম দিন থেকেই তার প্রাধান্য দেখাতে চায়। যমুনা প্রসাদকে এরা তাড়িয়েছে। অশোক অতিশয় গোবেচারী। একে আয়ত্ব করা কোনো সমস্যাই নয়। সে হনুমানজীর অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিল, আই ডোণ্ট নো। একথা স্বয়ং সি এম ডি জানেন। জেনারেল ম্যানেজারও অবগত আছেন। হাউ ক্যানাই সাইন ইন হিন্দী হোয়েন ইট ইজ নট কমপালসারি ফর মী।

তৎক্ষণাৎ এক সার্কুলার খুলে ধরে হনুমানজী। দেখিয়ে ইধার মে সব লিখা হ্যায়। এবং এমনি ভাবে তার প্রথম হিন্দীপাঠ শুরু হয় নতুন পিয়ারোকে পথে আনতে। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতে চায় রামনগরে চাকরী করতে হলে সব যোগাযোগ করতে হবে রাষ্ট্রভাষায়। এটা বাধ্যতামূলক। তার কথা শুনলে পুরস্কার পেতে পারে পিয়ারো। অন্যথায় তিরস্কার হবে নিত্যসঙ্গী। প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিল এহলো বিহার এবং হিন্দীর রাজত্ব। সেই রাজত্বে বসবাস করতে হলে সেখানকার শর্তাবলী সসম্মানে মেনে নেওয়াই কর্তব্য। অশোকের অজ্ঞাতাকেও একেবারে উড়িয়ে দিল না। সে একজন হিন্দী প্রেমী বিশ্বস্ত অফিসার। নিজের দায়িত্বকে এড়াতে চায়না।

বস্‌কে তুষ্ট করার জন্য বললো, নো প্রব্লেম, আগামীকাল হিন্দীতে সই করাটা শিখিয়ে দেবো। এটা আমার কাজ। এখানে যত

বঙ্গালীবাবু আসে আমিই তাদের হাতে খরি দিই। এই দেখুন না আমাদের বস্ ব্রজবাসী সাহেবের সই। কেমন জ্বল জ্বল করছে তার হিন্দী হস্তাক্ষর।

জটায়ু গেস্ট হাউজে সাজ সাজ রব শুরু হয়েছে। সেখানে থাকবেন কর্পোরেট অফিসের রুই কাতলার দল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কোনো ত্রুটি থাকলে চলবে না। স্বয়ং ব্রজবাসী দাস ঘুম থেকে উঠে একখানা ডোরাকাটা লুঙ্গি কোমরে গুঁজে সেখানে উপস্থিত। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে দিল্লীর বাদশারা প্রথম পদার্পণ করবেন। কোনো খুঁত থাকলে মাথা কাটা যাবে। পান থেকে চুণ খসলে একেবারে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। এ তো শুধু সি এম ডির ভিজিট নয়, তাঁর সঙ্গে থাকবে আধডজন কর্তাভজা। সেইসব স্তাবকের দল তাঁকে আগলে থাকবে। ক্রমাগত রিলে চলবে হুইস্পারিং। রাজা থেকে উজিরের দাপট সর্বকালে স্বীকৃত। তাই এই সফরে শুধু অভিনন্দন বন্দনা নয়, করতে হবে সবাইকে আপ্যায়ন। মনোরঞ্জন।

পাটলীপুত্র বিমান বন্দরে কোম্পানীর সেরা গাড়ীগুলো চলে গেছে। ড্রাইভার ইয়াকুব, সিয়ারাম আর বিল্লীপরসাদ। সাহেবরা পালাম থেকে আসবেন হাওয়ায় ভেসে। বিহারের রাজধানীতে এসে কষ্ট পাবেন তা সহ্য হবে না ব্রজবাসীর। সম্রাট অশোকের ঐতিহ্যবাহী দেশ। নালান্দার শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে কতো বিদেশী পর্যটক এদেশ ভ্রমণ করেছেন। শিক্ষিত হয়েছেন। লিখে গেছেন কতো ইতিহাস। সেই ঐতিহ্যের পরম্পরা যেন বজায় থাকে। পাটলীপুত্রে সাহেবরা যেন এতটুকু কষ্ট না পান সে বিষয়ে সক্রিয় সতর্কতা। এম পিএ বার বার বলে দিয়েছে। দেখো ড্রাইভার লোগ, কোই তক্‌লিপ না হোনে চাহিয়ে। এ একদম নয়া সি এম ডি হ্যায়। বহুত খত্‌রা আদমী। সমঝকে গাড়ী চালানা। সম্‌ঝে?

বিল্লীপরসাদ তো হেসেই গড়াগড়ি ব্রজবাসীর কথা শুনে। কথা তো নয়। যেন উপদেশামৃত! আরে বাবা, এই কারখানায় কতো ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মান এনজিনীয়ার এসেছে। তাদের প্রত্যেককে প্রথম সেলাম জানিয়েছে তারা। এতে এবার নতুনত্ব কিসের?

বিদেশী অতিথির বেলায় কোনো ত্রুটি হয়নি। এতো খাস ইম্‌লিভক্ত দিশী সাহেব। বর এবং বরযাত্রী সবাই সমান মর্যাদা পাবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করে ত্রিমাস্কেটিয়ার্স রওনা দিয়েছে পাটলীপুত্রের পথে।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের ড্রাইভারগুলো একদল জ্যোতিষী। ওরা একস্‌পার্ট থট-রীডার। গণৎকার যেমন হস্তরেখা দেখে বলে দিতে পারে ভূত ভবিষ্যৎ। এই ড্রাইভারগুলোও সাহেবদের মুখ দেখেই আঁচ করতে পারে মুড কেমন আছে। স্টিয়ারিংএ হাত রেখে আয়নায় দেখে নেয় সাহেব ঘুমোচ্ছেন, না ঝিমোচ্ছেন। রেগে আছেন, না রসস্থ আছেন সেখবর তারা প্রথমে প্রচার করে। ব্রজবাসী তাই ওদের নানাভাবে ব্রীফ করে দিয়েছে। বধূবরণের প্রথম দায়িত্ব তাদের ওপর।

জটায়ুর চেহারা পূর্ণ যুবতীর ভরা যৌবনে উচ্ছল। সিঁড়িতে ফুলের টব। কার্পেটে হুভার চালানো হচ্ছে বারে বারে। চেয়ারম্যানের শয়নকক্ষে অস্থায়ী এস টি ডি ফোন। এক রাতের বসবাস। তবুও যদি দরকার হয় মিনিস্ট্রিতে কথা বলার। প্রতিটি কারখানা পরিদর্শনের রিপোর্ট মন্ত্রীকে জানিয়ে রাখা তাঁর কর্তব্য। সবকিছু ভেবেই রাখা আছে নিশ্চিদ্র ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়। সন্ধ্যায় এসেই তিনি দেবেন এক কক্‌টেল পার্টি। সেজন্য চাই সেরা স্কচ্‌। জনি ওয়াকার অথবা ভ্যাট ৬৯ হলেই চলবে। ভুলেও যেন দিশী মাল টেবিলে না ওঠে। সেদিকে ব্রজবাসীর সতর্ক দৃষ্টি। চাই চানাচুর, কেশুনাট। বাজারের সেরা খাবারের খবর তাকে রাখতেই হয়। পয়সা কোনো সমস্যা নয়। সাহেব যেন বিগড়ে না যান। স্থানীয় সব বিগ্‌ বস্‌রা আসবেন প্রতিবেশী ইণ্ডাস্ট্রি থেকে। বছরে মাত্র দুশ কোটি টাকা লোকসান করতে পারে এই প্রতিষ্ঠান। তবুও ইমেজ বলে একটা কথা আছে। মরা হাতিও লাখটাকা।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা করার উদ্দেশ্য সরকারের হাত শক্ত করা। ভাবমূর্তি উজ্বল রাখতেই কতো খরচ। স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পয়লা নম্বরেরা ভালোভাবেই জানেন এ

কোম্পানীর মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে গেছে। তবুও পরশীর কর্তব্য করতেই। বিপদের ক্ষণেই তো পরশীর সহযোগিতা প্রার্থনীয়। তাঁরা জানেন এই বৃহৎ শ্বেত হস্তীর লোকবল প্রবল। বিপদে আপদে এরাই পাশে দাঁড়াবে। সন্ধ্যায় কক্‌টেল পার্টি। সেখানে থাকবেন কালেক্টার সাহেব, পুলিশের প্রধান এবং স্থানীয় জন-প্রতিনিধি। এম পি মশাই। ডিনারের টেবিলে পরিচয় হবে সবার সঙ্গে। সারা টাউনশীপে যেন উৎসবের উত্তেজনা। গ্রামে যেন জামাতার আগমন হয়েছে। ব্রজবাসী তার ক্ষীণপোষাকেই সব কিছু তদ্বির করছে। তার চাকরীটা নতুন। জি এম নির্মলকুমারের সঙ্গে খুব ভাব। কিন্তু তিনিও বুঝে গেছেন, মালটি ফাঁপা। একটি মাকাল। একটানা কাজ করছে বটে তবে কর্মফার্মড হয়নি এখনো। চাকরীটা এখনো একদিনের নোটিশে ঝুলছে। অভিনন্দন সাহেবকে যদি এবার সেবায় সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে মুস্কিল আসান হতে পারে। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হতে পারেন হয়তো।

সন্ধ্যায় ভি আই পি কনভয় পেঁছল রামনগর টাউনশীপে। প্রধান ফটক থেকে সিকিউরিটির লোক ইণ্টারকামে ঘোষণা করলো সেই আগমন বার্তা। সঙ্গে সঙ্গে জটায়ুতে উত্তেজনার ঢেউ। বিয়ে বাড়ীতে বর আগমনের হৈ হৈ রব। জেনারেল ম্যানেজার নির্মল কুমার তাঁর বারজন চীফকে নিয়ে সারিবন্ধভাবে দণ্ডায়মান। সিকিউরিটির একটি দল শিঙা বাজিয়ে মুখরিত করে তুলল সারা পাড়া। চীপ ইলেকট্রিক্যাল এনজিনীয়ার জটায়ুর গেটে বন্দোবস্ত করেছে চারখানা সোডিয়াম ভেপার আলোর। সেই উজ্জ্বল আলোতে মনে হচ্ছে যেন জ্যোৎস্নামাখা সন্ধ্যা অতিথি বরণের জন্য প্রস্তুত। লাউঞ্জে ইতিমধ্যেই বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং প্রতিবেশী শিল্পের জেনারেল ম্যানেজারগণ অপেক্ষা করছেন। সবাই নিমন্ত্রিত। কখন হোস্ট মিস্টার অভিনন্দন সদাশিবম্‌ মহালিঙ্গম্‌ সশরীরের উপস্থিত হবেন তার জন্য প্রতীক্ষারত। তিনি আসবেন। হাসি বিনিময় করবেন। এবং করমর্দন অন্তে পানীয়ের গেলাসে ঠোঁট লাগাবেন। সেজন্য শবরীর প্রতীক্ষা। আসলে শীতের সন্ধ্যায় চুমুকে চমক লাগবে তবেই রাত হবে পূর্ণ যুবতী। নির্মলকুমার অতি বিনয়ের সুরে সবাইকে অনুরোধ জানালেন।

প্লিজ, ওয়েট ফর অ্যানাদার ফাইভ মিনিটস্। অভিনন্দন সাহেব একটু ওয়াশ করে আসছেন।

ব্রিটিশ কায়দায়, সময়ের সূক্ষ্মতা বজায় রেখে, সি এম ডি মঞ্চে হলেন উপস্থিত। মঞ্চে যেন নায়কের আবির্ভাব হল। সমবেত সবাই জানালেন স্ট্যান্ডিং ওভেশন। সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় স্বাগত জানালেন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালককে। উপস্থিত অতিথিবৃন্দের কথায় কোনো বিদ্রূপ ছিল কি? ব্যঙ্গ অথবা বিদ্রূপ প্রকাশিত না হলেও ইঙ্গিতে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন, একেই বলে গৌরী সেনের টাকা। কারখানায় উৎপাদন নেই এক ছটাক। কোম্পানীতে লালবাতি জ্বললো বলে। অথচ ঠাঁট দেখ। মনে হচ্ছে যেন বাকিংহ্যাম প্যালেসের গার্ডেন পার্টি। রাণীর রাজস্ব অফুরন্ত। সরকারের অর্থই বা কম কি? সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের বিগ্ বস্‌রা জানেন, যতদিন থাকবে অশোকস্তম্ভ ততদিন রাখা যাবে এই সব দম্ভ। অভিনন্দন সাহেব রাজা ক্যানিউটের কায়দায় সমবেত অতিথিদের আসন গ্রহণের ইশারা করলেন। ইতিহাসের কোনো চরিত্র চর্চা না করে বরং বলা যেতে পারে আধুনিক কোনো গুরু যেন সভায় প্রবেশ করলেন অগণিত ভক্তের সমাবেশে। ভক্তরা পরম প্রতীক্ষার পর গুরুর দাক্ষিণ্য লাভে হল ধন্য। গুরুজী তাঁর ভাব গম্ভীর স্টাইলে করতল প্রদর্শনে সবাইকে তথাস্তু জানালেন্। এবার জার্মান রীতিতে কারণ সমুদ্রে অবগাহন। এক বাকসো ভর্তি স্কচ্, মানে ছ বোতল হুইস্কি, এক ডজন জিন এবং দু ক্রেটভর্তি বীয়ার এই উৎসবের উপকরণ। তৎসহ কাজু-চানাচুরের চর্বন এবং শিক কাবাবের সদ্ব্যবহার তো আছেই। আর্দালী ইয়াসিনের শূন্য গ্লাস পূর্ণ করার ব্যস্ততা লক্ষ্য করার কেউ নেই।

সুজয় ঘোষ আছেন এই আসরে। পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় তাকে নিয়ে এসেছেন নতুন সি এম ডি। টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার তার পদবী। এবং পরিচালকে পরামর্শদান তার চাকরীর শর্ত। ওকে বস্ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সুদূর তাম্বরম থেকে বৃন্দাবন প্লেসে আনা হয়েছে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ফর্মুলায়। বয়সে নবীন, দর্শনে নায়ক সুলভ চাকচিক্য নিয়ে সে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

আর ততোধিক গ্ল্যামার বিগ্ বসের কাছের মানুষ হিসেবে। সি এম ডি এসেই বুঝিয়ে দিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানে কেউ বিশ্বাসযোগ্য নয়। দীর্ঘ দিনের মৌরসীপাট্টায় সবাই আখের গোছাতে তৎপর। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের বিসর্জনের দিন সমাগত প্রায়। এই ঠগের রাজত্বে অন্ততঃ একজন অনুগত লোক চাই যাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। বেছে বেছে তাই এই বঙ্গ সন্তানকে করা হয়েছে নির্বাচন।

বস্ জানেন এই প্রতিষ্ঠানের দু-দুটো কারখানা পশ্চিমবঙ্গে। তাছাড়া পানীটোলাতে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন বঙ্গজের দল। তাদের মনের কথা জানতে হলে, তাদের কর্মপদ্ধতি বোঝার জন্য প্রয়োজন একজন দোভাষীর। সুজয় ঘোষ এ ব্যাপারে আদর্শ নির্বাচন। প্রতিটি সফরে ও যাবে অভিনন্দন সাহেবের সঙ্গে। সেখানে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যাবে স্থানীয় অফিসারদের মধ্যে। এবং তারপর সফর শেষে বস্‌কে ব্রীফ করবে সবিস্তারে। বাঙালীবাবুরা ভাববে ঘোষ তাদেরই লোক। অপরদিকে সি এম ডির উদ্দেশ্য হবে সাধিত। বৃন্দাবন প্লেসের চক্র সবার জানা। মন্ত্রী মশাই বলেছেন দুষ্টচক্র। সেই চক্রকে কোনো ভরসা নেই। যে কোনো সময়ে ডুবিয়ে দিতে পারে সি এম ডি কে। উঁচুতলার শাসনকর্তা হতে হলে একজন কূটনীতিকও হতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে ছক মেপে চলেন। সুজয়কে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে। জি এম পি মিস্টার ভাণ্ডারী এক্ষেত্রে খুবই সতর্ক। ভদ্রলোক মাল টানেন পর্যাপ্ত। আবার মিস্টার ঘোষের গ্লাস খালি হলো কিনা সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি।

ইয়াসিন, আরে ইয়াসিন। তুম্ ক্যা বেকুব হ্যায় ? ঘোষ সাব্‌কো গিলাস খালি। ডালো, ডালো, আউর ডালো। অ্যানাদার ওয়ান ইন দ্য নেম্ অফ সি এম ডি। ভাণ্ডারী সাহেব নির্দেশ দিয়ে যান ইয়াসিনকে। ওদিকে ব্রজবাসী মাল টানা অপেক্ষা কাজুবাদামের প্লেটটাকে মূল্যবান ভাবছে। একেবারে কোলে নিয়ে বসেছে প্লেটটা। ব্যাটা গ্রামের মানুষ। কুয়োর ব্যাঙ্ সাগরে পড়েছে। বিনি পয়সার এমন পার্টি বছরে ক'বারই বা হয় ? কাজু

অনেক দামী জিনিস। ওগুলো সাবার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ব্রজবাসীর দিকে নজর পড়েছে অভিনন্দন সাহেবের।

আরে, মিস্টার দাস। হোয়াট আর ইউ ডুইং? পাস ইট অন টু সামওয়ান এলস্। বসের সব খেয়াল আছে ভাণ্ডারী সাহেব মন্তব্য করলেন বিগ্‌বসের কথা শুনে। তাঁর তখন চলছে ফিফ্‌থ রাউণ্ড। সাহেব তখন মুডে এসে গেছেন। মুখে ফুটছে কথার খৈ। কি করে সেক্রেটারীকে কাবু করতে হয় তার নানা কৌশল বলে যাচ্ছেন। তবে লেডি সেক্রেটারী, না ব্যুরোক্র্যাট সেক্রেটারী তা বলেন নি। কোন্ কৌশলে লোকসানী সংস্থাকে লাভের সংস্থা হিসেবে দেখাতে হয় তা বলে যাচ্ছেন মুখস্ত করা পড়ার মতো। ইনভেনট্রি কণ্ট্রোলের কারসাজি কি? আরে, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অপেক্ষা জনসাধারণকে ধাপ্পা দেবার কেরামতি দেখানোই হল একজিকিউটিভের প্রধান কাজ।

রামনগরে মেটিরিয়ালস্ ডিপার্টমেণ্টের হিসেব রাখার দায়িত্বে আছে পঞ্চানন নন্দী। ইনভেনট্রির প্রসঙ্গ আসাতে নির্মলকুমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এম এমকে।

স্যর, প্লীজ মীট আওয়ার মেটিরিয়ালস্ ম্যানেজার মিস্টার নন্দী। স্যর, এই হলো আমাদের নয়া এম এম। রামনগরে মাস কয়েক হল যোগদান করেছে। ইতিপূর্বে তেইশটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে। অবশেষে বিপদভঞ্জন করতে আগমন এই কারখানায়। পঞ্চাননবাবু ছিল জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে। অর্থাৎ নেভী, আর্মিতে হাত পাকিয়ে শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আকাশে উড়েছিল। শুনেছি পাইলটও হয়েছিল কয়েকমাসের জন্য। আধুনিক কমপিউটার ক্যাড, ক্যাম ওর জানা। ইনভেনট্রি কণ্টোলে ওর দারুণ দক্ষতা। সম্প্রতি ভাণ্ডারী-সাহেব একে অ্যাপয়েণ্ট করেছেন। কোলকাতার কার্ল মার্কস্ স্কোয়ারে বসার যোগ্য লোক। ভার্মাসাহেবের ইচ্ছে রামনগরকে একটু লাইনে নিয়ে আসার। তাই পঞ্চাননের প্রবেশ এই কারখানায়। ভাণ্ডারী সাহেবের দুটি শ্রেষ্ঠ রিক্রুটের দুজনই স্যর আমাদের ভাগে

পড়েছে। স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার পরিধান করেছেন নদীয়াবাসীর নামাবলী। সেক্ষেত্রে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অভিনন্দন সাহেব ওঁর সংলাপে বিরতি আনতে বল্লেন, হু আর দোস বাগার্স? ভান্ডারী একটা অপদার্থ। তার আবার সিলেকশন! সি এম ডি মহাদেবের তৃতীয় নয়নে দেখতে পেলেন সেই দুই কীর্তিমান পুরুষকে।

ব্রজবাসী আর পঞ্চানন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ সৃষ্টি। ক্রিয়েশন অফ গ্রেট ভান্ডারী। হ্যা, ভান্ডারীর নামেই বারোটি ভিজিলেন্স কেস নথিভুক্ত করা হয়েছে মাত্র ছ মাসের সময় সীমায়। তিনি জানেন, ভিজিলেন্সে যারা চাকরী করে তারাও মানুষ। আছে তাদের কামনা, বাসনা, লোভ এবং লালসা। শুধু মাস মাইনেতে কে আর বড়লোক হয়? তাই ওদের ব্যাপারে তাঁর কোনো বিকার নেই। তাঁর দুর্বলতা শুধু বঙ্গললনার ওপর। তাই ছুঁতোনাতায় কোলকাতায় ট্যুর রাখা চাইই। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে গমন করেছেন সেই পথই তাঁর লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে প্রথমেই তিনি মজুমদার সাহেবের লীলামাহাত্ম পাঠ করেছেন। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান হল সুখের জায়গা। এখানে শুধু মন্ত্রীর ভজনা কর আর আরামে ডুবে থাক। টাকা দেবে সরকার। সরকার সেই অর্থ আদায় করবে করদাতার পকেট কেটে। সেদিক থেকে প্রতিটি দেশবাসীই এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। শেয়ার হোল্ডার। সেই সূত্রে ভান্ডারী সাহেবও একজন শেয়ার হোল্ডার। নিজের টাকা নিজে খরচ করায় দোষ কোথায়?

মজুমদার সাহেব কর্পোরেট অফিস কোলকাতায় স্থানান্তরিত করেন নি। সেখানকার অফিসে বসা আর সেখানে সফর করা সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা। উইক এন্ডের ট্যুর তাঁকে অনেক আনন্দ দিত। প্রেরণা যোগাতে। মজুমদার সাহেব মাসে চারবার ট্যুর করতেন এই মহানগরীতে। কেন আসতেন সে ইতিহাস ভান্ডারী সাহেবের জানা আছে। সেখানে আছে প্রবীর বোস। দ্য গ্রেট পিয়ারো অফ আ গ্র্যান্ড সিটি। তার জনসংযোগের সংজ্ঞাই আলাদা। তার অভিধানে জনসংযোগের প্রথম কাজ হলো ওপরওয়ালার মনস্তুষ্টি।

বড় কর্তাদের আমোদে আহ্লাদে সে বড় তৃপ্তি বোধ করে। কষ্ট করে হাঁস আর ডিম খায় দারোগাবাবু। তার পরিশ্রমে যদি বড় সাহেব আনন্দ পান তবে তাই বা মন্দ কি? ভান্ডারী সাহেবের শুধু নারী আসক্তিই প্রবল নয়। নিজের মেয়ের বিয়ের নাম করে তোলা তুলেছেন বিধাননগর আর পানীটোলা কারখানা থেকে।

ঝাউতলার শেয়ার তিনি পুষিয়ে নিয়েছেন প্রবীরের ব্যবস্থাপনায়। জি এম পির চেয়ারে দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার সেলামী অতি সাধারণ ব্যাপার। কারখানার পার্সোন্যাল ম্যানেজারগুলো বস্‌কে খুশী করতে ব্যস্ত। দিল্লীর বাদশা খুশী থাকলে ওয়ার্কার নিয়োগ করে ও টাকা উঠে আসবে অতি অল্প সময়ে। গিভ্ অ্যাণ্ড টেক পলিসি আজকাল পাগলেও বোঝে। অভিনন্দন সাহেব ভাবছেন পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে। সেই লোভী ভাণ্ডারীর আবিষ্কার এই পঞ্চানন। আবিষ্কার না শিকার তা বলা মুস্কিল।

তিনি ইশারায় সুজয়কে কাছে ডাকলেন এবং বল্লেন, প্লীজ টেক আ নোট অফ ইট। সে সাহেবের হা দেখেই বুঝে নিয়েছে কি নোট করতে হবে। বস্‌-এর জবাইয়ের তালিকায় আর একটি বলি জুটলো।

নির্মলকুমার পরিচয় করিয়ে দেবার পর পঞ্চানন গদগদ। অভিনন্দন সাহেবের পদলেহনের ভাষা খুঁজে পায় না।

স্যর, ইউ আর গ্রেট! দূরদর্শনে আপনার ফেস্ দেখেই বুঝেছিলাম আপনিই একমাত্র কর্ণধার হতে পারবেন। এই ডুবন্ত জাহাজের প্রকৃত ত্রাণকর্তা। ইউ আর গোয়িং টু ব্রিং ফেম টু দিস কম্পানী। তার কথা যেন শেষ হতে চায় না।

অভিনন্দন সাহেব অনেক প্রতিষ্ঠানকে ঝাঁঝরা করে এসেছেন এই সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে। যে প্রতিষ্ঠানের কোনো উৎপাদন ক্ষমতা নেই, তার নেই কোনো ভাবী সম্ভাবনা। শুধু ভর্তুকী গ্রহণ করে এবং ভাওতা দিয়ে কতদিন চলবে এই প্রতিষ্ঠান? তিনি এ সত্য ভালভাবেই অবগত আছেন। শুধু তিনি কেন? এই আয়ব্যয়ের হিসেব যে কোনো স্কুলের ছেলেও জানে। লাভ ক্ষতির অঙ্কটা শৈশবেই শেখানো হয়। মিনিস্টার পাঠিয়েছেন তাঁকে। তাঁর

প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতেই হবে। সামনেই নির্বাচন। চাই পার্টি ফাণ্ডে প্রচুর টাকা। আর সেই টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে এই সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা। কোনো একটা প্রকল্পের নামে মোটা টাকা ছাড়ো। আবার তার ফয়দা তুলে নাও। পদ্ধতিটা প্রাচীন হলেও কার্যকরী। খুবই ফলপ্রসূ। এতে ক্ষতিই বা কি ?

সরকার হলো অফ দ্য পিপল্, ফর দ্য পিপল্, বাই দ্য পিপল্। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার জনগণের অর্থ ব্যয় করবে এতে দোষের কিছুই নেই। তাদের টাকা খরচ করে তারা নিজেদের মনোমত নেতা নির্বাচন করছে। অতি সাধু প্রস্তাব। ডুবন্ত জাহাজের কাপ্তেনকে কোনো হিসেবই দিতে হবে না। জাহাজ এবং তার গহ্বরে রক্ষিত সব সম্পদ তলিয়ে গেছে মহাসাগরের অতল গভীরে। যে জাহাজ ইতিমধ্যেই এস ও এস পাঠিয়েছে সে জাহাজ ডুবে গেলে কেউ দোষারোপও করবে না। তিনি ভালভাবেই জানেন তাঁর পরমায়ু স্বল্প মেয়াদী। ভোট এল বলে। ভোট মানেই ভেট। কমরেড, নেতা, মন্ত্রী সবার জন্য চাই ভেট। পর্যাপ্ত পরিমাণে ভেট। সেই ভোটের মাল যোগারের জন্য প্রয়োজন দু একটা প্রকল্প। নন্দীগ্রামের এণ্ড টু এণ্ড সার্ভের কাজটা শুরু করতেই হবে। দুশ কোটি টাকার পরিকল্পনা। ব্যাটা ভার্মা যে ফাঁদ পেতেছিল তা এবার গোটানোর পালা। থ্যাংকস্ টু বিপুল ব্যানার্জি। ওর জন্যই তো অভিনন্দন সাহেব সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন। যাই হোক, ওকে তো ঝাউতলায় পাঠানো হয়েছে। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। উপকারীর উপকার স্বীকার করতে তিনি জানেন। সমাজে পকেটমারেরও একটা নীতিবোধ আছে। তিনি একজন সি এম ডি হয়ে অকৃতজ্ঞ হবেন কেন ?

জটায়ুর কক্‌টেল পার্টি চলছে তো চলছেই। অফুরন্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে সন্ধ্যার আবির্ভাব হয়েছে। যুবতী সন্ধ্যার দুর্দান্ত প্রতাপে রাত পরাজিত। পানীয়, প্রলাপ আর বিগবসের প্রশস্তিতে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের অফিসাররা মশগুল। প্রত্যেকের ঘরে রয়েছে গৃহিণী। তারা অপেক্ষা করছে স্বামী প্রত্যাবর্তনের পথ

চেয়ে। তাদেরও শোনার আগ্রহ প্রবল। নতুন সি এম ডি কেমন? কি তাঁর প্রকৃতি? কতটুকুই বা তাঁর প্রতিভা? সত্যিই কি তিনি ডুবন্ত জাহাজকে তীরে নিয়ে আসতে পারবেন? নাকি আজকের কারণ সমুদ্রে সবাই তলিয়ে যাবে। ককটেল পার্টি যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না।

অশোক শুধু তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে। মিনিটের কাঁটা আপন ছন্দে অগ্রসরমান। ঘণ্টার কাঁটাও থেমে নেই। চলেছে মিনিটকে তাড়া করতে করতে। চলো, এগিয়ে চলো। রাত তখন দেড়টা। নির্মলকুমার অতি বিনয়ের সুরে অভিনন্দন সাহেবকে অনুরোধ করলেন। স্যর, ডিনার ইজ গেটিং কোল্ড। তাছাড়া আগামীকাল ভোরে উঠতে হবে।

সকাল সাতটায় গার্ড অফ অনার। সিকিউরিটির সেপাইরা নয়া সাবকো বীরের মর্যাদা দিতে চায়। বছরে তো একবারই সুযোগ। একবারই বীর বরণ। তারপর দীর্ঘ তিনশ চৌষট্টি দিনের প্রতীক্ষা। কমাণ্ডাণ্ট জানে, সাহেব খুশী মানেই ওর পোস্টিং পাকা। রামনগরে আছে মৌচাক। শুধু প্রয়োজনবোধে মধু সংগ্রহ করতে পারলেই হল। বার বার তিনবার বদলী হাওয়া সত্বেও ওকে কেউ সরাতে পারে নি। এখানে জি এম আসেন, জি এম চলে যান। কিন্তু সিকিউরিটির কমাণ্ডাণ্টের খুঁটি পাকা। শুধু তাই নয়। ওর জন্য বরাদ্দ করা আছে একটি ভি আই পি গাড়ী, একটি বাতানুকূল অফিস ঘর এবং বাংলোতে শাক সবজী চাষের জন্য এক ডজন জোয়ান। ওর তদ্বিরে অথবা তদারকিতে বছরে তিনটি বড়-খানার ব্যবস্থা। হোলির দিনে, স্বাধীনতা দিবসে এবং প্রজাতন্ত্র পালন উপলক্ষে তিন তিনটি ডিনার পার্টি। সেই পার্টিতে থাকবে লঘু পানীয় থেকে আরম্ভ করে তিন-কোর্সের ডিনার। সবই সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের খরচে।

সিকিউরিটির লোকদের তোয়াজ করতেই হয়। ওরা বিগড়ালে অনেকের বিপদ। অশোক বুঝতে চেষ্টা করে এই ধরণের ঢালাও বন্দোবস্তের মানে কি? বৃথাই চার অংকের মাইনে দিয়ে কোম্পানী তাকে পুষছে। আসল জনসংযোগ তো করছে এই সিকিউরিটির

জোয়ানরা। এখানে বাজেট কোনো সমস্যা নয়। প্রতিষ্ঠানের লোকসান কোনো সমস্যা নয়। পাড়া প্রতিবেশী, হোমড়া চোমড়া সবাইকে সমবেত কর এক টেবিলে। সেখানে সাজাও লাল গোলাপের পাশে রঙিন নেশার গেলাসগুলো। গ্লাসে যে রঙ পরিবেশিত হবে সেই রঙে রাঙিয়ে যাবে সবার মন। সে এইসব কথা বহুবার ভেবেছে। কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পায় নি। কারখানা বন্ধ্যা, প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কারখানা উৎপাদনে অক্ষম। অথচ সেকথা বলার অধিকার নেই। কর্তৃপক্ষের তরফে কেবল জেনারেল ম্যানেজার ভাষণ দিতে পারবেন। সেই মিথ্যাভাষণের তর্জমা তৈরী করে দিতে হবে অশোককে। এবং সেজন্যই তাকে রাখা হয়েছে গালভরা এক পদবীর কেদারায়।

রাত ক্লান্ত না হলেও বার্ধক্যের কোলে ঢলে পড়েছে। নির্মল-কুমারের অনুরোধে অভিনন্দন সাহেব গাত্রোত্থান করলেন। তাঁর দৈহিক অবস্থা অস্বাভাবিক স্তরে বিদ্যমান। ছ'রাউন্ড স্কচ্ গলাধঃকরণের শেষে চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত ইটভাঁটা। বিশাল বপু নিয়ে সাহেব চল্লেন ডিনার সাজানো ঘরে। সব খাবার সাজানে বুফে স্টাইলে। বসে খাওয়ার রীতি আজকাল প্রায় উঠেই গেছে। এতে যেমন প্রয়োজন প্রচুর চেয়ার টেবিলের তেমনি হয় খাদ্যের অপচয়। খাদ্যের অপচয় বন্ধের জন্যই সেলফ সার্ভিস এই বুফে বন্দোবস্ত। নিজে পছন্দ মতো খাবার তুলে নিলেই হল প্লেটে। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু নিলেই হল। দরকার হলে দ্বিতীয় রাউন্ড নেওয়া যেতে পারে। যার যতটা ইচ্ছা। পশ্চিমের হাওয়া এখন সর্বত্র। এতদিন পোষাকে, ভাষায় ছিল সেই প্রভাব। এবার শিল্পসভ্যতার রাজপথ দিয়ে সবকিছু ঢুকে পড়েছে হেঁসেলে।

ব্যবস্থাপনায় যত আধুনিকতাই থাকুক, অতিথি চিরদিনই ভগবান। তাঁর সেবাই পরম ধর্ম। নির্মলকুমার নিজের তত্ত্বাবধানে অভিনন্দন সাহেবের ডিশ সাজিয়ে দিলেন। চর্ব চোষ্য লহ্য পেয় সব সাবার হয়ে গেল মুহূর্তে। অতঃপর আহার গৃহ হল নিস্তব্ধ। এবার শোবার পালা। রাত তখন আর ইয়ং নেই। দুটো বেজে চল্লিশ। কিন্তু এই গভীর রাতেও সুজয়ের রেহাই নেই। বড় সাহেব শয়নকক্ষে প্রবেশের পর ওকে নিয়েই যত জল্পনা কল্পনা সাত আট

জন চীফ এনজিনীয়ার শুধু মিস্টার সুজয় ঘোষের সান্নিধ্য পেতে মেতে উঠেছে! ওরা জানে এই স্পর্শমণির মর্যাদা। অভিনন্দন সাহেব কোন্ কাগজে 'ইয়েস' লিখবেন, আর কোথায় 'নো' লিখবেন তা নির্ভর করছে সুজয়ের ওপর। তাই ঘোষকে তোষণ মানেই গুরু কৃপা লাভের সম্ভাবনা। এই দৃশ্য অবলোকনে অশোকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো কেঁদুলী মেলায় বাউল বাবাজীর গানের সুর। গুরু না ভজিলে, সন্ধ্যা সকালে মনপ্রাণ দিয়ারে…

গুরু এবং রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি! রাজা ব্যস্তলোক। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার, বিচার করার সময় কোথায়? তাঁকে শুনতে হয় তাই অনেক বেশী। দেখতেও হয় অনেক কিছু। রাজার সিংহাসনে বসলে রাজত্বের সব খবর তাঁকে জানতেই হয়। প্রজা শাসন এক গুরু দায়িত্ব! রাজা কি দুচোখ দিয়ে সব দেখেন? সময় কোথায়? তাঁকে শুনতে হয় একান্ত নির্ভরযোগ্য চরের কথা। রাজা কর্ণেন পশ্যাতি। তাঁর কানে রাজ্যের কথা যেভাবে তুলে ধরা হয় তাই তাঁর দেখা। কানে শোনা মানেই চোখে দেখা। সেই দেখার মাধ্যমেই তাঁকে বিচার করতে হয়। নিতে হয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কখনো দিতে হয় কঠোর শাস্তি।

অশোক ভেবেছিল সুজয়বাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করা যেতে পারে। কিন্তু সুযোগ কোথায়? ভাণ্ডারী সাহেব ওকে আগলে রেখেছেন। অতিথিশালার রক্ষক আতাউল্লাকে বলে রেখেছেন তিনি। দেখো ভাই, আর যাই হোক ঘোষসাবকো কোই তকলিপ না হোনে চাহিয়ে। এদিকে ভাণ্ডারীর তাবেদার ব্রজবাসীও সবাইকে ব্রীফ করে রেখেছে। পান থেকে চুণ খসলে হুলস্থুল বেঁধে যাবে। সতর্ক দৃষ্টি যেন থাকে সর্বত্র। অভিনন্দন সাহেব ভীষণ রাগী লোক। রাগী তো নয়, বদরাগী। তাঁর চিৎকার যেন সিংহনাদ। সেই চিৎকারে বহু ঝানু অফিসারের পাতলুন হলুদ হয়ে যায়। জি এম-দের জলবিয়োগের বেগ আসে। কবে, কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে পানীটোলার এক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এনজিনীয়ারের ট্রাউজার ভিজে গিয়েছিল সে খবর শুধু জানে

সঞ্জয় ঘোষ। তাই গুরুভজনার এক সেরা ক্যাটালিস্ট হিসাবে ওর গুরুত্ব অপরিসীম। বড়ই ক্লান্ত সে।

আই মাস্ট গো টু বেড নাউ। মাস্ট নটাই স্লিপ নাউ? ওর অনুরোধ কেউ শুনছে না। ওকে বিরক্ত করে মজা পাচ্ছে সবাই। চলেছে গুরুবন্দনার নানা কীর্তন। হে ঈশ্বর, আজকের রাত যেন অনন্ত অফুরন্ত হয়। গুরু ভজনার কীর্তন যেন অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তনের সুরে মুখরিত। প্রভুর যশের খ্যাতি পর্বত সমান। রাতে সঞ্জয় খুব অল্প সময়ের জন্য চোখের পাতা বন্ধ করতে পেরেছিল।

* * *

রামনগর কারখানায় আজ দারুণ উত্তেজনা। দিল্লীর পুরো কর্পোরেট অফিস উঠে এসেছে এখানে। এটাই বৃন্দাবন প্লেসের ক্যাম্প অফিস। কনফারেন্স কক্ষ পুষ্পশোভিত। এয়ার কণ্ডিশনার-গুলো অক্লান্তভাবে হিমেল হাওয়া বিতরণ করছে। সমবেত সাহেবদের গায়ে যেন ঘাম বসতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ন নজর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তাদের উপস্থিতিতে সভাকক্ষ পরিপূর্ণ। পরিবেশে গুরুগম্ভীর ভাব। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। গোল টেবিলের চারপাশে বসে আছে বিভাগীয় প্রধানেরা। মনে মনে জপ করছে ঠাকুর দেবতার নাম। সি এম ডি কখন কাকে ল্যাংটো করিয়ে নাচাবে তা কে জানে?

গলদ সবারই আছে। তাই বলে সেইসব কথা সর্বসমক্ষে বলতে হবে? শোভন অশোভন বলে কি কিছুই নেই? কিন্তু নতুন সি এম ডি রাগলে চণ্ডাল। কারও তোয়াক্কা করেন না। জয় বাবা বজরঙ্গবালী। রঘুপতি রাঘব রাজা রামকে স্মরণ করছে উপবিষ্ট এইচ ও ডিস্ দল। সারা বছরের আরামের ঘুম আজ ঘুচবে। আজ রাবণের দিন। ওরা কেউই নিশ্চিন্ত নয়। রাজা রাম রাবণ বধ করতে পারবেন তো? রাবণরূপী অভিনন্দনের আক্রমণে সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে নাতো? যুদ্ধে সাধারণত অস্ত্রের ঝণৎকার স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের যুদ্ধ শুধুই কথার। বাকযুদ্ধ। কথার মারপ্যাঁচে সবাইকে জব্দ করবেন তিনি। এ যুদ্ধ শুরু

হবে স্নায়ুর ওপর। কার কতোটা সহ্যশক্তি আছে তা দেখা হবে। মনোবলের দৃঢ়তা দাড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। যে এই পরীক্ষায় পরাজিত হবে তার প্রস্থান চিরতরে। চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্থান। সোনালী করমর্দন অথবা পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত মাধ্যমে চিরবিদায়।

স্নায়ুযুদ্ধে জয়লাভের জন্য চাই প্রচণ্ড মনোবল। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের চীফদের সে মনোবল আছে কি? প্রতি তিন বছর অন্তর ক্যালেণ্ডারের পাতায় দাগ কেটে প্রমোশন পেয়েছে তারা। আদায় করেছে অধিকার। কিন্তু দায়িত্ব পালনে কি তেমন ভাবে প্রদর্শন করেছে দৃঢ়তা? কারখানায় কোনো কাজ করতে হয়নি। কাঁচামালের টাকা দেয় নি সরকার। কোথাও বা প্রকল্প স্তর থেকে উৎপাদন স্তরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বদলী করা হয়েছে। এফিসিয়েন্সী যাচাইয়ের সুযোগই দেওয়া হয়নি এইসব টেকনোক্র্যাটদের। নন্দীগ্রামের কারখানায় পাঁচজন জেনারেল ম্যানেজারের আগমন এবং নির্গমন। কিন্তু চিমনীতে ধোঁয়া ওঠেনি। তাই পরিকল্পনার শিশুটি সত্যিকারের পিতাকে চিনতেই পারেনি। কেউ তাকে হাঁটতে শেখায় নি। বাবারও নেই কোনো দায়িত্ববোধ। কারখানা হল জনসাধারণের। শুধু জেনারেল ম্যানেজার একা কেন ভাবতে যাবেন? মাইনে সবাই নেয়। সবারই থাকা উচিৎ কৃতজ্ঞতাবোধ। কিন্তু কেউ তা ভাবে নি। উদোর পিণ্ডি পড়েছে বুধোর ঘাড়ে। উৎপাদন দূরে অস্ত! তবুও সরকারের বদান্যতায় প্রকল্পকে উৎপাদনক্ষম কারখানা নামে করা হয়েছে ভূষিত। রাসায়নিক কারখানায় কোনো রসায়ন নেই। আছে শুধু পোষণ তোষণ। আর আছে দুর্নীতির ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ।

অভিনন্দন সাহেব সব খোঁজ নিয়ে তবে ডুবন্ত জাহাজের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ধরণের সমস্যার জট খুলতে তিনি পারদর্শী। একজন বিশেষজ্ঞ। সঙ্গে আছে বয়লার এনজিনীয়ার সুজয় ঘোষ। সি এম ডির নির্ভরযোগ্য কারিগরী সহায়ক। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। অথবা একজন অ্যাডভাইজার। সে হল নতুন প্রধানের এক নম্বর পোষ্য। দ্য গ্রেট ঘোষ অফ অভিনন্দন

কোম্পানী। কথার যোগান দিতে, সময় মতো তথ্য সরবরাহ করতে এবং তাৎক্ষণিক সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণে ওস্তাদ। সঞ্জয় জানে অভিনন্দন সাহেব একটা ধমক দিলে এইসব চীফদের কি অবস্থা হতে পারে। ভেতরে ভেতরে সবাই দুর্বল। প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের মাইনে নিচ্ছে। অথচ বিনিময়ে দিচ্ছে লবডঙ্কা। দেশবাসীর করের টাকায় তাদের যত ফুর্তি। ট্যুর তথা পার্কসের পাকা বন্দোবস্ত। গোটা সপ্তাহ গাড়ী গ্যারেজে রেখেই কার-অ্যালাউন্স। সাব অর্ডিনেটের টু-হুইলারে রেলস্টেশন পেঁছে মোটা অংকের ট্যাকসি বিল। আর ট্যুরে গেলে রাত্রি যাপনের খরচ সাপ্লায়ারের ঘাড় ভেঙ্গে। সেখানেও ফয়দার টাকায় ময়দার লুচি। দৈনিক রাহাখরচের নামে নির্ধারিত ডেইলী অ্যালাউন্স। এদের নীতি বলে কিছু নেই। ফাঁকি এদের জীবনের অঙ্গ। আজকের মিটিং-এ বস্ কখন যে কাকে উলঙ্গ করে ছাড়বেন তা কে বলতে পারে? সেই ভয়ংকর মুহূর্তের কথা ভেবে এদের পিতৃদত্ত সম্পত্তি দুটো উর্ধ্বগামী। সঞ্জয় বড়সাহেবের কাছের লোক। তার সঙ্গে হাসি বিনিময়ের প্রতিযোগিতায় কে প্রথম হয় বর্তমানে তাই দেখা যেতে পারে।

নির্মলকুমারকে সঙ্গে নিয়ে অভিনন্দন সাহেব প্রবেশ করলেন কনফারেন্স রুমে। সঙ্গে বলাটা সঙ্গত নয়। আর যাই হোক, সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের চীফ একজিকিউটিভ। বলা উচিৎ তাঁকে এসকর্ট করে নিয়ে এলেন রামনগরের জেনারেল ম্যানেজার। সকলে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন জানালো বিগ বস্‌কে। বিভাগীয় প্রধানেরা দন্ডায়মান এবং সি এম ডির মুখদর্শনে উদগ্রীব। সীট ডাউন ফ্রেন্ডস্। সভাগৃহের মৌনতা ভঙ্গ করে উচ্চারণ করলেন আজকের নায়ক মিস্টার এ এস এম। এবার পরিচয়ের পালা। একে একে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে চেয়ারম্যানের পরিচয়ের পর নির্মলকুমারের চোখ এসে থামলো অশোকের ওপর। তাঁকে আর মুখ খুলতে হল না।

স্বয়ং চেয়ারম্যান বললেন, ইয়েস। আই নো হিম। মেট হিম অ্যাট ডেলহী। দিল্লীর সেই মোলাকাতের প্রসঙ্গে এসে তিনি যেন কেমন অসহায় বোধ করলেন। সেই কাজির বিচারের শাস্তি মাথা

পেতে নিয়ে আজ অশোক এই কারখানার পিয়ারো। জনসংযোগ আধিকারিক। অথচ অপরাধী জানতে পারল না, কোন্ কসুরে তার এই বিড়ম্বনা। কোন অভিশাপে পাঠানো হল বনবাসে। এটা কি পরিকল্পিত কোনো দাবার চাল? অথবা প্রতিষ্ঠানের টালমাটাল অবস্থায় তুঘলকী স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন। রাজা কি কখনো ভুল করেন? কিং ক্যান্‌ট ডু রঙ্গ। তবে কি বিধাননগরের লালতু চক্রবর্তীর কোনো অভিযোগ ছিল।

সাব-অর্ডিনেট যদি শিক্ষিত হয় তবে ওপরওয়ালার অনেক অসুবিধা। কর্মক্ষেত্রে তাই তাকে দমিয়ে রাখার এক অদম্য প্রয়াস। রাজনীতি কি শুধুই দেশ শাসনের লোভে? অফিসের পলিটিকস্ ততোধিক জটিল। কে কাকে ল্যাঙ্ মারবে, কি ভাবে ব্যক্তিগত ফয়দা তুলবে সেই চিন্তায় প্ল্যান কষছে সবাই। বেশ কিছুদিন অশোক লক্ষ্য করেছে লালতুর আচরণ। বিকিরণ সাহেবের পক্ষপুটে থেকে ও ধরাকে সরা বলে ভেবেছিল। অশোককে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। খুঁটির জোরে বেশ তড়বড় করছিল। গাঙ্গুলীসাহেব যাকে বেগার আর বাগার্স ছাড়া সম্বোধন করতেন না সে হঠাৎ হাতীর পাঁচ পা দেখলো। কৌশলে প্রবীরের সঙ্গে লাইন করল।

মোহিতনগরে চলছে বাড়ীর কনস্ট্রাকশন। কিছু কিছু সাজ-সরঞ্জাম ভেট আসছে ডিলারের কাছ থেকে। চেয়ারে থাকতে থাকতেই বাড়ীর কাজ শেষ করতে হবে। একদিন চেয়ারের পরমায়ু শেষ হবে। কিন্তু বাড়ী থাকবে স্থাবর সম্পত্তির সম্মানে। নিজের আরাম, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ গৃহ গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। শান্তির আবাসে সুখ করবে বাস। অশোক সবই জানে। ওকে জানতে হয় না। ইউনিয়নের কমরেডরা গোপনে এইসব তথ্য ওকে জানায়। শুনতেই হয় তাদের কথা। জনসংযোগের লোক। সবার সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখা হল প্রধান কর্তব্য। পিয়ারো সাপকেও আদর করে আবার সাপুরেকেও চুমু খায়। কাজটাই এমন দ্বৈত সত্তার। এলসির দৈনন্দিন কার্যকলাপে ইউনিয়নের কেউই খুশী নয়। অথচ তার বিরুদ্ধে যাওয়ার সৎসাহস নেই। সেদিক থেকে

গাঙ্গুলী সাহেব আগেই ওদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়েছেন। সব নেতারই এক একজন প্রার্থীকে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরী দিয়ে মুখ বন্ধ করেছেন। তিনি আদর্শ শাসক। সুপরিকল্পিতভাবে কৌশলে কমরেডদের পকেটে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন ওদের চীৎকার, স্লোগান সবই শূন্যগর্ভ। আসল বিষদাঁত তাঁর পকেটে। তিনি বিদায় নিয়েছেন। রয়েছেন তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি বিকিরণ ভট্টাচার্য। ওঁকে ঘাটানো ঠিক হবে না। ওঁর কাছেও রয়েছে এইসব নেতাদের হাঁড়ির খবর। এলসি এসব জানে। বিকিরণ সাহেবের পা-চাটা লোক সে। বাড়ী তৈরীর খবর মোহিতনগরের বাইরে যাক এটা অভিপ্রেত নয়। এইসব মৌরসীপাট্টার খবর বাইরে প্রচার হলে অনেক বিপদ। পিয়ারোকে ভরসা নেই। ওকে সরাতে পারলে শান্তি। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের বস্‌দের অনেক ক্ষমতা। ভাত দেবার ক্ষমতা নেই কিল মারার গোসাই। সাব-অর্ডিনেটকে পছন্দ হচ্ছে না তো তার সর্বনাশ কর।

সারা বছর কি কাজ হল তার বিচার করবে ওপরওয়ালা। ওপরওয়ালা বস্ নয়তো, বাঁশ। সর্বনাশের আঁটি। সামনে ভাল ব্যবহার করলেও কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টটির বারো বাজিয়ে রাখবে। অফিসারটি শিক্ষিত। কাজও ভাল জানে। তবে বড্ড একরোখা। গোঁয়ার প্রকৃতির। শুধু এই মন্তব্যেই অফিসারটির পদোন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কোম্পানীর অপদার্থ অফিসারদের ষড়যন্ত্রের জন্য খেয়োখেয়ির খেলা ওঠে চরমে। এলসির মনে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়েছে তার একান্ত আস্থাভাজন মহেশ্বর মণ্ডল। দীর্ঘদিন এই অফিসে কাজ করে কৌশলটা সে ভালভাবে আয়ত্ব করেছে। অফিসে সব সময় একটা ঠাণ্ডা লড়াই জিয়িয়ে রাখতে হবে। এই কোল্ডওয়ার চলবে ম্যানেজার বনাম অফিসারের। সর্বদা একটা টেনশন রাখতে হবে। শুধু কাজ করে জীবনে কেউ উন্নতি করতে পারে না। তাকে রাজনীতি করতে হবে কর্মস্থলে। এলসির মনে কেন যে সন্দেহ দানা বেঁধেছে অশোক তা জানে না। তবে সম্প্রতি প্রবীরের সঙ্গে গা সোঁকাসুঁকি চলছে সে খবর সে জানে।

অন্ধকারের রাজনীতিতে প্রবীর প্রসিদ্ধ। ঝাউতলায় বসে ও বিধাননগরে সে জাল বিস্তারিত করল। এলসির আহ্বানে সাড়া দিল। প্রবীরের অবচেতন মনে ব্যাটা মিত্তিরকে শায়েস্তা করার একটা সখ ছিল। ওকে শিক্ষা দিতে হবে। শেখাতে হবে, রোমে থাকতে হলে রোমান হওয়া প্রয়োজন। এলসি-প্রবীর চক্র কি অশোকের বনবাসের বীজ বুনেছে? একদিন হঠাৎই বিকিরণ সাহেব অশোককে ডেকে বললেন, আপনি দিল্লী যান। চেয়ারম্যান ওয়ান্টস্ টু মীট ইউ। নির্দোষ আসামী তখনো জানে না বিচার তার বহু আগেই হয়ে গেছে। জজসাহেব শুধু শুনানী শোনাবেন। তার জন্য দিল্লীতে তলবের কি প্রয়োজন? চাকরী মানেই চাকরাগিরি। বেতনভূক চাকরের তো কোনো চয়েস নেই। প্রভুর হুকুম পালন করাই তার কর্তব্য। সে ক্রীতদাস না হলেও কেনা গোলাম তো বটে।

রামনগর কারখানার কনফারেন্স রুমে বসে অশোকের কতো কথাই না মনে পড়ে। লণ্ডন থেকে স্বদেশে ফেরার মুহূর্তে কমলদা বারে বারেই বলেছিলেন। দেশে যাচ্ছ, খুব ভাল। তবে দেখবে দেশের লোক তোমায় কেমন ভাবে গ্রহণ করে। ওরা তোমায় একদিনও শান্তিতে তিষ্টোতে দেবে না। হিংসা, ঈর্ষায় জর্জরিত ওদের মন তোমার কর্মজীবন বিষময় করে তুলবে। নিজের দেশেই হয়ে উঠবে একজন পরবাসী। অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শে অবহেলার ফল সে প্রতি পলে অনুভব করছে।

কনফারেন্স রুমে গোল টেবিলের চারপাশে এক ডজন বিভাগীয় প্রধান উপবিষ্ট। আজকের নাটকের এক একটি চরিত্র। আর অশোক চলে গেছে নাট্য রচনার পূর্বযুগে। সেখানে চলেছে নানা প্রস্তুতি। ছকে আঁকা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে। মহাপুরুষেরা বলেছেন, জীবন এক বিরাট নাট্যমঞ্চ। অশোকের মনে হয় সবটাই এক করুণ প্রহসন। সবাই অভিনয় করে চলেছে মহাকালের রঙ্গমঞ্চে। এরা যতক্ষণ বসে আছে কুর্শীতে ততক্ষণ পাচ্ছে কুর্নিশ। প্রজাদের ব্যক্তিগত অসুবিধা. সুখ-দুঃখ কোনো কিছুই এদের মনে সাড়া জাগায় না। প্রত্যেকেই শুধু অভিনয়

করে চলেছে অন্য কোনো মহাশক্তির নির্দেশে। গণতন্ত্রের ঈশ্বর মন্ত্রী মহোদয় অথবা জনপ্রতিনিধি নামক এম পি। অথবা তাঁদের চেলারাই আসল ভগবানের ভগ্নাংশ। এরাই ভাগ্যবান। এদের কাছে চেয়ারম্যানও শিশু। স্কুল পাঠ্য কাহিনীতে মুখ ঢেকে থাকেন। ভগবান দূত পাঠান মর্তে। ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। আধুনিক মন্ত্রীরাও দূত প্রেরণ করেন মহালে। দূত অথবা ভূত যাই হোক না কেন, সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের সি এম ডিরা নিজস্ব ভূমিকা পালন করেন বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে। তাঁরা জানেন না, নিজেরাও এক একটি পাপেট। আসল সুতো মন্ত্রীর হাতে।

অভিনন্দন সাহেব সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেকটার, সি এম ডি। সর্বময় কর্তা। সমুদ্রের মতো বিশাল তাঁর ক্ষমতা। ক্ষমতাবান লোকের মমতা বলে কোনো অনুভূতি নেই। অশোক সি এম ডি-র আচরণে এবং আস্ফালনে তা ভালভাবেই টের পেয়েছে। সে অতি সামান্য এক অফিসার। জনসংযোগের দায়িত্ব তার ওপর। সেই দায়িত্ব সে একনিষ্ঠভাবে পালন করেছে। কাজের ব্যাপারে কেউ কোনোদিন দুর্নাম দেয়নি।

বোবার কোনো শত্রু নেই। তবে অশোক এই প্রবাদকে ধ্রুব সত্য বলে মানতে রাজি নয়। সে তো কখনো প্রবীর অথবা তস্য চামচে সমরের সঙ্গে সংঘাতে যায়নি। ওরা চাইছিল অশোক ওদের চক্রে মিশে যাক। তারপর একঝাঁক পিয়ারো কেমন করে পিয়ানো বাজাতে পারে তা দেখিয়ে দেবে মহামান্য কর্তৃপক্ষকে। ম্যানেজমেণ্ট বাই পি আর। আর পিয়ার বাই সেক্স যে কতোটা কার্যকরী প্রবীর তা প্রমাণ করে দিয়েছে। অশোক দলে মিশতে পারে নি। ওদের ষড়যন্ত্রে সাড়া দেয়নি। প্রবীর প্রথমদিকে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। মিস্টার মিট্রা, এটা বিলেত নয়। এ হলো ভারতবর্ষ। আর যে প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়েছেন তার ইতিহাস-ভূগোল শিখুন সর্বাগ্রে। তারপর জনসংযোগ। চেয়ারম্যান সাহেব কি প্রত্যাশা করেন পিয়ারোর

কাছ থেকে তা জানতে হবে। তাঁর চাহিদা, চাতুরী বুঝতে না পারলে এই বৃত্তি গ্রহণ করাই বৃথা। প্রবীর প্রাজ্ঞ পিয়ারোর অধীত জ্ঞান বিতরণ করে অশোকের কাছে। সত্যিই জনসংযোগের প্রকৃত সংজ্ঞাটা জানা ছিল না তার। আধুনিক জনসংযোগ বজায় রাখা বড় কঠিন কাজ। প্রবীর প্রমাণ করেছে প্রতিষ্ঠানের সব থেকে উপেক্ষিত বিভাগে কাজ করেও সি এম ডি-র নজরে আসা যায়। কিভাবে র‍্যাপোর্ট তৈরী করতে হয় বড় কর্তাদের সঙ্গে তা ওর জন্মগত উপলব্ধি। এ ব্যাপারে ওকে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন প্রবাল মজুমদার।

নন্দীগ্রামের জেনারেল ম্যানেজার প্রবাল মজুমদার। শিল্পে তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। তবে এই কারখানায় যোগদান করে তিনি উৎপাদন অপেক্ষা কাঁচামালের প্রতি নজর দেন বেশী। তিনি জানতেন এই কারখানার চিমনীতে কোনদিনই ধোঁওয়া বেরোবে না। তাই সব শক্তির সদ্ব্যবহার করলেন সম্ভোগে। রমনী সম্ভোগ তাঁর হবি, পাস্টাইম। বিশাখা দত্তকে দিয়ে শুরু। প্রবীর কৌশল করেই এই টোপ ফেলেছিল। টোপটি ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। তারপর নায়িকার বদল হলেও নায়ক বুড়ো হয়নি। মজুমদার সাহেব চলে গেলেন বৃন্দাবন প্লেসে। কর্পোরেট অফিসে।

নন্দীগ্রামে এলেন এক জাদুকর জেনারেল ম্যানেজার। সেই ম্যাজিশিয়ান ম্যানেজারের কাছে প্রবীর শিখেছিল শুধু কথার বেসাতিতে জনগণকে কিভাবে বোকা বানানো যায়। অশোক একবার নন্দীগ্রামে গিয়েছিল বম্বের এক সাংবাদিককে সঙ্গে করে। প্রজেক্ট তখন তৈরী শেষ। শুধু লাইট অন্ করা বাকী।

সাংবাদিক জানতে চাইলেন, বাংলার মাটিকে উর্বরা করতে তুমি কবে সাহায্য করতে পারবে? মাঠে তো সোনা ফলানোর গান শুনলাম তোমার পিয়ারোর মুখে। সত্যি করে বলতো, কবে উৎপাদন দেবে এই কারখানা?

ম্যাজিশিয়ান ম্যানেজার নাটক করে বলেছিলেন, গিভ মী পাওয়ার টুডে, আই উইল প্রডিউস টু-মরো্যা। প্রজেক্ট পুরোপুরি প্রস্তুত। শুধু পর্যাপ্ত বিদ্যুতের অভাবে সে অন্ধ হয়ে আছে।

সেই অন্ধত্ব ঘুচিয়ে তিনি লাইট অন্ করেছিলেন। তবে তা লালবাতি। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ এবং সরল। পশ্চিমবঙ্গে চলছে লাল সরকার। সরকারের দরকার কমরেড। কমরেডের রাজত্ব। সেখানে কারখানায় উৎপাদন কেউ চায় না। স্থানীয় নেতারা নির্দেশ দিয়েছেন কমরেড বন্ধুদের। ম্যানেজারকে মেরে ফেলো না। শুধু উৎপাত করে যাও। ঘেরাও করো, শালা-বাঞ্চোৎ গালাগালি দাও। দাবী আদায় করো। খবরদার কর্তব্যের প্রসঙ্গ তুলবে না। আন্দোলনকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যদি কারখানায় সব যন্ত্র চলে নিয়ম মাফিক, উৎপাদন লক্ষ্যে পেঁাছে যায় তবে সুনাম হবে ব্যাটা জি এমের। অতএব ধর শালাকে। জব্দ করো। বন্ধ করো কারখানার উৎপাদন। ম্যাজিশিয়ান সাহেব তাই স্থানীয় নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখলেন। উপহার দিয়ে গেলেন একটি লালবাতি। প্রবীর সেই চতুর জাদুকরের শিষ্য। তাঁর কাছে শিখেছে কথা বলার কৌশল। লোক সম্মোহনের সব আর্ট তার জানা।

নাট্যশাস্ত্রে নায়িকার অনেক গুণ। অনেক কলার অধিকারিণী হতে হয় নায়িকাকে। আধুনিক পিয়ারোও বহুগুণের অধিকারী। নায়িকার মতো তার থাকা চাই সম্মোহনী শক্তি। প্রবীর কি সব শিখে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছিল? কথাটা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল অশোক। প্রবীরের জোঁক সমরকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে। ও তো কলিযুগের বামন অবতার। অনেক কিছু জানে। সামনে কেঁচো, পেছনে সাপ। কখন যে কাকে ছোবল মারবে তা কেউ জানতে পারবে না। র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল থেকে ঘষে ঘষে পদোন্নতি। দীর্ঘ কর্মজীবনে দেখেছে অনেক। শিখেছে ততোধিক। বস্‌কে নিজের স্ত্রীর চেয়েও বেশী ভয় করে।

সমর বলেছিল, বুঝলেন মিত্র সাহেব। ওসব কাউকে শেখাতে হয় না। সোনাগাছির খানকির ঘরে যখন খদ্দের ঢোকে তখন তার লজ্জা থাকে। তারপর খদ্দের চড়িয়ে তাড়িয়ে সেই খানকিই একদিন মাসির ভূমিকা নেয়। এই প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগের পয়লা নম্বর হলেন প্রবীরবাবু। তাই ওঁর সেবা করে চলেছি

দিনের পর দিন। কৃপা একদিন হবেই। সমরের জ্ঞানোপলব্ধি সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রবীরের অভিজ্ঞতা, সমরের তোয়াজ তোষামোদ কোনটার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না অশোক। তাই সে জড়সর থেকে গেছে প্রতিদিনের কর্মজীবনে। জন-সংযোগের নামে এই ধরণের নোংরামি তার রুচিতে বাঁধে। আদর্শকে আঘাত করে। কিন্তু এই হলো কর্মজীবন। প্রতিদিনের প্রতিযোগিতায় বাঁচার পথ। নেতা থেকে অভিনেতা সবাই আজ এই দুই-নম্বর পথ ধরে খ্যাতির উচ্চমার্গে পেঁছিতে চায়।

রামনগর আজ রমরমা। কনফারেন্স হলে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, ভূগোল আর অর্থনীতি বিষয়ক নানা আলোচনা। অভিনন্দন সাহেব প্রথমেই জানতে চাইলেন, কারখানা বন্ধ কেন? জেনারেল ম্যানেজার নির্মলকুমার তাকালেন ডি জি এম রাম কমল সিংহের দিকে। তিনি আবার তাকালেন প্রডাকশন চীফ্ রামপিয়ারী ঠাকুরের প্রতি। এবার ঠাকুরের পালা।

স্যর, সবই ঠিক ছিল। কিন্তু গত পরশু হঠাৎ পাওয়ার ট্রিপ হলো। তাই কারখানার নিরাপত্তার কথা ভেবে সব বন্ধ রেখেছি।

প্রডাকশন চীফের এই যুক্তির সূত্র ধরে বড় সাহেব বললেন, বাট আওয়ার নাইনটি মেগাওয়াট ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাণ্ট ইজ রেডী। হোয়াই ডিডিণ্ট ইউজ ইট?
এবার চীফ ইলেকট্রিক্যাল এনজিনীয়ার রামবিলাস ওঝার উত্তর।

স্যর, আপনি ঠিকই বলেছেন। সি পি পি, মানে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাণ্ট, রেডী হওয়া সত্ত্বেও তা চালানো সম্ভব হয়নি। চালানো যায় নি ম্যানিং-এর সমস্যায়। এখানকার ইউনিয়ন বলেছে, পয়েণ্ট টু পয়েণ্ট লোক নিয়োগ করতে হবে। আমরা বহুবার প্রস্তাব পাঠিয়েছি। কিন্তু পার্সোন্যাল ডিপার্টমেণ্ট সব প্রপোজাল চেপে বসে আছে।

অভিনন্দন সাহেবের রক্ষচক্ষু পড়লো ম্যানেজার পার্সোন্যাল ব্রজবাসী দাসের ওপর। তারপর ভাণ্ডারী সাহেবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপান্তে প্রশ্ন করলেন।

হাউ লঙ্ ইজ ইয়োর সার্ভিস? বল, তোমার কীর্তন এবার শোনা যাক। এই কোম্পানীতে সবাই পিঠ বাঁচানোর জন্য প্রস্তুত। আত্মরক্ষা জীবের ধর্ম। বল, তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের কি কি অস্ত্র আছে?

ব্রজবাসীর হোঁচট খাওয়া ইংরেজি শুনে বস্ তো রেগে আগুন, তেলে বেগুন। এতবড় এক প্রতিষ্ঠানের পার্সোন্যাল ম্যানেজার। দু-হাজার শ্রমিককে রসেবশে রেখে কারখানার স্বার্থ দেখা তার কাজ। কথার মার প্যাঁচই যার প্রধান হাতিয়ার সে গুছিয়ে কথা বলতে অক্ষম। শুধু ইয়েস স্যর, নো স্যর দিয়ে সেনাবিভাগে কাজ চলে। তাদের প্রধান অস্ত্র বন্দুকের গোলা। কিন্তু কারখানায় কথা বলাই হল একটা শিল্প। কথার কারসাজিতে আদায় করতে হবে কাজ। এত নিম্নমানের লোক উঁচু পোস্টে চাকরী পেল কি করে?

তিনি মিস্টার ভান্ডারীকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, ডিড ইউ ফাউণ্ড হিম মোস্ট স্যুইটেবল ফর দ্য জব? তোমার কি আর কোনো প্রার্থী ছিল না? ওয়েল মিস্টার ঘোষ। প্লীজ টেক আ নোট অফ্ হিম।

তারপর জানতে চাইলেন ব্রজবাসী চাকরীতে কনফার্মড কিনা? মিস্টার কুমার, নাউ ইউ টেল মী দ্য ফ্যাক্টস্। তোমার কারখানায় উৎপাদন বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ এমন একটি শ্বেতহস্তী কেনার বাসনা কেন? জান না, এটা খুবই ব্যয়বহুল বিলাসিতা।

অভিনন্দন সাহেবের এ এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ হল তাঁর একজিকিউটিভ টেক্নিক। সবার মাঝে তাবড় তাবড় অফিসারকে আঁতে ঘা মেরে কথা বলা। একজন জেনারেল ম্যানেজার আর জুনিয়ার অফিসারের মধ্যে কোনো ফারাক নেই তাঁর কাছে। জুনিয়ারকে বরং প্রশংসা করবেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। তিনি জানেন, এরা কোনোদিনই তাঁর প্রতিযোগী হবে না। বরং এরাই হলের বাইরে যেয়ে তাঁর প্রচার করবে পঞ্চমুখে। এদের মুখে মুখে রটে যাবে রামনগরে দেবতার আবির্ভাব কথা।

সি পি পি-তে ম্যান পাওয়ার প্রসঙ্গে ব্রজবাসী কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি। এবার পালা ভাণ্ডারীর দ্বিতীয় সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে। সৃষ্টি কথাটা ভুল হল। বলা যেতে পারে আবিষ্কার। এম এম পঞ্চানন নন্দী। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের মালবাবু।

অভিনন্দন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট ইনসপায়ার্ড ইউ টু জয়েন হিয়ার? তুমি বম্বেতে ছিলে। হঠাৎ রামনগর টানলো কি করে? শুনেছি তুমি আর্মিতে ছিলে, নেভীতেও কাজ করেছ। এয়ার ফোর্সেও কাটিয়েছ কিছুদিন। কমপিউটারে বেসিক শিখেছ। ক্যাড, ক্যাম মেশিন অপারেট করতে জান। এত বিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে তুমি এসেছ এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়।

স্যর, এটা কোলকাতার কাছে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের খুব সুখ্যাতি আছে বাজারে। শুনেছিলাম আপনি যোগদান করছেন। তাই আপনাকে সার্ভ করার বাসনা হল। পঞ্চানন একদমে গুরুবন্দনা সেরে নিল।

হোয়াট? ইজ ইট নীয়ারার টু ক্যালক্যাটা? পেঁয়াজী পেয়েছে। পাঁচশ কিলোমিটার দূরে উত্তর বিহারে অচ্ছ্যুৎ জায়গা হলো তোমার প্রিয়। বল, পরিষ্কার করে বল। রামনগরে কিসের আকর্ষণ? জরুর ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়। ভাণ্ডারী, হোয়াট ইজ হী টকিং?

ভাণ্ডারীসাহেবের পক্ষে দু দুখানি ব্রহ্মশেল সহ্য করা কঠিন ব্যাপার। তিনি জানেন চেয়ারম্যানের এই ইঙ্গিতের মানে কি। তবুও বস্‌কে একটু যুক্তি দেখাতেই হয়।

স্যর, আসলে ক্যালকাটার ক্যাম্প অফিসে ওকে পোস্টিং দিয়েছিলাম। কিন্তু ও নিজেই পছন্দ করল রামনগর।
হোয়াট? ইজ দেয়ার এনি হানি অ্যাট রামনগর? ধমকে উঠলেন সি এম ডি।

গত রাতের পার্টিতে তিনি হুইস্কি সরোবরে শুধু সাঁতার কাটেন নি। মাঝে মাঝে ডুবুরীর কাজও করেছেন। ভাণ্ডারী সাহেবের লোক নিয়োগের অন্তরালে যে লেনদেনের কারবার লুকিয়ে আছে

সে তথ্য তাঁর জানা হয়ে গেছে। তাই কোটি কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ এবং লোকসানের চিত্র অপেক্ষা স্থানীয় ম্যানেজারের মহিমা বিশ্লেষণে তিনি ব্যস্ত। মিস্টার ঘোষ, প্লীজ টেক আ নোট অফ ইট বলেই তিনি তাকালেন রামকমল সিংহের দিকে।

নেহেরুজীর স্বপ্ন। সোনার ভারতের স্বপ্ন খান্ খান্ হয়ে যায় ভাণ্ডারীর মতো কাণ্ডারীর হাতে পড়ে। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের অধঃপতনে দেশের অর্থনীতির ওপর এক বিরাট আঘাত আনে। দেশকে স্বয়ম্ভর করার উদ্দেশ্যে, দেশবাসীকে সেবার প্রয়াসে আর বহু লোকের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। কিন্তু জন্মলগ্নেই কোন্ এক অশুভ গ্রহের ফেরে সারাটা জীবন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। রসায়ন-শিল্পে টেকনোক্র্যাটদের প্রাধান্য। কারখানা চালায় অভিজ্ঞ এনজিনীয়ারের দল। তারা হল মহাপ্রভু! কিন্তু স্বজন পোষণ এবং নেতা তোষণের ফলে তারা কোনদিনই মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারল না।

টেকনোক্র্যাট ম্যানেজার পরীক্ষায় ফেল করার পর একবার আনা হল ব্যুরোক্র্যাট এক চেয়ারম্যানকে। নির্মাণবিদরা কারিগরিতে হতে পারে পারদর্শী। তারা আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোঝে না। তাই চাই ব্যুরোক্র্যাট সি এম ডি। মন্ত্রীমহোদয় ছিলেন উদারচেতা। যা ভাবনা, তাই কাজ। নয়া পথ তো কাউকে দেখাতেই হবে। হোয়াই নট হিম। অভিনন্দন সাহেবের মতো তিনিও এসেছিলেন মৃগয়ায়। এই রামনগরের বন ছিল তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। পার্সোন্যাল ম্যানেজার তখন মকবুল মিঞা। মিঞার অনেক আধিপত্য। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ তার পকেটে। কালেকটর সাহেব তার জিগরী দোস্ত।

নতুন চেয়ারম্যান পদ্মলোচন এলেন রামনগর কারখানায়। জটায়ু গেস্ট হাউজে তাঁকে ছেঁকে ধরলো ইউনিয়নের নেতারা। শিউমঙ্গল সিংহ শ্রমিক নেতা। কারখানার ওয়ার্কার না হয়েও শ্রমিক দরদী। স্থানীয় শ্রমিকের মুখপাত্র। সবাই মান্য করে। বিনা বেতনে অশিক্ষিত মজুরদের জন্য লড়াই করে। দাবীদাওয়া আদায় করার জুড়ি নেই তার। নেতাজীর, মানে স্থানীয় লীডারজীর, রুটির

চিন্তা নেই। পরের মঙ্গলে আত্মনিয়োগেই তার আনন্দ। প্রত্যেক সভ্য মাইনের দিন সামান্য চাঁদা তুলে দেয় তাকে। একটা মুখের কিইবা চাহিদা? শিউমঙ্গলজীর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃন্দাবনে প্লেসে সবার জ্ঞাত। এম পি সাহেবের এক নম্বর দোস্ত। জনপ্রতিনিধিকে ভোটে জিতিয়ে দিল্লীর দরবারে পেঁাছে দেওয়া লীডারজীর প্রধান কাজ। এম পি সাহেবও গিভ অ্যাণ্ড টেক পলিসিতে বিশ্বাসী। ভোট ব্যাঙ্কের গ্যারাণ্টারকে খুশী রাখতেই হয়। রাজনীতির এটাই ধর্ম। রাজনীতি এম পি সাহেবের পেশা। আর কারখানার কর্মীকূলে যজমানি করা লীডারজীর নেশা।

জটায়ু গেস্ট হাউজের সামনে চলছে এক উত্তেজনার নাটক। পদ্মলোচন সাহেবকে ঘিরে রেখেছে শিউমঙ্গলের চেলারা। তাঁকে বাগে আনতে হবে। দাবী আদায়ের এই হল পরমমুহূর্ত। সেই দাবী সনদের শীর্ষে হল ম্যান-পাওয়ার। বেশ কিছু নতুন নিয়োগের দাবী। নতুন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যাণ্ট হয়েছে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরহের উদ্দেশ্যে। রাজ্য সরকারের থার্মাল পাওয়ার খুবই গণ্ডগোলের ব্যাপার। ভরসা নেই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের। বিনা নোটিশে বিগড়ে যায়। সরবরাহ বন্ধ মানেই উৎপাদনে আঘাত। তাই লীডারজী আদায় করেছে আশী কোটি টাকার সি পি পি। সেই প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজন নতুন এক দল শ্রমিক। এরা করবে সি পি পি-র রক্ষণাবেক্ষণ। লীডারজী দীর্ঘদিন তার সভ্যদের লোভ দেখিয়ে রেখেছে। কোনো চিন্তা নেই। ভাই ভাতিজার নাম লিখে রাখ। নতুন চাকরী হল বলে। একবার সি এম ডিকো ইধার আনে দো। তব দেখেঙ্গে। এবার সেই সুবর্ণ সুযোগ।

লীডার শিউমঙ্গলজী খাঁটি রাষ্ট্রভাষায় কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন পদ্মলোচনের সঙ্গে। বাইরে চলছে 'দেনে হোগা, দেনে হোগা' স্লোগানের ঐকতান সঙ্গীত। ইনকেলাব, জিন্দাবাদ! 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' চিৎকারে টাউনশীপ ঝালাপালা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পাখীরা ঘরে ফিরতে পাচ্ছে না। আগুন লাগবে।

সে আতঙ্ক পক্ষীকুলের সামনে ভাসমান। সুন্দর সাজানো তরুবীথিতে ওরা আরামে ঘরসংসার করে। কিন্তু আজকের এই দাবীদাওয়ার বীভৎস্য চিৎকারে সমস্ত পরিবেশ শঙ্কিত। ভীত সন্ত্রস্ত সবার মন। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। অবশেষে সি এম ডি রাজী হলেন এক সমাধানে। লীডারজীর দাবী মোট একশ নব্বই জন নতুন শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। শবজী বাজারের দর কষাকষির পর স্থির হল মোট একশ ষাট জন লোককে নিয়োগ করা যেতে পারে।

চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মতির হাসি দেখে লীডারজী হাঁক দিল, হে বাবুয়া। তানি কলমোয়া লে আও।

কথা তো সবই পাকা। তবুও ব্যাপারটা লিখিতভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়। বলা তো যায় না, দিল্লী ফিরে সাহেব হয়তো সুর পাল্টাতে পারেন। তার কথাই মেনে নিলেন পদ্মলোচন সাহেব। এইসব সই-সাবুদের দায়িত্ব দিলেন রামনগরের পি এম মকবুল মিঞার ওপর।

সি এম ডির সইকরা চুক্তিপত্র পকেটে পুরে শিউমঙ্গলজী পার্টি অফিসে ফিরল। ঠিক ঠিক বলতে গেলে বলা উচিৎ ইউনিয়ন অফিসে বিজয়ী আলেকজাণ্ডার তাঁবু গাড়লো। লীডারজীর পকেটে সেই মহামূল্যবাণ দলিল। ইউনিয়নের কর্মিরা সারা রাত তাকে ঘিরে রাখলো। অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকল সারারাত।

কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল একশ ষাটের জীবনে। এবং এই নিয়োগ নিয়েই দ্বিতীয় নাটক। স্বয়ং ডি জি এম থেকে শুরু করে চীফ এনজিনীয়ার, পার্সোনাল অফিসার এর ভাগীদার। এমন কি জুনিয়ার পিয়ারো পর্যন্ত একটা কোটা পেল। সেই কোটায় ভর্তি করার সুবাদে অনেকের পকেট হল গর্ভবতী। কিন্তু সি পি পি চালনার জন্য লোক নেই। দক্ষিণা দিয়ে যারা মাস্টার রোলে নাম তুলেছে তাদের চিন্তা কতদিনে উঠবে সেই সেলামীর টাকা। বিনিয়োগ করা অর্থ নিজের ঘরে ফেরানোর জন্য প্রয়োজন ওভারটাইম। ওটি আর ওটি। ওটির স্বপ্নে সবাই

তখন বিভোর। মিথ্যা ওটির ভারে ন্যুব্জপ্রায় কারখানায় উৎপাদন শূন্য। কাঁচামাল কেনার পয়সা নেই। বৃন্দাবন প্রেস থেকে ভর্তুকির টাকা যা আসছে তা মাসের মাইনে এবং ওটির খাতেই নিঃশেষ।

পদ্মলোচন সাহেব ষান্মাসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর বিদায় নিলেন। এসব খবর অভিনন্দন সাহেবের জানা। সব তথ্য সংগ্রহ করেই তিনি এসেছেন রামনগরে। ব্রজবাসী দাস যতই পার্সোন্যাল ম্যানেজমেণ্টের থিওরী কপ্‌চাক না কেন ভাব ভোলবার নয়। সি এম ডি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন ডি জি এমকে।

মিস্টার রামকমল সিং, তোমার নতুন নিয়োগ করা কুমীরছানাগুলো গেল কোথায়? তুমি কি মনে কর সি বি আই এসে প্লাণ্ট চালাবে। দীস ইজ অ্যানাদার বোফর্স ডীল। আর ইউ রিয়ালী ক্লেভার, অর ওভার গ্রীডি?

চ্যালেঞ্জ করা সব বাক্যবাণে রামনগরের ঐতিহ্য, পরম্পরা সব ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন চেয়ারম্যান সাহেব। আসলে তিনি নিজেও জানেন, সময় তাঁর সংক্ষিপ্ত। এবং সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এইসব ডেসপারেট ডাকাতগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে। পণ্ডিতজীর স্বপ্নের মন্দিরগুলো অনাচারে ধ্বংস হয়ে যাবে তা সহ্য করা যায় না। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান কি শুধু স্বজন পোষণের আখড়া হয়ে থাকবে? সঠিক সমাধান তস্য বংশধরও জানেন না।

রামকমলের ইমেজটাকে একটু মর্যাদার প্রলেপ দেবার প্রয়াসে উঠে দাঁড়ালেন চীফ ইলেট্রিক্যাল মিস্টার মেওয়ালাল।

স্যর, ইটজ নট ম্যান পাওয়ার। ইটজ ডিউ টু ব্যাড কোয়ালিটি অফ কোলস্‌। পাথুরে কয়লার ওপর দোষ চাপিয়েও সি পি পির বদনাম ঘোচানো গেল না। কাঁচামালের প্রসঙ্গ উঠতেই সাহেবের চোখ মুভি ক্যামেরার মতো ঘুরে গেল পঞ্চানন নন্দীর দিকে।

নাউ টেল মী মিস্টার নন্দী, হোয়াট ইজ ইয়োর স্টোরী? ইনভেনট্রি

ঠিকমতো রাখা হচ্ছে তো? আমার কাছে খবর আছে তুমি ব্যস্ত আছ সত্তর লক্ষ টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রির ফন্দিতে। আমি কি ঠিক বলছি, না ভুল? ইফ নট, প্লীজ কারেক্ট মী। তুমি উনিশ ঘাটের জল খেয়ে এসেছ এই রামনগরে। অনেক সাগরে মহাসাগরে সাঁতার কেটে কেন যেন এখানকার ডোবাতে ডুবতে এসেছ তা ঈশ্বর জানেন। নিশ্চয়ই তোমার কাছে খবর ছিল রামনগর এক স্বর্ণখনি। দেখ বাবা, কারখানাটাকে শেষ পর্যন্ত নিলামে তুলো না। মিনিস্ট্রি থেকে ভর্তুকি আদায়ের সময় অন্ততঃ কারখানার শেডগুলো তো দেখাতে হবে।

অভিনন্দন সাহেব যেন মানস নেত্রে দেখতে পাচ্ছেন এই কোম্পানীর কোনো সম্ভাবনা নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার কোনো লক্ষণ নেই সুদূর ভবিষ্যতে। এই কারখানার উৎপাদিত সারে কোনো-দিনই উদ্ভিদের খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হবে না। দেশকে কৃষিক্ষেত্রে সয়ম্ভর করার প্রসঙ্গটাই শুধু বাক্ চাতুরী। কারখানার সবকিছু ঝাঁঝরা করে রেখেছে। কর্মীদের ওপর সব দোষ চাপানোর জন্য ম্যানেজারগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ওয়ার্কাররা লুটছে ওটির টাকা আর ম্যানেজার ম্যানেজ করছে সাপ্লায়ারের কাছ থেকে কিক-ব্যাক্। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকে যৌবনের ইতিহাস ওঁর কাছে এক মাইক্রো ফিল্মে ধরা পড়েছে। চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছেন। যা দেখছেন তারই ধারা বিবরণী দিচ্ছেন। নির্মলকুমার কোনো সুযোগই পাচ্ছেন না মুখ খোলার।

সি এম ডির মনোলগ থামতেই চাইছে না। তিনিই প্রশ্নকর্তা আবার নিজেই উত্তরদাতা। প্রতিটি বিভাগীয় প্রধান এক অদ্ভুত জাদুবলে বোবা হয়ে গেছে। অথবা তাদের হাঁড়ির খবর এত পুংখানুপুংখভাবে বলছেন যে তার কোনো উত্তর নেই। প্রতিবাদ করার সৎসাহস নেই। সকাল আটটায় আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন প্রায় বেলা দুটো। মাঝে দু রাউণ্ড চা বিস্কুট জুটেছে। নাটকীয় সংঘাত মুহূর্তে একটু ড্রামাটিক রিলিফ চাই।

মঞ্চে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে নির্মলকুমার বল্লেন, স্যর। লেট আস হ্যাভ আ ব্রেক। লানচ ইজ রেডী।

অনুরোধে সাড়া দিতে সভা হলো ভঙ্গ। তারপর গাড়ীর কনভয় চললো জটায়ুর পথে। প্রথমে সিকিউরিটির লোক। তাদের জীপ সাইরেন বাজিয়ে পথ বিপদ মুক্ত করছে। ভি আই পির নিরাপত্তার জন্য সবাই সতর্ক। তাদের জীপের পেছনে ভি আই পি কার। বসেছেন স্বয়ং চেয়ারম্যান এবং তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন নির্মলকুমার। ভি আই পি কার অনুসরণ করে চলেছে আরো এক ডজন অ্যাম্বাস্যাডার। যারা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মাসিক পাঁচশ টাকা শকট-ভাতা আদায় করে আজ তাদের গাড়ীর প্রদর্শনী। সি এম ডি কে দেখাতেই হবে তারা ফাঁকিবাজ নয়। গাড়ী আছে তাই ভাতা দাবী করে। সে এক দৃশ্য! সার কোম্পানীর সাহেবরা চলেছে লানচে। আরেকটি ভোজনবিলাস পর্ব সমাধা হবে। সবই সরকারী খরচে। চেয়ারম্যানের সম্মানে ভোজসভা। খাবারের লোভ অপেক্ষা মর্যাদার প্রসঙ্গই এখানে প্রধান। লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষুক সমালোচকের দল। বিরাট দেশের একশ কোটি লোকের ঘাড়ে এই ক্ষতির বোঝা কতটুকুই বা?

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা কে? দেশের জনগণ, না চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টার? ভগবানের প্রতিনিধি রাজা অথবা আধুনিক মন্ত্রী। মন্ত্রীর যন্ত্রী হলেন সি এম ডি। একজন ডেমিগড্। সেই ডিমেগড সি এম ডি অভিনন্দন সাহেব অভিসারে এসেছেন রামনগরে। অভিসারে না বলে বলা ভাল অভিযানে। কারখানা পরিদর্শনের নামে রামনগর দর্শন তাঁর উদ্দেশ্য। সারা পাড়াতেই হৈ চৈ। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার সফর সূচীতে বেশ নাড়াচাড়া করে দিলেন স্টাফদের। আবার চলে গেলেন বীর বিক্রমে। দুদিনের সেই সফর সূচীতে খানা-পিনা, সভা-আলোচনা, বক্তৃতা-তিক্ততা সবই ছিল। খুদে কেরাণী থেকে মায় ডি জি এম পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল তাঁর বিদায়ে। সবার মুখে এক কথা। এতদিন পর এই রুগ্ন কারখানার চিকিৎসার জন্য এসেছেন বড় মাপের এক ডাক্তার। নতুন প্রাণের সঞ্চারেই তাঁর আবির্ভাব। একজন যোগ্য শাসক বটে। বাঘের বাচ্চা না বলে বাঘের বাপ বলাই বাঞ্ছনীয়। দেখলেই ভয় হয় এই বুঝি

হালহুদ্দ করলো। কারখানার নাড়ী-নক্ষত্র একেবারে নখদর্পণে। স্বল্প সময়ের জন্য কারখানা পরিদর্শনেই ধরে ফেলেছেন আসল রোগটা কি। বিধান রায়ের মতো রোগীকে স্পর্শ না করেই রোগ বলে দিলেন। দক্ষ রোগ নির্ণয়কারী।

অভিনন্দন সাহেব দক্ষ কারিগর। কোথায় কোন্ এলবো-পাইপ ফুটো আছে তা শব্দ শুনেই বলে দেন। চিমনীর ধোঁওয়ার কালো রঙ দেখেই বলে দিতে পারেন কয়লার কোয়ালিটি কি ? ইউরিয়া প্লাণ্টের পাম্পে একটি ছোট্ট নাট ঢুকিয়ে সাবোতাজ করার কৌশলকে ধরে ফেলেন জাদুকরের ভঙ্গিতে। খুঁটিনাটি সব মন্তব্য শুনে বিভাগীয় প্রধানদের প্রাণ কেঁপে ওঠে। ওই যে সি পি পি, যার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে একশ ষাট জন নতুন কর্মকুশলী সেই প্লাণ্ট আজ অচল। পি এম ব্রজবাসী দাস তার পানাগড়-মার্কা ইংরেজিতে বোঝাতে চেষ্টা করে পুরো ব্যাপারটা। কিন্তু সি এম ডি অবিচল আছেন তাঁর সিদ্ধান্তে। তিনি বুঝে গেছেন, এ ব্যাটা বৃথাই সাফাই গাইছে। আসল গুড় খেয়ে গেছে মকবুল মিঞা। শুধু মকবুলই নয়। তার সঙ্গে ছিল আরো অনেক বুলবুলি। সবাই ধান খেয়েছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার বৃথা চেষ্টা ব্রজবাসীর।

চেয়ারম্যান জেনে গেছেন একশ ষাটের গুহ্য কথা। প্রত্যেকটি পদের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা। পঁচিশ ইনটু একশ ষাট। ভাবা যায় না টাকার পাহাড়টা কত উঁচু হবে। ঐ সমবেত অর্থ একত্রিত করলে কি না হতে পারে ? সংঘবদ্ধ হয়ে সমবায় গঠন করলে ঐ অর্থে তেঘরায় একটি মিনি ফ্যাক্টরী হতে পারে। মকবুল মিঞা নবাবী স্টাইলে চলছিল। ওর জানা ছিল না রামনগর এ অঞ্চলের কুখ্যাত ধান্দাবাজের জায়গা। শেষ পর্যন্ত কাটিহারের কয়েদখানায় হাজতবাস. পুরো পাঁচটি মাস লপ্সি ভক্ষণ আর স্মৃতি রোমন্থন। কিই বা করার আছে ?

সবই নিয়তি। নিয়তির বিধানই সর্বশেষ সমাধান। নিয়তি মানুষকে পাপের পথে টানবেই। মকবুল মিঞার ওপর অভিশাপ লেগেছে। পান্থনিবাসের পোর্টিকোর নীচে বসে বৃদ্ধ মুচি

মঙ্গারাম সর্বদাই শাপ দিচ্ছে ওকে। অশীতিপর বৃদ্ধ মঙ্গারামের অভিশাপে যেন সর্প দংশনের জ্বালা। মঙ্গারাম বৃদ্ধ হয়ে এসেছে। মৃত্যু জারী করেছে নোটীশ। তবুও আশা। শুধু আশা নিয়ে বেঁচে আছে যদি ছেলেটার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। কিন্তু অদৃষ্টের দেবতা অন্তরালে অবস্থান করেন। আড়ালে বসেই সব পর্যবেক্ষণ করেন। মুচ্‌কি হাসেন আশার ছলনায় প্রলুব্ধ মানুষের সীমাহীন স্বপ্নের কথা ভেবে।

মঙ্গারাম বড্ড বেশী আশা করেছিল। সে আশা করেছিল তার সপ্তম সন্তান ফালতু নিশ্চয়ই একটা কাজ পেয়ে যাবে। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে দলিতদের জন্য বিশেষ কোটায় স্থান তার। চাকরী হবেই। সেই আশাতেই মকবুল মিঞার বাংলোয় কাজে ঢুকিয়েছিল মঙ্গারাম। কোনো মাইনে নয়। শুধু একটি প্রবেশপত্রের আশায় ফালতু লেগেছিল একাগ্রভাবে। সকালে বিকেলে খেতে দেবে আর রাতে আউট হাউজে শোবে। মাস গেলে বেতন নয়। চাকরীর কোনো চুক্তিও নয়। শুধুই বেগার খাটা। ক্রীতদাস নয় তবুও বিনিপয়সার গোলাম। শুধু মনে ছিল ক্ষীণ আশা। আশা নয়, প্রত্যাশা। এত সেবা, এত অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে একটা পাকা চাকরী। এই চাকরী মকবুল মিঞার হাতের ময়লা। এতবড় প্রতিষ্ঠানে ফালতুর একটা কাজ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। তাই তো মিঞা সাহেবের বাংলোয় দিবারাত্রির খিতমতগারী।

দরিদ্র নারায়ণ আজ সমাজ থেকে পলাতক। একশ ষাটের লিস্টে ফালতুর নাম ওঠেনি। বৃদ্ধ মঙ্গারাম অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিল। ওর ছিল অনুরোধ করার ক্ষমতা আর নয়ন ভরা জল। গরীব মুচির কাছে পঁচিশ হাজার সংখ্যাটাই এক দুঃস্বপ্ন। কোত্থেকে পাবে ঐ টাকা? কে হবে এই বিশাল অঙ্কের জামিন? ম্যানেজার পার্সোনেল মিস্টার মিঞা অবশ্য ওর জন্য দরটা একটু কমিয়ে বলেছিল। ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট কন্‌সেশন্‌। মাত্র বারো হাজারের অফার দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় পাবে সেই মোটা অংকের টাকা। ফালতুর বাবা টাকার ব্যবস্থা করতে পারে নি। কাজটা হাতের কাছে এসেও ফস্‌কে গেল। মকবুল মিঞা ওর

জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে নি। মণ্ডল কমিশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভূমিহার আর ঠাকুরেরা সব চাকরী ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ওরা জানে, শুধু কোটার কেত্তন করলে চলবে না। টাকার হরিলুটও দিতে হবে। ভগবান শুধু সেবায় সন্তুষ্ট নন। গ্রহণেও আগ্রহী। আরে বাবা, এ হলো সোনার খনি। গোল্ড মাইন। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে একবার নাম লেখাতে পারলেই কেল্লা ফতে। ঐ পঁচিশ হাজার টাকা উঠে আসবে দু'বছরের মধ্যে। উপরি পাওনা কোম্পানীর পাকা বাড়ীতে বসবাসের সুযোগ। এক ডজন ভইসা পোষার মোওকা। দুধ বিক্রির মাধ্যমে মোটা লাভ। অধিকন্তু ওটি তো আছেই। যে নিয়েছে সেলামী সেই করবে সাহায্য। মানি বিগেটস্ মানি। টাকায় টাকা আনবে। ডি জি এম্ থেকে চীফ এনজিনীয়ার, কে না চায় সহজলভ্য এই সোনা? বখরা নিয়েছে বসেরা। প্রতিদানে আট ঘণ্টার ফলস্ ওটি সই করতেই হয়।

সবাই খেলো মধু কিন্তু কোপ পড়েছে মকবুল মিঞার ঘাড়ে। সিবিয়াই রেইড করলো বাংলো। পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ, দশ বোতল জনি ওয়াকার আর একটি চাইনিজ পিস্তলসহ ধরা পড়লো মিস্টার মিঞা। কট রেড-হ্যাণ্ডেড এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া। অবশেষে কাটিহারে রেল ভ্রমণ তথা জেল-গমন।

পুলিশ ভ্যানে ওঠার আগে সে আপশোস করে বলেছিল, যার জন্য করলাম চুরি, সেই বলে চোর। ওর জানা ছিল না পাশেই প্রবাহিত হচ্ছে গঙ্গা। গঙ্গাস্নানেই সব পাপ মুক্তি। যারা আজ ওকে হাজতবাসের বন্দোবস্ত করলো তারা আগামীকাল পুণ্যসলিলা গঙ্গায় অবগাহন করে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করবে। পতিত পাবনী গঙ্গা চিরদিনই পাপের গ্লানিকে বিধৌত করে।

*   *   *

অভিনন্দন সাহেবের ঝটিকা সফর শেষ হল। দিল্লী ফেরার সব বন্দোবস্ত পাকা। রামনগর থেকে যাতায়াত খুবই কষ্টের। সরাসরি কোনো বিমান যোগাযোগ নেই। যেতে হবে পাটলীপুত্র এবং

সেখান থেকে পালামের প্লেন। কাকভোরে রওনা দিলেন। সেই কাকভোরেও জি এম থেকে শুরু করে বিভাগীয় প্রধানদের ভীড়। জটায়ুর আঙিনায় সমবেত টেক্‌নোক্র্যাটের দল করজোড়ে দণ্ডায়মান। বিদায় সম্ভাষণের পালা। চেয়ারম্যান প্রথমেই যাবেন পাটলীপুত্র। সেখানে বিপণন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ব্রেকফাস্ট মিটিং। তারপর হোটেল মৌর্যে লান্‌চ সেরে দুপুরের বিমানে বৃন্দাবন গমন। নতুন পিয়ারো অশোককে অর্ডার করলেন নির্মলকুমার।

মিস্টার মিটরা। ইউ মাস্ট অ্যাকমপেনী সি এম্‌ ডি।

জনসংযোগের কাজই এমন ধরণের। বড় সাহেব বাথরুম যাবেন। পিয়ারোকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কমোডের ফ্লাশ কাজ করছে কিনা। টয়লেট রোল যথাস্থানে আছে তো? যদি থাকেও তবে তা কোন্‌ কোম্পানীর? টিস্যুগুলো যথেষ্ট নরম তো? জি এম্‌ কিছুতেই ঝুঁকি নিতে নারাজ। আগের দিন রাতেই বলে রেখেছেন,

আরে ভাই মিটরা। তুম্‌ভি চলো সাব্‌কো সাথ।

অশোক জানে তার কাজই হলো বড়ো সাহেবদের লেজ ধরে ঘোরা। সেই সঙ্গদান সব সময় আরামের না হতেও পারে। মাঝে মাঝে লাথিও জুটতে পারে ভাগ্যে। বিগ বসের মুড, মর্জি আর মেজাজ পাহাড়ী বৃষ্টির মতো। আন্‌প্রেডিক্‌টেবল্‌। শুধু অশোকই নয়। আরো একজন এসকর্ট আছে এই টীমে। রিজিওন্যাল ম্যানেজার মিস্টার ভাস্করণ। ওর সুবিধা হলো তামিল ভাষায় কথা বলে সাহেবের মন বুঝতে পারে। অপরদিকে স্থানীয় অফিসারদের নিন্দা, কেচ্ছা অবলীলাক্রমে কানে তোলা সহজ। মাতৃভাষা এক্ষেত্রে সিক্রেট কোডের সাহায্য করবে।

সকালে এক রাউণ্ড বেড-টী নিয়ে ভি আই পি কন্‌ভয় রওনা দিয়েছে পাটলীপুত্রের পথে। জিরো মাইল থেকে কতটুকুই বা পথ। বড় জোর একশ কিলোমিটার। পথে পড়লো রাজেন্দ্র সেতু। গঙ্গার ওপর দোতলা সেতু এক জাতীয় সম্পদ। প্রথম

রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত এই সুবিশাল সেতু। অভিনন্দন সাহেবের ইচ্ছা সূর্যোদয় মুহূর্তে গঙ্গাস্নান করা। ভাস্করণ কি আগেই জানতো যে সাহেব শীতের সকালেও গঙ্গাস্নান করবেন। ও দু-খানা নতুন তোয়ালে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সি এম্ ডি গঙ্গায় অবগাহনের ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বললো, ড্রাইভার। গাড়ী রোকিয়ে!

অভিনন্দন সাহেব বম্বে ডাইং এর তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে চল্লেন গঙ্গার ঘাটে। সঙ্গে চলেছেন আরেক ধর্মপ্রাণ পুরুষ। মিস্টার ভার্মা। সে এক মজার দৃশ্য। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের পয়লা নম্বর, দুসরা নম্বর, এমন কি তিসরা নম্বর চলেছেন গঙ্গাস্নানে। এ যেন রথ দেখা আর কলা বেচার কাহিনী। সরকারী খরচে সফর, উপরিলাভ পুণ্যসলিলা গঙ্গায় অবগাহনের সুবর্ণ সুযোগ। মা গঙ্গা কি বর দান করবেন তা তিনিই জানেন। তবে ভক্তের একাগ্রতায় নেই কোন ত্রুটি।

সিমারিয়া ঘাটে গঙ্গার ধারে হাজারো লোকের ভীড়। ভীড়ের ঘনত্ব বাড়িয়েছে যে জনতা তাদের অধিকাংশই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা। বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে তারা এসেছে গঙ্গাস্নান করতে। হয়তো বা গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায়। সারা বছরের মধ্যে কার্তিক মাসটা বড়ই পয়া। এই সময়েই বর্ষীয়ানদের এই ঘাটে আগমন এবং মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা। পরপারের প্রতীক্ষায় সবাই সময় গুণছে। আসন্ন কার্তিক পূর্ণিমার শুভ লগ্নে নিজেদের আত্মসমর্পণ করবে। এ বড়ো ভাগ্যের কথা যদি এখান থেকে ঘরে ফিরতে না হয়। স্বয়ং গঙ্গা যাকে কোলে তুলে নেবেন তার মতো পুণ্যবান আর কে হতে পারে? সিমারিয়া ঘাটে দেহ রাখতে তাই অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সারা বছরের প্রতীক্ষা। প্রতিদিনের পরিকল্পনা। তারা অনেকে স্বেচ্ছায় এসেছে আবার অনেককে আনা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে।

বাবা-মা বুড়ো হয়েছে। তাদের কর্মক্ষমতা সমাপ্ত। উপার্জন ক্ষমতাও শূন্য। তাই অযথা অকারণে কেন অন্নধ্বংস। শুধু রুটির ব্যবস্থাই তো নয়? তৎসহ আছে বার্ধক্যের ব্যাধি। জড়া ব্যাধিতে জড়ি বুটির চিকিৎসা। খরচ হয়ই। এবং তা বহন

করার দায়িত্ব পুত্রকন্যার। বুড়ো বুড়ীর কষ্ট সহ্য করা যায় না। প্রতিষ্ঠিত আত্মজেরা তাই পিতামাতার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে। কার্তিক মাসের শূন্য ডিগ্রী শীতে তাদের এনে জড়ো করা হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গার তীরে তাঁবু পড়েছে একমাসের জন্য।

কার্তিক মাসে সিমারিয়া ঘাটে যেন এক যুদ্ধ শিবিরের শোভা। শিবিরে আছে সেইসব যোদ্ধা যারা জীবনযুদ্ধে অবসর গ্রহণ করে অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চায়। এখানেও যুদ্ধ। সে যুদ্ধ শীতের, অসহনীয় আবহাওয়ার সঙ্গে তথা আত্মজ-আত্মজার মানসিকতার বিরুদ্ধে। জীবনের প্রতি মমতা প্রতিটি জীবের মধ্যে বিদ্যমান। তবুও মৃত্যুকে বরণ করতেই হয়। সে মৃত্যু যদি ধর্মের মোড়কে রাখা যায় তাই বা মন্দ কি? মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণাম নয়। তার চেয়েও পরম প্রাপ্তি গঙ্গালাভ।

সিমারিয়া ঘাটে কার্তিক মাসের মেলা বসেছে। সে মেলাও পরপারের যাত্রীদের ভীড়ে মুখরিত। এতো কার্তিকী-মেলা নয়, এ যেন বয়োজ্যেষ্ঠদের বিদায় সম্বর্ধনা। হৈ হট্টগোল, লুচি পুরি তরকারী আর গরমাগরম জিলিপীর এক মহোৎসব। তৎসহ ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকজন ফচ্‌কে ব্রাহ্মণ। বলপূর্বক পুজো আদায়ের ফন্দিতে তারা ব্যস্ত। গঙ্গামাইকো পুজো দেওয়ার জন্য কতোই না পীড়াপীড়ি। অশোকের কৌতূহল অভিনন্দন সাহেবের গঙ্গাস্নান নয়। কার্তিক পূর্ণিমার অন্তরালে মৃত্যুবরণের যে প্রহসন চলেছে তা জানার আগ্রহে উৎসুক ওর মন।

বানোয়ারীলাল কোম্পানীর অভিজ্ঞ ড্রাইভার। বাড়ী দ্বারভাঙ্গায় হলেও বেশ পরিষ্কার বাংলা বলে। ওখানকার অধিবাসীরা কোনোদিন কি বাঙালী ছিল? মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার এমন মিল অশোকের মনে নানা জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে। বাঙালী কবিও তো মৈথিলীতে কবিতা রচনা করে অমর হয়েছেন। বানোয়ারীলালের অভিজ্ঞতার আলোকে অশোক হয়েছে আলোকিত। সিমারিয়া ঘাটের মৃত্যু যজ্ঞের সামাজিক তৎপর্য ওর মুখেই শুনেছে সে। শোনা যায় আসামের জাটিঙ্গায় পাখীরা সমবেত হয় স্বেচ্ছা মৃত্যুর উদ্দেশ্যে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে

পাখীরা আসে জীবন বিসর্জন দিতে। আত্মহত্যায় টানতে চায় জীবনের ইতি। জাটিঙ্গার পাখীদের মৃত্যুবরণের সঙ্গে সিমারিয়া ঘাটের কি কোনো মিল আছে? অথবা বিশ্বসাংসারের প্রয়োজন মিটে গেলে প্রকৃতি নিজেই গ্রহণ করে আপন সন্তানকে। জিজ্ঞাসা জেগেই থাকে।

এপারে সিমারিয়া, ওপারে মোকামা। মধ্যিখানে প্রবাহিত পতিত পাবনী গঙ্গা। কয়েক বছর আগে লোকে নৌকোয় গঙ্গা পার হতো। তারপর এলো স্টীমার। দেশ হলো স্বাধীন। যোগাযোগের প্রথম সোপান তৈরী হলো সেতু নির্মাণ মাধ্যমে। তৈরী হলো বিরাট, বিশাল পুল। রাজেন্দ্র সেতু। প্রতিবছর কার্তিক মেলা বসে সিমারিয়া ঘাটে। কবে থেকে এই মেলার শুরু তা কেউই সঠিক জানে না। তবে এই উপলক্ষে বিহারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা জড়ো হয় এখানে। কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্যপর্বে গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা যেন দেবতার আশীর্বাদ। আধুনিক অপত্যরা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক স্বার্থে, বৃদ্ধা পিতামাতাকে নিয়ে আসে সিমারিয়ায়। সিমারিয়া মানেই মৃত্যুর পদধ্বনি।

চলো সিমারিয়া যেন জীবনের ক্লোজিং সঙ্। সারা পাড়া প্রতিবেশী, পরিচিত সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা আসে এখানে সিমারিয়া তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে তুলে ধরা হয় স্বর্গের এক মনোরম ছবি। সেখানে নেই হিংসা, নেই দ্বেষ। ঈর্ষা বিবর্জিত সে এক স্বপ্নের দেশ। মা গঙ্গা তাঁর নরম কোল পেতে বসে আছেন। ফ্রিজিং পয়েণ্ট ঠাণ্ডায় অতিবৃদ্ধ কাউকে দু তিনবার স্নান করাতে পারলেই তাদের গঙ্গাপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ওখানে সাজানো আছে শ্মশান। শুধু মুখাগ্নির পর দাহ করলেই দেহ ভষ্ম বিলীন হয়ে যাবে গঙ্গাবক্ষে। দরকার নেই চিকিৎসার। প্রয়োজন হবে না ডাক্তারের ডেথ-সার্টিফিকেট। গ্রামের দু-একজন প্রচার করে দেবে সেই মহামৃত্যু সংবাদ। এতো সাধারণ খবর নয়, রীতিমতো সুখবর। কার্তিকী পূর্ণিমায় দেহান্ত মানেই বহুবছরের পুন্যের ফল। গঙ্গামাই কি সবাইকে গ্রহণ করে? কেবল ভাগ্যবানেরাই ভগবানের

ডাক শুনতে পায়। গ্রামের কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। সত্যিই মারা গেছে কিনা তা কেউ প্রশ্ন তুলবে না।

একটানা তিরিশ দিনের গঙ্গাস্নানেও যদি প্রাণ টিকে থাকে তবে তাকে পাপী ছাড়া কিই বা বলা যেতে পারে। যমের অরুচি যার ওপর পুত্রকন্যার দুর্ব্যবহার তার অবশ্যই প্রাপ্য। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে পুত্র-কন্যারা মমতাবশতঃ ততটা নিষ্ঠুর হতে পারেনি। তাই নাতি-নাতনীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নানা-নানীর গঙ্গা-প্রাপ্তির তদ্বিরে। সেইসব পোতা-পোতীর দল বৃদ্ধ ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে বোঝাতে শুরু করে জীবন-দর্শন।

নানাজী, তোমার খেল খতম্। জীবনের ক্রিকেট খেলায় তুমি অনেক ইনিংস খেলেছ। অনেক রান নিয়েছ। এবার তোমার প্যাভেলিয়ানে প্রত্যাবর্তনের সময় এসেছে। তোমার কর্তব্য শেষ। তোমার পুত্র আছে। আছে পুত্রী। তৎসহ আছে কয়েক ডজন পোতা-পোতী। তারা সামলাবে সংসারের সমস্যা। তুমি যদি বরাবরের মতো মঞ্চ দখল করে থাক তবে তারা তো কোনো সুযোগই পাবে না। এবার তোমার পরপারে প্রস্থান করাই মঙ্গল।

সেদিক থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পরম পুণ্যলগ্ন। কোনো কোনো বৃদ্ধ এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও নিউমোনিয়াকে বুকের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে নি। অসীম জীবনীশক্তি নিয়ে ধুঁকছে গঙ্গাতীরে। তাদেব আর ঘরে ফিরিয়ে নেয় নি অপত্যের দল। স্বয়ং গঙ্গাদেবী যাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক সেই অমঙ্গলের চিহ্নকে ঘরে ফেরানোর সাহস নেই তাদের। কিই বা লাভ? অভিনন্দন সাহেব যখন তাঁর দুই সহকর্মীকে সঙ্গী করে কোমর জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাস্তোত্র পাঠে মগ্ন অশোক ততক্ষণ একাগ্রচিত্তে শুনছিল। শুনছিল বানোয়ারীলালের মুখ থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার পাঁচালী।

গঙ্গাস্নানান্তে চেয়ারম্যান সাহেব বসলেন গাড়ীতে। গাড়ী এবার পাটলীপুত্রের পথে ধাবমান। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই গান্ধী ময়দানে পেঁছতে হবে। ওখানে অপেক্ষা করছে বিশ্বনাথ প্রসাদ, জুনিয়ার পিয়ারো। সম্প্রতি প্রমোশন পেয়েছে। কাজে ভীষণ উদ্দমী। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের নতুন চেয়ারম্যানকে বরণ

করার পালা তার। মনা সিনেমার পাশে গাড়ীর কনভয় দাঁড়ালো। সে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ব্রেক-ফাস্ট মিটিং হলে।

প্রসাদ কাঁরিৎকর্মা ছেলে। আদর্শ জনসংযোগের লোক। প্রবীর বোসের নির্বাচন এবং এই বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা তার হাতে। কুমারী মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি কি করবে বা করতে হবে তা বৃদ্ধা ঠাকুমা শিখিয়ে দেন। স্বামী হলো সাক্ষাৎ নারায়ণ। তার মনোরঞ্জন, কামনা পূরণে কখন কি করতে হবে সে শিক্ষাও দিয়ে থাকেন ঠাকুমা-দিদিমারা। প্রবীর হলো বিশ্ব-পরিব্রাজক অনলকুমারের ছাত্র। জনসংযোগের প্রথম ও প্রধান কাজ কি সে শিক্ষা পেয়েছে গুরুর কাছ থেকে। বড়সাহেবকে রসেবশে রাখা পিয়ারোর প্রথম কর্তব্য। জনসংযোগের কাজে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন তাঁর আশীর্বাদ। দরকার পরিপূর্ণ সমর্থন। শুধু গাধার মতো খেটে যে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল না সে এক অপদার্থ জীব। জনসংযোগের কাজ তার জন্য নয়। কাজ করে, সমস্যার বা তাবরণ সৃষ্টি করে, জনসংযোগ অফিসারের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সেবাযত্ন করে তাঁদের সুনজরে থাকতে হবে। দেশে বিদেশে ভ্রমণের নেশায় ঘুরে বেড়ালেও অনলকুমার খাঁটি আগমার্কা ভারতীয়। এই আবহাওয়ায় যা মানায় সেই শিক্ষাই দিয়েছেন প্রবীরকে। বিশ্বনাথ প্রবীরের পাদোদক খাওয়া শিষ্য। কোলকাতায় আছে পয়লা নম্বর চামচে সমর সাহা। আর পাটলীপুত্রে মিস্টার প্রসাদ। সে জুনিয়ার হয়েও ওয়ার্কিং স্টাইলে অশোকের থেকে অনেক অ্যাডভান্স।

গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে সে অভিনন্দন সাহেবকে পদস্পর্শ করে প্রণাম করলো।

স্যার, ইউ আর নট ওনলী আওয়ার সি এম্ ডি। ইউ আর আ ব্রাহমিন অলসো। ওর বিনয় বন্দনা চললো আরো অনেক দূর। স্যার, আপনার দর্শনে আমার যত আনন্দ, আপনার পাদস্পর্শে ততোধিক পুণ্য। আমি ধন্য! হ্যাম আপকো পাটলীপুত্রমে সোয়াগত করতে হ্যায়।

প্রসাদের বলনে চলনে এক যোগ্য জনসংযোগ অফিসারের সব লক্ষণ প্রস্ফুটিত। অশোক বুঝতে পারে সে একজন মিস্‌ফিট। একেবারে বেমানান। এ কাজে প্রসাদের মুন্সিয়ানা আছে। ওরই শোভা পায় কোম্পানীর পিয়ারো সাজা। কোলকাতা থেকে বনবাসের কারণ স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠে অশোকের সামনে। প্রবীরের দুর্ব্যবহার, সমরের মোসাহেবী, লালতুর হুইস্পারিং ক্যাম্পেন সবকিছুর মধ্যেই যেন একটা ধারাবাহিকতা খুঁজে পায় সে। তার কর্মজীবনে বিরাট অভিশাপের অন্তরালে এরা সবাই সক্রিয়। অশোককে ওরা দলে টানতে চেয়েছিল। কিন্তু ইগো তাকে সর্বদা সতর্ক রেখেছে। প্রবীর এক বিষধর সাপ সে কথা ভালভাবেই অনুভব করেছে। কিছুই করার ছিল না। বিষধর সাপকে মেরে ফেলার ক্ষমতা তার নেই। শুধু দূরে দূরে থেকেছে। কিন্তু তবুও ওর বিষাক্ত নিঃশ্বাস অশোককে কাবু করেছে।

জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে। বেশী করে জানতে হবে। জানার কোনো শেষ নেই। প্রতিদিনই শিখতে হবে কর্তাভজার কারিগিরি। কোনো ব্যাপারে ব্যর্থ হলে চলবে না। হতে হবে সার্থক। পৃথিবীতে সবাই অমৃতের পুত্র। প্রসাদের মতো করিৎকর্মা পিয়ারো সাজাও এক অভিনব অভিনয়।

অশোক অন্য এক চিন্তার জগতে বিরাজ করছিল। হঠাৎ মিস্টার ভাস্করণের কথায় বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করতে হল। ততক্ষণে ব্রেক ফাস্ট-মিটিং শুরু হয়ে গেছে। অভিনন্দন সাহেব যথারীতি আসুরিক কায়দায় পূর্ববর্তী সব চেয়ারম্যানকে গাধা, শুয়োর এবং ততোধিক নিম্নমার্গের পশুশাবক বলে সম্বোধন মাধ্যমে ব্যক্তৃতা শুরু করেছেন। প্রতিষ্ঠানের অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোচনা করছেন। প্রতিটি কর্মচারীকে সংযমী হতে উপদেশ দিচ্ছেন। সংযম আনতে হবে অর্থব্যয়, বাক্যে এবং আচরণে। লোকসানী কোম্পানীর লোক হয়ে বিলাসিতা পোষায় না ইত্যাদি ইত্যাদি আগডম্ বাগডম্। সমবেত সব ডীলার, ডিস্ট্রিবিউটার এবং সেলস্ অফিসারের দল তাঁর ভাষণ শুনছে স্তব্ধ হয়ে।

সবাই জানে বস্ যা বলছেন তা মীন করছেন না। যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তবে বারো হাজারী বাড়ীতে থাকতেন না। চাপতেন না বাতানুকূল কন্টেসায়। ভাষণ দেওয়া তাঁর অধিকার। সেই অধিকার তিনি প্রয়োগ করছেন। এতে তাঁর দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। তিনি জানেন সমবেত সবাই চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী। চাকুরী জীবিরা চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ব্যবসায়ীরা তো মুনাফার লোভে মানবিকতা নামক অনুভূতিকে বহু আগেই বিসর্জন দিয়েছে। তারা কীটস্য কীট।

অধিক ফলন, বাড়তি লাভ, কৃষকের উন্নতি—সবই স্লোগান। অধিক ফলাও, দেশ বাঁচাও—এইসব স্লোগান শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন সংস্থার ক্যাচ্-ফ্রেজ। কোলকাতার ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাণ্ডারবোল্টের জলে গলা ভিজিয়ে তারা তৈরী করেছে 'কপি'। সেই কপির বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেবার ফন্দি। ভদ্রভাষায় যাকে বলা হয় প্রচার অভিযান। পাবলিসিটি ক্যাম্পেন। মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা পঞ্চাশভাগ জোটে অ্যাড-এজেন্সীগুলোর। সেই পঞ্চাশভাগের পুরোটাই কি হজম করতে পারে ওরা? মাঝ পথে অনেক দস্যুর হানা। পদে পদে ফাঁদ পাতা আছে খুচরো পেমেণ্টের। পাবলিসিটি ম্যানেজার বসে আছে ফাইভ পার্সেণ্টের লোভে। তারপর আছে বিলবাবু, ভাউচার ক্লার্ক এবং সবশেষে ক্যাশবাবুর প্যাঁচ। যথানিয়মে সেলামী না দিলে চেকবইতে কলমই ধরবে না ক্যাশিয়ার। অ্যাড-এজেন্সীর মালিক তাই ইচ্ছা করেই শূকরের চর্বিকে বনজ ঘি হিসেবে বাজারে প্রচার চালাচ্ছে। ব্যবসা যখন করতেই হবে তখন আর ঘোমটার নীচে খ্যামটার নাচ কেন?

বিজ্ঞাপন সংস্থার অ্যাকাউণ্টস্ ক্লার্ক সবকিছুর কস্টিং করেই এস্টিমেট পাঠায়। তবে হ্যাঁ, ওদের ব্যবহারের তারিফ করতেই হয়। সদ্য যেন নবদ্বীপ প্রত্যাগত এক গোঁসাই। বিনয়ের অবতার। অয়েল-কালচারে এক নম্বর মাস্টার। ওরা জানে আজকালকার দিনে চুটিয়ে ব্যবসা করতে হলে বিনয়ী ব্যবহার হলো তুরুপের তাস। ওরাই হলো সত্যিকারের পিয়ারো। প্রেম, প্রীতি যতই

প্রদর্শন করো আসলে চাই অর্থ। পয়সার নেশাতেই ব্যবসায়ীরা পাগল। ওরা স্বার্থের কথা স্মরণ করে সাত চড়েও রা করেনা। কোলকাতার ডাইনামিক এজেন্সী তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে পাটলীপুত্রে। সি এম্ ডির সভা কাভার করা চাই এনির্দেশ দিয়েছে প্রবীর। সে এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

প্রবীর খবরটা এস টি ডিতে জেনেছিল ঝাউতলায় বসে। বড়সাহেব পাটলীপুত্র যাবেন প্লেনে। খবর শোনামাত্র চামচা-বাবার ডাক পড়লো।

মিস্টার সাহা আপনি এক্ষুণি চলে যান ডাইনামিক অফিসে। সময় অপচয় করবেন না। এক্ষুণি খবর দিন লাড্ডুবাবুকে। হী মাস্ট ফ্লাই দিস ইভনিং। ওকে আজই পাটলীপুত্রে যেতে বলুন। মিস্টার প্রসাদ নতুনলোক। পিয়ার লাইনে অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু? সাহায্য করার জন্য লাড্ডুবাবু যেন অবশ্যই পজিশন নেয় গান্ধী ময়দানে। ওখান থেকে অভিনন্দন সাহেব মার্কেটিং কার্যকলাপের খোঁজ নেবেন। ওখান থেকেই আমাদের এলাকা। আমাদের দায়িত্ব। তার আগে সব বন্দোবস্ত রামনগরের ঘাড়ে। সেখানে রয়েছেন অশোক মিত্র। ফরগেট অ্যাবাউট হিম। ইউ মাস্ট ডু আওয়ার শোয়ার।

সমরের সমন পেয়ে লাড্ডুবাবু অ্যাটাচীতে পুরলো দশ হাজার টাকা। তারপর সান্ধ্য বিমানে পাটলীপুত্র। আই সি ৩০২ তে আসনের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে প্রবীর বোস। ওখানকার পিয়ারো অর্ধনারীশ্বর ওর এক গ্লাসের বন্ধু। গ্লাসে একটা ক্যাম্পা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে প্রবীর অভ্যস্ত। এইসব বন্ধুরা প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এবারও মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে টিকিট ম্যানেজ হয়ে গেল। লাড্ডুবাবু পাটলী-পুত্রে পোঁছেই পুরো ব্যবস্থার একটা সার্ভে করে নিল। লানচে স্কচ্ চলবে, না চিল্ড বীয়ার তা সঠিক জানা নেই। দুটোর বন্দোবস্তই রাখা হলো। আজকের সভার নাম ব্রেক-ফাস্ট মিটিং হলেও দুপুরে ইটিং এর ব্যবস্থা রাখতেই হলো। দুপুরে লান্চ সেরে সবাই চাপবেন উড়োজাহাজে। উড়বেন দিল্লীর

আকাশে। পাটলীপুত্রের আমেজটা যাতে পালামে টাচ্-ডাউনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে সেদিকে নজর রাখলো লাড্ডুবাবু।

ব্রেকফাস্ট মিটিং বেশ জমে উঠেছে। অভিনন্দন সাহেব জানেন অফেন্স ইজ দ্য বেণ্ট ডিফেন্স। আক্রমণই আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রথম অস্ত্র। পুরো সভাকে নিজের কব্জায় রেখে তিনি সবাইকে শাসন করলেন। দিলেন উপদেশ। প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার কথা ভেবে ব্যয় সঙ্কোচের হুশিয়ারী দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সভা হলো সাঙ্গ। এবার সাহেব আরাম করবেন ঘণ্টা খানেকের জন্য। ডাকবাংলোতে এক নম্বর কোঠায় প্রবেশ করলেন মিস্টার অভিনন্দন সদাশিবম্ মহালিঙ্গম। দ্য গ্রেট সি এম ডি অফ আ লুসিং কনসার্ন। এক নম্বর ঘর বরাবরের জন্য ভি আই পি রুম। সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এলে এখানেই অবসর বিনোদন করেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসন কর্তা। এ এস এম সাহেবই বা কম কিসের? তিনিও বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের শাসনকর্তা। ত্রাণকর্তাও বলা যেতে পারে। একটি ডুবন্ত জাহাজের কাণ্ডারীর দায়িত্বও তো কম নয়। তাঁকে পাটলীপুত্র শহরে ভেরী ইমপর্টেণ্ট পারসনের মর্যাদা দেওয়া স্বাভাবিক। মার্কেটিং ম্যানেজার মিস্টার ভাস্করণ জানে এই বিশেষ অভ্যর্থনার প্রসঙ্গটা ওর সার্ভিস রেকর্ডে স্থান পাবে। যে দেশে সামান্য টাকার বিনিময়ে একবেলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কামরা ব্যবহারের অধিকার পাওয়া যায় সেখানে সুযোগ না নেওয়াই বোকামী। বড় একজন একজিকিউটিভ হতে হলে বস্‌কে বশ করার ক্ষমতা থাকা চাই। যে দেবতার যেমন পুজো। পুষ্পে, পণ্যে, মদে অথবা মহিলা সরবরাহে—যে ভাবেই হোক না কেন, তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতেই হবে। এ এস এম্ সাহেব জীবনে একবারই পাটলীপুত্র পরিদর্শন করবেন। সেই সফরে কে কতোটা আপ্যায়ন করলো তা অবশ্যই তাঁর মনে থাকবে।

ভাস্করণের কর্মজীবনে এ এক অকল্পনীয় সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ! কোলকাতায় বসে ডি জি এম বিকিরণ ভট্টাচার্য যা করতে পারেন নি সুদূর পাটলীপুত্রে থেকেও ভাস্করণ তা আয়ত্ত

করেছে। বিধাননগরের লালতু চক্কোত্তি একবার আপশোষ করে বলেছিল, ভাস্করণ ওর অধীনে সেলস্ অফিসার ছিল। বর্তমানে সে ওর একধাপ ওপরে। কে বলতে পারে এই ভাস্করণই একদিন ওর বস্ হবে কিনা? লালতুর অনুমান নির্ভুল। ভাস্করণ অনেক গুণের অধিকারী। ব্যবহার ভালো, ইংরেজিতে দখল আছে আর সর্বোপরি বিশেষত্ব হলো কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলে না। ওর বস্ ভোলানোর কায়দা ঠিক সামরিক কৌশলে। স্যর, ইয়েস স্যর—এই সংক্ষিপ্ত দুটি শব্দ ব্যবহার করে ও বিশ্ব জয় করে নিতে পারে। সবাইকে আপন করতে জানে। কাজ আদায় করার কৌশল ওর করায়ত্ব। এ এস এম্ সাহেবের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে ও খ্যাতির তুঙ্গে উঠে গেল। ছিল মার্কেটিং ম্যানেজার, শীগগীরই প্রমোশন অর্ডার বের হলো। রাতারাতি চীফ মার্কেটিং ম্যানেজার। এবং তারপর সব প্রথাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে বনে গেল ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। ডক্টর বিকিরণ ভট্টাচার্যকে প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে উঠে এলো ঝাউতলার অফিসে।

বিকিরণ সাহেবকে বিশ্বাস নেই। সি এম ডি চান ওখানে একজন নির্ভরযোগ্য লোক। বাঙালীর মাঠে অবাঙালী খেলবে বেশ। ঝাউতলার অফিসে তলিয়ে গেলেন বিকিরণ সাহেব। সেখানে শুধুই ভাস্করণের জোয়ার। সবাই সেই নাম জপতে মগ্ন। জপের জোয়ারে এককালের মহাশিব হঠাৎ যেন একখণ্ড পাথর হয়ে গেলেন। বিকিরণ সাহেব তলিয়ে গেলেন সবার অন্তর থেকে। বিস্মৃতির অথৈ জলে নিমজ্জমান তিনি। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের এটাই ট্র্যাডিশন। অথবা কনভেনশন। বলা মুস্কিল। ভাস্করণ একদা ছিল সাধারণ একজন সেলস্ম্যান। অয়েল টেক্নোলজির প্রয়োগে প্রমোশন পেল ডি জি এম পদে। লালতু চক্কোত্তি এখন তাকেই স্যর বলে সম্বোধন করে। উপায় কি? চেয়ারের মর্যাদা দিতেই হয়। প্রটোকল ভাঙ্গা চলবে না। সব শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে তাহলে।

কলি, ঘোর কলি! লালতু বৃথা আপশোষ করে। বৃথা তার

কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা। অনর্থক কৃষি বিদ্যায় গবেষণা। সারা জীবন কষ্ট করে গেল। কিন্তু কেষ্ট মিললো না। তবুও গুরুদেবের কথাতেই সে সান্ত্বনা পায়। তিনি বলেছেন, যে পারে সে এমনি পারে, পারে গো ফুল ফোটাতে।

* * *

প্রচণ্ড ঝড়ের পর সমস্ত প্রকৃতিতে দেখা যায় এক শান্ত ভাব। রামনগরের সমগ্র পরিবেশে কেমন যেন এক নিস্তব্ধতা দেখা গেল। কর্পোরেট অফিসের বড় কর্তারা হৈ হৈ করে এসেছিলেন। আবার দুদিনের ঝটিকা সফর শেষে রৈ রৈ করে চলে গেছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কি উপকার হলো তা বোঝা গেল না। তবে নির্মলকুমার লাখ খানেক টাকা খরচ করে ফেল্লেন এই ভি আই পি ভিজিটকে কেন্দ্র করে। সব অফিসারই মহতের সান্নিধ্য পেয়েছে। ভূরি ভোজে তৃপ্ত হয়েছে। সে খাবার হজম হয়েছে কি? অভিনন্দন সাহেবের বকাবকিতে সে খাবার বদহজমে পরিণত হলো। সাহেব দিল্লী ফিরলেন বটে, কিন্তু সবার সামনে রেখে গেলেন আতঙ্কের ছায়া। এই বোধ হয় কোনো টেলেকস্ এলো। বদলীর অথবা বরখাস্তের। শংকা ঘিরে রাখলো তাদের ছন্দবন্ধ জীবনকে। চেয়ারম্যান মন্ত্রীর অভয় নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে পা রেখেছেন। কোম্পানীকে লাভের মুখ দেখাতে না পারলেও লোভী ম্যানেজারগুলোকে শাস্তি দিয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি কিছুতেই সমস্যার কূল কিনারা খুঁজে পাননা। একশ ষাটজন অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করেও ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট অচল। এম এম স্থানীয় জি এমের সঙ্গে সমঝোতা করে কোটি কোটি টাকার ইনভেনট্রি নিলামে বিক্রি করছে। প্রতি মাসে একশ এগার টন উৎপাদনের জন্য উনিশ লক্ষ টাকার ওটি। কেন? কেন এই অপচয়? কার স্বার্থে অথবা কোন্ চক্রান্তে এই কামধেনুর মৃত্যু পরোয়ানা?

এ এস এম্ সাহেব ভেবে পান না রামনগর কারখানায় এতো অনিয়ম কেন? স্থানীয় ওয়ার্কাররা ধরে নিয়েছে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কখনো কেউ আসবে না। হবে না এর সঠিক মূল্যায়ন।

কর্তৃপক্ষও নিজের ইচ্ছেমতো সব গুছিয়ে নিয়েছে। যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করে দিল্লী থেকে কেউ আসবে না কাজের পরিমাপ করতে। তাই মাথ তেল নাকে। ঘুম দাও আরামে। কর্পোরেট অফিসের কর্তারা যেখানে নির্বিকার সেখানে লে লে বাবু, লুটে লের রাজত্ব চলবেই।

রামনগর প্রতিষ্ঠান চলে গৌরীসেনের অর্থে। সে অর্থের কোনো হিসেব নেই। শুধু খামচা খামচা গামছাতে বাঁধলেই হলো। রামকমল ফয়দা লুটছেন জনপ্রতি পঁচিশ হাজারের খেলায়। নির্মলকুমার কিনে চলেছেন কারখানার জন্য স্পেয়ার পার্টস্। সে মাল কোনোদিনই রামনগরের গুদামে আসে না। ব্যাঙ্গালোরে বসে এস আর ভি সই হচ্ছে। পার্টি পাচ্ছে পেমেণ্ট। সময় মতো বখরা চলে যাচ্ছে সঠিক আখড়ায়। ওপর মহল ব্যস্ত তাঁদের আখের গোছাতে। তাঁরা জানেন এই কারখানা মৃত্যু পথযাত্রী। অবস্থা ঝাঁঝরা হয়ে এসেছে। তাই লুটে লে, ভাই লুটে লে। চলছে লুটেরার রাজত্ব। শ্রমিক শ্রেণী জুয়া-ফাটকা আর খাটালের ব্যবসায় টু-পাইস অতিরিক্ত আয় করে নিচ্ছে। টাইম অফিসের বড়বাবু বসে আছে। ওটির স্রোত বয়ে চলেছে তার পায়ের তলা দিয়ে। রামনগরে রাম রাজত্ব। কারো মনে কোনো দুঃখ নেই। নেই অভাব। গঙ্গা প্রবাহিত আপন ছন্দে, অপরদিকে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার থেকে ম্যাসেঞ্জার সবাই লুটে নিচ্ছে। লুটে নিচ্ছে জনসাধারণের দেয় রাজস্ব। ওদের জীবনের মন্ত্র খুবই সংক্ষিপ্ত—এলোমেলো করে দেমা, লুটে-পুটে খাই।

অশোকের ডিপার্টমেণ্ট খুবই ছোট। সহকারী পিয়ারো আর হিন্দী অফিসারকে নিয়ে সীমিত সংসার। পরিবার নিয়ন্ত্রণ তথা অফিস সঙ্কোচনের আদর্শ উদাহরণ। অফিস দেখার জন্য আছে তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। এ ছাড়াও আছে দুজন। একজন ডার্করুম সহায়ক, অপরজন পিয়ন। কারখানার প্রধান কার্যালয় থেকে এক কিলোমিটার দূরে ছোট্ট এক আতুড় ঘরে জনসংযোগের পতাকা ওড়ানো। তবে জনসংযোগ, না হিন্দীর প্রচার বিভাগ, কোনটার গুরুত্ব বেশী তা অশোক জানে না।

বুঝতে পারে না হাওয়া কোনদিকে প্রবল। হিন্দী বলয়ে হিন্দী ভাষা প্রচারের এমন রমরমা ব্যবস্থা কেন? সরকার চাইছে। কারখানায় উৎপাদন হোক, আর নাই হোক হিন্দীতে বাত্ করনে হোগা।

কারখানায় চলছে বন্ধ্যাত্ব। হিন্দী প্রেমে কর্তৃপক্ষ পাগল। বছরে বারশ কোটি লোকসান। তাতে কি এসে যায়? হিন্দীমে বোলো, হিন্দী ঢঙে চলো এবং অবশ্যই হিন্দীমে খাতাপত্র সই করো। জরুরী কাগজপত্র হিন্দী অক্ষরে এমনভাবে জড়িয়ে রাখ যাতে অহিন্দীভাষী কেউ নাক গলাতে না পারে। অশোকের পূর্ববর্তী পিয়ারো এই ব্যবস্থার জন্মদাতা। তখন জি এম ছিলেন অহমের লোক। তাঁকে ভজিয়ে ডিপার্টমেণ্টের যতরকম সুবিধা আদায় করা যায়। জি এমও বুদ্ধিমান। তিনি এদিক ওদিক বিচার করে দেখেছিলেন, এখানে থাকতে হলে এদের সুরে সুর মেলানো মঙ্গল। তাঁর ব্যক্তিগত মঙ্গল তথা কাজ পরিচালনা করা হবে মসৃণ। পিয়ারো রাম অবতার সিংহও উপলব্ধি করেছিল কর্মকেন্দ্রের গরম হওয়া থেকে একটু দূরে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। আগুনের আঁচ লাগার ভয় নেই। পুড়ে মরার সম্ভাবনা নেই। আর ভয় নেই যখন তখন জি এম সাহেবের মুখোমুখি হওয়ার। অশোক নতুন এসেছে। কিছুতেই বুঝতে পারে না, কেন এই ব্যবস্থা?

স্যর, ডোণ্ট পুট ইয়োর সিগ্নেচার এনিহোয়ার। অশোকের পি এ মহাবীর প্রসাদ তাকে সতর্ক করে দেয়। এ জায়গা বহুত খতরা হ্যায়। আপকো মুসিবতমে ডালেগা। বহুত হুঁশিয়ারী সে সই কীজিয়ে। অশোকের সত্যিকারের দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশের এই ছেলেটির কাছ থেকে। দুটি ব্যাপারে ও বস্‌কে সাবধান করে দিয়েছে। কাজে যোগদানের দিনই বীজমন্ত্র দুটি তার কানে তুলে ধরেছে। নেভার টেক আ রাইড ইন আ টু-হুইলার। কখনো তোমার সই করবে না কাগজে। প্রথমে আমায় দেখাবে। আমি তোমায় বলে দেব সই করার গুরুত্ব কোথায়। একবার যদি ভুল করেছ তবে পস্তাবে সারা জীবন।

এখানে বহু নরবলি হয়ে গেছে স্থানীয় ভূমিহারের হাতে। খুব সাবধান। সতর্ক না হলেই শুয়িয়ে ফেলবে। মহাবীর আরো বলেছে আশেপাশের মাস্তান-তন্ত্রের কথা। তাতে অবশ্য তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবুও বলা তো যায় না। হঠাৎ জড়িয়ে পড়লেই মহা ফ্যাসাদ। প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা।

মহাবীর প্রসাদ কর্তব্যপরায়ণ একজন পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট। পি এ হলেই বস্‌কে পরামর্শ দেবার অধিকার আছে কিনা তা অশোক জানে না। তবে সতর্ক করে দেবার সৎ বুদ্ধিতে সে মুগ্ধ। মহাবীরের সতর্কবাণীগুলো সে মন্ত্রের মতো মনে রেখেছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী মেনে চলার চেষ্টা করেছে। সে মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখেছে তার পি এ খুবই লয়াল। কর্তব্যপরায়ণ লোকেরা চিরদিনই অপরের ঈর্ষার পাত্র হয়। অশোক নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এ সত্য উপলব্ধি করেছে। মহাবীর জানে তার নয়া বস্‌ এ অঞ্চলে নতুন। এই মাফিয়া অধ্যুসিত অঞ্চলে একেবারে আনকোড়া। তার বিপদ চারিদিকে। শত্রুরা ওৎ পেতে আছে। সুযোগ পেলেই হালুম। কোথাও কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আগেই সজাগ থাকা ভাল। সাবধানের মার নেই।

প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। একবার সুবিধাবাদী লোকের খপ্পরে পড়লে অনেক বিপদ। সে জট খুলতে সারাজীবন চলে যাবে। এমন কি সমস্ত কর্মজীবনের সঞ্চয় পি এফের টাকা পর্যন্ত আটকে যেতে পারে। কর্মজীবন থেকে করুণ প্রস্থানও অস্বাভাবিক নয়। মহাবীর বারে বারে স্মরণ করিয়ে মকবুল মিঞার কথা। একশ' ষাটের সেলামী ভোগ করলো কতো রুই কাতলা। যত দোষ যেয়ে বার্তালো বেচারা মিঞার ঘাড়ে। চালাকে কাঁঠাল খায় বোকার মুখে আঠা। জেল খাটতে হলো ওকেই। অন্যান্য ভাগীদারেরা সবাই কেমন ধোওয়া তুলসীপাতার মতো ভক্তের সেবা পেয়ে যাচ্ছে। মিঞার পরিণতি দেখে গ্রাম্য প্রবাদটা মনে পড়ে অশোকের। সন্ধ্যা বেলায় দিয়ে বাতি, বেশ্যা হলো খাঁটি সতী।

রামনগরের নাটক প্রবাদকেও লজ্জা দেয়। এখানকার অফিসারদের

আচরণ, মনোভাব এবং চালচলন নকল সতীর এক একটি সংস্করণ। মহাবীর তার কথার জের টেনে আক্ষেপ করে। বেচারা। বঙ্গাল সে আয়া, আউর ফাঁস গিয়া। শুধু মকবুল মিঞাই বা কেন? জ্বলন্ত নিদর্শন আমাদের রিপোর্টিং অথারিটি ব্রজবাসী দাস। ও ব্যাটা পার্সোন্যাল ম্যানেজমেণ্টের 'পি' জানে কিনা সন্দেহ। অথচ কোন খুঁটির জোরে একটা হাই চেয়ার বাগিয়ে বসেছে। ভাণ্ডারী সাহেবকে কতটা ভেট দিয়েছে তা ঈশ্বর জানেন। খুঁটির জোরে চাকরী হতে পারে কিন্তু তাকে সামলানো চারটেখানি কথা নয়। ওর দুর্ভাগ্য প্রথম পোস্টিং পেয়েছে রামনগরে। আমাদের এপিয়ারো যাদবজী পর্যন্ত ওকে একবার ধমকে আসছে। অথচ ওর তরফে কোনো প্রতিবাদ নেই।

যাদবজীর পকেটে আছে মহাশক্তিমান এম পি। এম পি হলেন জনপ্রতিনিধি। তাঁকে ঘাটানোর সৎসাহস নেই ব্রজবাসীর। অশোকের হয়েছে মুস্কিল। একজন বঙ্গসন্তান কেমন করে এতটা আনস্মার্ট হয়? সে ভাবতেই পারে না। আরো বাবা, যে পুজো দিয়েই হোক, চাকরী তো একটা জুটেছে। সেটাকে মর্যাদা সহকারে বজায় রাখতে চেষ্টা কর। অফিসে ছুঁচোর মতো আচরণ আর সন্ধ্যোয় পান্হনিবাসে বসে কতো কি আস্ফালন। কবে কোথায় ঘি খেয়েছে সেই গন্ধ শোঁকাচ্ছে অন্য সবাইকে। গুল দেবারও তো একটা কৌশল থাকবে। এমন সব গুলগপ্পা ছাড়ছে যে একজন স্কুলবয়ও শুনলে হাসবে।

এ পর্যন্ত উনিশটি প্রতিষ্ঠানে হাজিরাবাবুর কাজ করে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে এসেছে পি এম সেজে। ছিল শেয়াল সেজেছে পশুরাজ। কিন্তু কণ্ঠে সেই খ্যাঁকশেয়ালের সুর। ভাগ্য যখন উপহার দিয়েছে পি এমের চেয়ার তখন সেই চেয়ারটা বজায় রাখ। একটু পড়াশুনা করে, চালচলন রপ্ত করে, স্পোকেন ইংলিশ শিখে নিজেকে তৈরী করায় দোষ কিসের? আত্মপ্রতিষ্ঠার এই তো সুযোগ। পাণ্ডব বর্জিত দেশে শেয়াল রাজা হবে এবং সেটাই স্বাভাবিক। রামনগরের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে অনেক নতুন পথ দেখাবে। একদিন হয়তো তাকেই জেনারেল ম্যানেজার হয়ে অঙ্গ-

বঙ্গ-কলিঙ্গ দাপাদাপি করতে হবে। কে বলতে পারে? ভাণ্ডারী সাহেব আর কদিনই বা? অভিনন্দন সাহেব যেভাবে ভিজিলেন্সের ফেউ লাগিয়েছেন তাতে ওঁর শিরে সংক্রান্তি। জাল গোটাতে যতটুকু সময়ের দরকার। তারপর বৃন্দাবন গেলসে ঘূর্ণয়মান কেদারাখানা তো শূন্য হবেই। কিন্তু ফকিরকে রাজা বানালে কি হবে? মনোভাব তো বদলাবে না। ব্রজবাসীর আচরণ দেখে পান্থনিবাসের কালুয়া পর্যন্ত ব্যঙ্গ করে। পেছনে হাসাহাসি করে। ওদের মুখ বন্ধ করতে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে যায় দাস মশায়ের। সাধারণ বক্‌শিসের নামে এক ধরণের উৎকোচ দান। টাকায় কি না হয়? টাকার লোভে স্থানীয় সব কর্মচারী সামনে ব্রজবাসীর কীর্তন করে। অনুপস্থিতিতে চলে ছুঁচোর কেত্তন।

অভিনন্দন সাহেব দিল্লী পেঁৗছে গেছেন। রামনগর এখন শান্ত। নিশ্চিন্তে, নিরাপদে অফিসাররা শীতের রোদ পোহাতে মত্ত। কারখানায় সেই পুরানো দৃশ্য। সকাল সাড়ে আটটায় কারখানায় চললো সব টেক্‌নোক্র্যাট বাহিনী। সে এক বিরাট শো! এক একটি অ্যাম্বাসেডারে ছজন করে লোক। সকালে গাড়ী চালাচ্ছে মিস্টার সিনহা। দুপুরের পালা মণ্ডলবাবুর। পালা করে গাড়ী ব্যবহার। কার-পুল করতেই হয়। তেলের যা দাম। তাছাড়া জাতীয় সম্পত্তির অপচয় কে করতে চায়? দেশের তৈল সম্পদ বাঁচাতে সবার কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা। আসলে কার অ্যালাউন্সের নামে যে পাঁচশ টাকা পাওয়া যায় প্রতিমাসে তা থেকেও কিছু সঞ্চয়। কোম্পানীর খাতায় গাড়ীর একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেখাতে পারলেই হলো। রেগুলার ইনকামের এক বিশেষ বন্দোবস্ত।

সকালে কারখানায় পেঁৗছে প্রথম কাজ চায়ের জন্য অপেক্ষা। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে শুরু পরনিন্দা পরচর্চা। পি এন পি সিতে সময় বেশ কেটে যায়। সাড়ে এগারটায় আবার টাউনশীপে ফেরার পালা। লানচ-ব্রেক। পাক্কা দুটি ঘণ্টার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। আহার ও তৎসহ খানিক দিবানিদ্রা। ঘুমটা যখন একটু জমে উঠবে ঠিক তখনই বাড়ীর সামনে হুটারিং।

কারপুলের লীডার করছে যাত্রী সংগ্রহের অভিযান। অপরাহ্ন
আড়াইটার মধ্যে কারপুলের কনভয় পুনরায় কারখানার অন্দরে।
কিছুক্ষণ পরই আফটার-নুন টী। বৈকালিক চায়ের কুপন সংগ্রহ
শুরু হয়ে যায়। পিয়নগুলো এ ব্যাপারে খুবই তৎপর।
সাহেবদের চা সরবরাহ মানেই ওদেরও গলা ভেজানোর বন্দোবস্ত।
শুধু তাই নয়। এই চা-পর্ব শেষ হলেই ওদের বিদায়ের পালা।
একেবারে ফ্রেঞ্চ লীভ। তবে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলেও ওভার-
টাইমের কোটা পাকা। কোনো পরিবর্তন নেই। এই একটি
বিষয়ে ওদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পার্মামেণ্ট
সেট্‌লমেণ্ট। ওটি হলো ওয়ার্কারের অলিখিত অধিকার।
একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার যেমন অধিকার আছে কর্তৃপক্ষকে
গালাগাল দেবার, টেবিল চাপড়ে কথা বলার, তেমনি সদস্য
সহকর্মীদেরও অধিকার আছে ওটি আদায় করার। এটা কি
ওয়ার্করুলে পড়ে? অশোক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।
এটা অধিকার, না আবদার। ওটির ভারে কারখানা ভেঙে পড়ার
উপক্রম। কোনো উৎপাদন নেই, শুধু উৎপাত এবং এরফলেই
কর্তৃপক্ষ চিৎপাত।

মহাবীর তার বসকে অংকটা বুঝিয়ে দিয়েছে। ঐ যে এক একজন
মজদুর পঁচিশ হাজারের সেলামী দিল তা কিসের লোভে? সে
ভালভাবেই জানে অথবা তাকে সমঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওই
টাকা উঠে আসবে অন্যপথে। বড়জোর একবছর সময় লাগবে।
তারপর ফয়দার ময়দা তুলতে হবে ঝোলায়। নাম একবার মাস্টার
রোলে উঠলে আর ঠেকায় কে? ট্রেড ইউনিয়নের লাল পতাকা যত-
দিন উড়বে আকাশে ততদিন চাকরী খায় কে? নাম তালিকাভুক্ত
করা হয়তো কঠিন কিন্তু নাম বাতিল করা কঠিনতর ব্যাপার। জয়
বজরঙ্গবালীর নাম স্মরণ করে মধু আহরণে মেতে থাক। অফিসার
সম্প্রদায়ও জানে এ কারখানা বন্ধ্যা। এর কোনো প্রজনন ক্ষমতা
নেই। উৎপাদনে অক্ষম এই বিশাল বপুধারী শিল্প শুধু একটি
শোভা। পুরো ব্যাপারটাই এক ভয়ংকর ভাওতা। যেসব যন্ত্রপাতি
এতে আছে তা কোনোদিনই সক্রিয় হবে না। যদি থাকতোই সে
সম্ভাবনা তবে আয়ারাম গয়ারামের মতো আট বছরে দশজন সি

এম্ ডি অভিনয়মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন না। এবার মন্ত্রী মশাইয়ের শেষ চেষ্টা। সব ওষুধ ফেল করেছে। স্টেরয়েড প্রয়োগ করে দেখা যাক। যদি এতে প্রাণ সঞ্চার করা যায়। অভিনন্দন সাহেবের আবির্ভাব টেস্ট টিউব বেবীর জন্মদান করতে।

চেয়ারম্যানের সফর শেষে শান্ত গ্রাম রামনগর আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। দৈনন্দিন জীবন প্রবাহিত হলো আপন ছন্দে। সেই এক গীত, এক সুর, এক প্রকৃতি। ব্যতিক্রম নেই কিছুতেই। বৈচিত্র্য বিদায় নিয়েছে রামনগর থেকে। উত্তেজনার ঝড় উঠেছিল সাময়িকভাবে। এম্ ডির দিল্লী প্রত্যাবর্তন মানেই রামনগরে গতানুগতিকতা। কারখানায় উৎপাদন নেই। কাঁচামাল কেনার টাকা নেই। তবুও অফিসারদের টুর করতেই হয়। টুরের ইন্‌কাম পুরোটাই ট্যাক্স ফ্রী। এম্ এম্ পঞ্চানন নন্দী যথারীতি চলে গেছে মধ্যপ্রদেশে। ওখানকার আদিবাসীদের সৌন্দর্য ওকে বারে বারেই আকর্ষণ করে। ইন্দোর থেকে চুণ এসে পৌঁছয়নি কারখানায়। খুব জরুরী ভিত্তিতে যেতে হয় সেখানে। রেলওয়ে ওয়াগন পাওয়া যাবে কিনা সঠিক জানা নেই। প্রয়োজনবোধে সড়ক পথেই হয়তো আনাতে হবে এই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। রোড ট্রান্সপোর্টার ঝানু ব্যবসায়ী। সে জানে একবার যদি সাহেবকে নিয়ে আসা যায় এই শহরে তবে তার মাল ট্রাকে যাবেই। এ ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত। এবং ব্যবসা তার ভালই হবে। রেল ওয়াগন পাওয়ায় অনেক ঝঞ্ঝাট। মালবাবু থেকে শুরু করে খোদ সি ও পি এসকে মাল খাওয়াও। সেদিক থেকে সড়কপথে মাল পরিবহণ করায় তেমন ঝামেলা নেই।

এম্ এম্‌কে টুর করতেই হয়। কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে কাঁচামালের অভাবে এই প্রসঙ্গ থাকলে ফিনান্স ম্যানেজার কোনো বিল আটকাবে না। যে শিল্প সম্বৎসর নিদ্রারত তার আবার উৎপাদন সমস্যা? সবই হলো প্রফেসনাল গিমিক্। কাগজপত্তর গুছিয়ে রাখার কৌশল। লোক বদলী হয়ে যাবে। কিন্তু অফিসের নোটশীট থাকবে হাইবারনেশনে। শীতকালীন দীর্ঘ নিদ্রায়। হাইবারনেশন তো মৃত্যুরই সাময়িক রূপ। তবুও

রেকর্ড ঠিক রাখতেই হয়। অডিটকে চীট্ করার কৌশল। আসলে গাই বাছুরে সায় থাকলে দুধ খাওয়া বন্ধ করা শিবেরও অসাধ্য। পঞ্চানন নন্দী ইন্দোর ঘুরে কোলকাতায় যাবে। সেখানে বীমা কোম্পানীর সঙ্গে আছে আলোচনা। বারশ' টাকার দাবী নিয়ে পাঁচবার কোলকাতায় সফর। এ সি স্লীপারে যাতায়াত। সফরের খরচ পাঁচ হাজার টাকা। ব্রজবাসী গেছে কোলকাতায়। লেবার ট্রাইবুনালের এক জট ছাড়াতে যেতেই হয় ট্যুরে। নির্মলকুমারের ঢালা অর্ডার। ছুটি মত মাঙ্গো। ডোণ্ট আস্ক ফর লীভ। গো অন ট্যুর। সাধারণতঃ শুক্রবারে আলোচনা হয়। শনিবার দেশের বাড়ী বীরভূমে। আবার সোমবারে দশটায় হাজির। ট্রেড ইউনিয়নের দাদারা মুখ খুলতে পারে না। নির্মলকুমার সবই জানেন। এবং জেনেশুনেই ওদের ট্যুর অ্যাপ্রুভ করেন। কি আর করার আছে? সবাইকে নিয়ে তাঁর টীম। ভাল খেলা আদায় করতে হলে টীম ম্যানেজারকে একটু সদয় হতেই হয়। না হলেই অসহযোগ আন্দোলন।
বিভাগীয় প্রধানেরা হেড কোয়ার্টাসের বাইরে থাকার সুবিধাও আছে। তাদের অবর্তমানে জুনিয়ার অফিসারগুলো জি এম্কে খুশী করতে পারে। অনেক বিতর্কিত প্রসঙ্গ পরিষ্কার হয়ে যায় সহজে। কোনো প্রতিবাদের সম্ভাবনা থাকে না। চীফ ইলেকট্রিক্যাল চলে গেছে পানীটোলায়। ওখানকার ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাণ্ট কিভাবে কাজ করে তা নিজের চোখে দেখতে এবং শিখতে। ওকে পাঠিয়েছেন জি এম্। ও ফেরার পর চেয়ারম্যানকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সি পি পির ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং। এই তিন বিভাগীয় প্রধান রামনগরে ফিরলেই অপর তিনজন যাবে ট্যুরে। ওয়ার্কারদের যদি ওটি হতে পারে তবে অফিসারদের ট্যুরে দোষ কি? পরস্পর সহাবস্থানের নিয়মে রামনগর সত্যিই রামরাজত্ব। কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। সময় বেশ আয়াসেই চলে যায়। মাস মাইনে, ওভার টাইম, ট্যুর মিলে পকেট ভারী হয়। সবাই প্রাণ খুলে সার্বজনিকের জয়গান গায়। দীর্ঘায়ু কামনা করে। রামনগর যে কোমাতে আছে সে খবর রাখেন শুধু অভিনন্দন সাহেব।

অভিনন্দন সাহেব মৃগয়ায় এসেছিলেন। তাঁর কাছে রিপোর্ট আছে রামনগরের কারখানাটি একটি ঘুঘুর বাসা। এই চক্রে আছে তাবড় তাবড় অফিসার। হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা হয় না। প্যাথোলজি বিভাগে হয় না রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা। ডাক্তারগুলোও দলে ভীড়ে গেছে। রোগী এলেই রেফার করে বাইরে! সেই রোগীকে এসকর্ট করার জন্য পাঠানো হয় এক-জনকে। যাতায়াত কোম্পানীর খরচে। বাইরের নার্সিং হোমে আছে ডাক্তারদের ক্যাচ্। তারা রোগীর সরবরাহ রাখে অব্যাহত। মোটা টাকার একটা অংশ ভাগাভাগি হয় কমিশন হিসেবে। তাই বা মন্দ কি? সাপ্লায়ারকে চিরদিনই কিছু দিতে হয়। ব্যবসা করতে গেলে সবাইকে খুশী রাখতে হয়। ডাক্তারীও একটা ব্যবসা। সেবা টেবা উনবিংশ শতাব্দীর কথা। ফেল কড়ি, মাখ তেল। কবে কোন গ্রীসবাসী হিপোক্রিট উপদেশ দিয়ে গেছেন তা আজও মানতে হবে তাই বা কে বলেছে?

শুধু হাসপাতালে নয়। কোম্পানীর স্কুলেও রাজনীতির হৈ চৈ। জাতপাতের নিত্য কলহ। তিন তিনটে কোর্টে কেস্ চলছে প্রধান শিক্ষক বনাম সহকারী শিক্ষকের। ভূমিহার ভারসাস যাদবস্। ব্যাকওয়ার্ড বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাশের লড়াই। পড়াশুনা সব শিকেয়। কি আর হবে শিশুদের? অভিভাবকেরা আয় করছে অসৎপথে। মাস্টার মশাইরা সব জানেন। কেউ কাউকে ভুল ধরতে সাহস পায় না। রামনগরের শিকারপর্বে কে কে বধ হয়েছে তা জানা গেল সাত দিনের মধ্যে। অভিনন্দন সাহেব দিল্লী পেঁছেই টেলেকস্ পাঠালেন রামনগরে।

* * * *

ঝড় ওঠার আগে যেমন প্রকৃতিতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় রামনগরের কারখানাতেও তেমনি এক থমথমে ভাব। চারিদিকে এসে গেছে, এসে গেছে, রব শোনা গেল। তারপর সেই শব্দ স্পষ্ট হওয়ার পর শোনা গেল নির্মলকুমারের বদলীর আদেশ এসে গেছে। রামনগর থেকে নন্দীগ্রাম। এবং যেতে হবে সত্বর। নতুন সি এম্ ডি গড়িমসি ব্যাপারটা একদম পছন্দ করেন না।

হঠাৎই ডাক পড়লো অশোকের। জি এম্ সেক্রেটারিয়েট থেকে ইণ্টারকামে খবর এলো। প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস্টার ভেনু-গোপাল ডাকছে পিয়ারোকে। ম্যাটার ইজ ভেরী আর্জেণ্ট। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে এক কিলোমিটার দূরে জনসংযোগ অফিস।

অশোক বসে আছে কোম্পানীর আউট হাউজে। সহকারী শ্যামসুন্দর গেছে বৈশালীতে। পোতার অন্নপ্রাসনে তাকে যেতেই হয়েছে। এদিকে রামনগরের পোতখানা ডুবুডুবু। হিন্দী অফিসার হনুমান প্রসাদ গেছে মুঙ্গের। সেখানে তার বন্ধুপত্নী আত্মহত্যা করেছে। থানা পুলিশ এবং অনেক ঝামেলা। হাজার দশেক নগদ ট্যাকে গুঁজে সে চলে গেছে বন্ধুকে বিপদমুক্ত করতে। সেদিক থেকে ওর কর্তব্য পরায়ণতার কথা অস্বীকার করা যায় না। থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে জল-পানির ব্যবস্থা রাখতেই হয়। সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের হিন্দী অফিসার পরিচয় দিলে হয়তো একটু কনসেশন হতে পারে। সেলামী যতই হোক, ব্যাপারটাকে হাপিস করতেই হবে ওকে। রাজদ্বারে, শ্মশানে চ, য তিষ্ঠতিঃ স বান্ধবঃ। বন্ধুত্বের প্রকৃত সংজ্ঞাকে সম্মান প্রদর্শন করা শিক্ষিত লোকের কর্তব্য। প্রকৃত বন্ধুর কাজ করতেই হনুমানের মুঙ্গের গমন। সকালে হাজিরা খাতায় সই মেরে গেছে। সে কি আর জানতো হঠাৎ নির্মল কুমারের বদলীর আদেশ আসবে।

অশোক অফিসে একা। ভেনুগোপাল ফোনে বলেছে, ব্যাপার খুবই গম্ভীর। শীগগীরই দেখা করতে হবে। অবশেষে পায়ে হেঁটে অশোক চললো কারখানার অভ্যন্তরে। দীর্ঘ এক কিলো-মিটার পথ যেন শেষ হতে চায় না। রাস্তার দুধারে সরোবরের জলরাশি, প্রবাসী পাখীর কলতান এবং অ্যামোনিয়ার অদৃশ্য উপস্থিতি ওকে হাঁটার এক ঘেয়েমিকে ভুলিয়ে দেয়। পিয়ারো কি একটা গাড়ী চাইতে পারতো ব্রজবাসীর কাছে? সে গাড়ী তো আসবে দুঘণ্টা পর। ততক্ষণে রিপোর্ট হয়ে যাবে কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে। চাকরী বলে কথা। ব্যক্তিগত ব্যথার স্থান কোথায় চাকরীর জগতে?

বলিয়ে সাব, ক্যা হুকুম। অশোক বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো ভেনুগোপালকে।

উত্তরে সে শুধু একটি কথা জানালো। প্লীজ অ্যারেঞ্জ ফর আ ফেয়ারওয়েল মিটিং। নির্মলকুমার সাহেবকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে হবে। যে করেই হোক, আগামীকালের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করতে হবে। কর্পোরেট অফিসের হুকুম আগামীকাল মিথিলা একস্‌প্রেসে ওঁকে রওনা দিতে হবে। হাতে একদম সময় নেই। সি এম্‌ ডির অর্ডার নন্দীগ্রামের ডি জি এম্‌কে রিলিজ করতে হবে তুরন্ত। তাই এত তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত।

কি এমন ঘটনা হলো যে নির্মলকুমারকে কালই যেতে হবে রামনগর ত্যাগ করে। অশোক খুব ক্ষীণকণ্ঠে জানতে চেয়েছিল ভেনুগোপালের কাছে।

প্রত্যুত্তরে শোনা গেল, পুছিয়ে মাত। ডোণ্ট আস্ক মী।
পুরো রহস্যটা অবশ্য কদিন পরই জানতে পেরেছিল অশোক। নির্মলকুমারের মৃত্যুবাণ পোঁছে গেছে সি এম্‌ ডির কাছে। আর রক্ষা নেই। এ শক্তিশেল ওঁকে সহ্য করতেই হবে। এ ব্যাপারে ডাবল স্পাইয়ের কাজ করেছে তারিকালী।

ব্রজবাসীর সাব-অর্ডিনেট তারিক কথাবার্তায় খুব দুরন্ত। কাজ যতটা জানে তার চেয়ে প্রচার বেশী। ও ব্রজবাসীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অথচ ব্রজবাসী বস্‌ই লিখবে ওর কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট। তাই দাদা-বাবা সম্বোধনে সামনা সামনি সম্পর্কটা ভালই রেখেছে। তবে তাকে তাকে আছে কখন একটা ছোবল দেওয়া যায়। নির্মলকুমারের রেসিডেন্স ফোন বিল যে একমাসে একলাখ টাকা ছুঁয়েছে সে খবর প্রথম জেনেছিল তারিকালী।

গোপন খবর উদ্ধার করায় তারিকের অদ্ভুত এক নেশা। সবাইকে ভজিয়ে, তোয়াজ করে নিষিদ্ধ সংবাদ সংগ্রহ করায় যে উত্তেজনা আছে তার মূল্য অনেক। ব্রজবাসীর টেবিল থেকে ওই টেলিফোন বিলটি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তুলে নিয়েছিল ও। তারপর মহামান্য র‍্যাংক জেরক্‌সের যন্ত্র সাহায্যে বিলটির একটি প্রতিলিপি

গ্রহণ। সেই জেরকস্ কপিটি পেঁছে গেছে চেয়ারম্যানের হাতে। একমাসে শুধু বাড়ীর এস টি ডি বিল এক লাখ টাকা! তিনি নিযুক্ত করলেন ভিজিলেন্সকে। খোঁজ, খোঁজ। ভাল করে অনুসন্ধান করে বের কর একলাখের রহস্য। কি করে এত টাকার এস টি ডি কল হলো?

বৃন্দাবন প্লেসের ভিজিলেন্স অফিসার মদন দাস চোর ধরতে ওস্তাদ। ও চলে এলো রামনগরে। পান্হনিবাসে বসেই সব খবর পেয়ে গেল মিস্টার দাস।

জি এমের একমাত্র পুত্র বিয়ের পর চলে গেছে অ্যামেরিকায়। ইমিগ্রেশনের কি একটা ঝামেলায় বৌকে রেখে গেছে শ্বশুর সেবার নিমিত্তে। প্রতি রাতে পুত্রবধূর টেলি-আলাপের ফলেই এই বিশাল বিল। নির্মলকুমারের কি-ই বা করার আছে? একজন নববিবাহিতা স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে গোপনে কথা কইবে তাতে দোষের কি? বিধি নিয়মের বেড়াজালে সবকিছুকে জড়াতে হবে তাই বা কে বলেছে? ঐ লাখ টাকার টেলিফোন বিলটা এম পি এ ব্রজবাসী বেশ ভালভাবে ম্যানেজ করেছে। এফ্ এমের অনুপস্থিতে একজন জুনিয়ার অফিসারকে দিয়ে পেমেণ্টের ব্যবস্থা করেছে। পদোন্নতি কে না চায়? সে জানে জি এম তুষ্ট মানেই জগৎ তুষ্ট। এ ধরণের সেবাও এক ধরণের ধর্ম। ফিউচার ইনভেস্টমেণ্ট। আখেরে কাজ দেবে। এফ্ এম্ ভীম সেন আর কদিনই বা থাকে হেড কোয়াটার্সে। মাসের আঠারো দিন ট্যুরে। একদিন জুনিয়ার অফিসারের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে নিশ্চয়ই! সেক্ষেত্রে জি এমের সুপারিশ কাজে লাগবে। আনন্দের সঙ্গে টেলিফোন বিলের চেক্টা ক্লিয়ার করেছে সে। ব্রজবাসীকে সহযোগিতা মানেই জেনারেল ম্যানেজারের নজরে পড়া। ব্রজবাসীও জানে পেমেণ্টটা করিয়ে দেওয়া ওর কাছে চ্যালেঞ্জ। নতুন চাকরী। এখনো কনফার্মড হয়নি। একদিনের নোটিশে 'বিদায় বন্ধু' বল্লেই হলো। ওকেও তো পাকাপাকিভাবে থাকতে হবে।

এক লাখ টাকার টেলিফোন বিল এসেছে জি এম্ বাংলোর ফোন নাম্বারে। টাকার অঙ্কটা আতঙ্কের হলেও কারখানার পয়লা

নম্বরের কাছে তেমন কোনো ব্যাপারই নয়। একজন জি এমের ফোন দূর দূরান্তে কথা বলতেই পারে। শুধু আই এস ডির দক্ষিণা। এতো আর ফরেন ট্যুর নয়। তিনি যদি একবার বিদেশ সফরে যান তবে লেগে যাবে পাঁচ লাখ টাকা। সে অনুপাতে সামান্য এই অংকটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। শুধু টেলিফোন বিলই অভিনন্দন সাহেবকে শঙ্কিত করেনি। তাঁর কাছে আরো খবর আছে। পঞ্চাশ লাখ টাকার লোকাল পারচেজ হয়েছে কোলকাতায়। কার্ল মার্কস স্কোয়ারের অফিসে বসেই এই সামান্য সওদা। ক্যাম্প অফিসে বসেই অর্ডার দিয়েছেন। মালের এস্ আর ভি এসেছে। সেই স্টোর রিসিভিং ভাউচার সই করেছে অনুগত এম্ এম্ মিস্টার নন্দী। কমপ্রেসারের জন্য টিউব ভীষণ প্রয়োজন। টেণ্ডার ডাকার সময় নেই। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। তাই এই এমারজেন্সি পারচেজ। পঞ্চানন যেভাবে বস্‌কে বুঝিয়েছে সেইভাবেই কাজ হয়েছে। আফ্‌টার অল জি এম্ ইজ আ বিজিম্যান। তাঁর অত খুঁটিয়ে দেখার সময় কোথায়? তাই তো রাখা হয়েছে একডজন এইচ্ ও ডি। হেড অফ দ্য ডিপার্টমেণ্ট। বিভাগীয় প্রধান। সেইসব বিভাগীয় প্রধানেরা সবকিছু বুঝে নেবে এটাই স্বাভাবিক।

ভিজিল্যান্স অফিসার গোপন খবর দিয়েছে সি এম ডিকে। কমপ্রেসারের কোনো টিউবই রামনগরে পেঁৗছেনি। অথচ পার্টি পেমেণ্ট হয়ে গেছে কোলকাতা থেকে। রামনগরে এসে গেছে সেই পেমেণ্টের অ্যাডভাইস। এ ব্যাপারে নির্মলকুমারের কতটা হাত ছিল তা ঈশ্বর জানেন। তবে বিনা টেণ্ডারে এত টাকার টিউব কেনার সায় ছিল তাঁর। পঞ্চানন তাঁকে সবুজ সংকেত দিয়েছিল।

স্যর, ইউ আর দ্য জেনারেল ম্যানেজার। আপনি ইচ্ছা করলে পুরো কারখানাটি নীলামে তুলে দিতে পারেন। আধ কোটি টাকার টিউব কেনা তো আপনার হাতের নস্যি। আপনি অর্ডার প্লেস করে দিন। তারপর এই দাসানুদাস, কেনা গোলাম তো আছেই। পথ একটা বের হবেই। কারখানার উৎপাদনের স্বার্থে এ ধরণের

কেনাকাটা আপনি করতেই পারেন। পুণাতে থাকতে আমি এ ধরণের লোকাল পারচেজ হামেশাই করতাম।

নির্মলকুমার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। গুরগাঁওর বাগান বাড়ী তখনো অসম্পূর্ণ। অথচ অবসর গ্রহণের সময় ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। পঞ্চাননের প্রস্তাব তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল। সেই পঞ্চাননই লোকাল পারচেজের কেচ্ছা পাচার করলো সি এম ডির কাছে। রামনগর সফরকালে মিস্টার নন্দীই সব কাগজের জেরকস্ কপি উপহার দিয়েছিল তাঁকে। কাগজটি পেপারবোম্বের কাজ করেছে। সত্যিই, এক পৃষ্ঠার একটি কাগজ এক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এক হাতে লাখ টাকার প্রাইভেট কলের কাগজ, অন্য হাতে পঞ্চাশ লাখের লোকাল পারচেজের পেমেণ্ট। একেবারে সোনায় সোহাগা। নির্মলকুমার নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই তৈরী করেছেন।

সামুদ্রিক ঝড়ের মতো মহাপ্রলয় শুরু হলো বৃন্দাবন প্লেসে। বদলীর ঝড় তুলে দিলেন সি এম ডি। রামনগর থেকে নির্মলকুমারকে পাঠালেন নন্দীগ্রামে। ওখানকার ডি জি এমকে নিয়ে এলেন রামনগরে। আসলে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের বিরাট মহীরুহে যেসব মরাডাল আছে তাদের ভেঙ্গে ফেলাই তাঁর উদ্দেশ্য। একজনকে এই নির্মম কাজ করতেই হবে। অভিনন্দন সে ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর। ডি জি এম কমলকুমারের হাতে পানীটোলার চিঠি। ওকে সুদূর বর্মা সীমান্তে পাঠানোর অন্তরালে আছে এক ষড়যন্ত্র? কর্পোরেট অফিসে বসে আছেন মিস্টার মিশ্র। জেনারেল ম্যানেজার টেকনিক্যাল। একশ' ষাটের বখরা নিয়ে বচসা হয়েছিল একদা একদিন। এই ঝড়ের সুযোগে এবার তাঁর বদলা নেবার পালা।

কমলকুমারের কাছে পানীটোলা অপরিচিত নয়। প্রকৃতি সেখানে সবুজসাজে সজ্জিতা। পাশেই পাহাড়ের হাতছানি। আকাশের মেঘ সুযোগ পেলেই একবার করে পানীটোলাকে সোহাগ চুম্বন এঁকে দেয়। স্থানীয় মানুষগুলো বড়ই সাদাসিদে। অহোম আন্দোলনের নামে অবশ্য কিছুদিন আগে ওরা ক্ষেপে উঠেছিল।

রাজীব গান্ধীর যুবপ্রেমে সেইসব আন্দোলনকারীর দল রাজা বনে গেছে। রাজতন্ত্র নেই, তাই রাজা উপাধি বেমানান। তবে তথা কথিত গণতন্ত্র তো আছে দেশে। সেই গণতন্ত্রের মন্ত্রপূতঃ নেতারা বর্তমান সমাজে মন্ত্রী।

সব আন্দোলনই কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত? অহোম গণপরিষদের আন্দোলনের অন্তরালে ছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য। বঙ্গাল-খেদা। ঝেটিয়ে বাঙালী বিতাড়ণের এক মহাযজ্ঞ। স্থানীয় অধিবাসীদের বোঝানো হয়েছিল বিকৃতভাবে। বাঙালীরা বিদেশী। ভয় দেখিয়ে গৃহহারা করা গেছে বহু বাঙালীকে। অহোম আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য বঙ্গসন্তান। সেদিক থেকে হিন্দীভাষীর একটা প্লাস পয়েণ্ট আছেই। রাজভাষা, অথবা রাষ্ট্রভাষা যে নামেই বলা যাক না কেন তাকে, তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। রাজধানীতে গেলে সেই ভাষাতেই কথা কইতে হবে। তার ওপর অভিমান করা চলেনা। কমলকুমারের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় পানীটোলাতে। সে হিন্দীপ্রেমিক। দূরত্বটাই যা সমস্যা।

কোথায় হরিয়ানা, আর কোথায় পানীটোলা। তবুও সেই পাহাড়ী পরিবেশ ওকে আকর্ষণ করে। ওখানেই ওর কর্মজীবনের শুরু। পানীটোলা ওর যৌবনের বৃন্দাবন, বার্ধক্যের বারানসী। আজও ওর মনে পড়ে প্রথম বিবাহিত জীবনের মধুচন্দ্রিমার দিনগুলো। স্মৃতি সততই সুখের। শুধু আপশোষ হলো এবারের যাত্রাটা বাধ্যতামূলক। এটা ওঁর শাস্তিমূলক বদলী। ওঁকে শায়েস্তা করার কৌশল। এক ধরণের বনবাস। চিরতরে বনবাস। এবার থেকে ঘরে ফেরার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। এ যেন এক অজ্ঞাতবাস। সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা।

রামনগরে অশোক নতুন। না জানে কাউকে, না চেনে এই অজানা পরিবেশ। তবুও তাকে সব বন্দোবস্ত করতে হবে। নির্মলকুমারের বিদায় সম্বর্ধনার ব্যবস্থার করতেই হবে। এই কারখানার ঐতিহ্য, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরেকজন জেনারেল ম্যানেজারকে বিদায় জানাতে হবে। সেই বিদায় সভায় হবে স্মৃতিচারণ। ট্রেড

ইউনিয়ন নেতা বক্তৃতা দেবে, স্থানীয় নেতা ফেলবে কুম্ভীরাশ্রু। অফিসার্স ক্লাবের সেকরেটারী বিরাট গিফ্‌ট-প্যাকেট তুলে দেবে হাতে। আর অশোকের ডার্করুম অ্যাসিস্টাণ্ট ছবি নেবে ফ্ল্যাশে। অশোক এই শিল্পাঞ্চলে নতুন হলেও তার সহযোগিতায় আছে শ্যামসুন্দর যাদব। কমরেড এপিয়ারো। ও যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। কোনো ভুল ত্রুটি হলে দুর্নাম হবে ওরই।

কমরেডকে বিশ্বাস করা যেতে পারে কি? তার মনে সংশয় জাগে। রাজনৈতিক দাদাদের সঙ্গে দহরম মহরম। সেই সুবাদে গ্রামে, পঞ্চায়েতে, এমনকি জেলা পরিষদেও দারুণ খাতির কমরেডের। ওর কোনো সুনির্দ্দিষ্ট কাজ নেই। তবে একটা অলিখিত চুক্তি আছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। কারখানার অভ্যন্তরে যত কেচ্ছাই থাক না কেন বাইরে যেন তা প্রকাশিত না হয়। সেইজন্যই তো প্রধান কার্যালয়ের এক কিলোমিটার ব্যবধানে বসানো হয়েছে পিয়ারোদের। জনসংযোগ বলতে কথা। ওখানেই ভীড় করবে স্থানীয় পত্রকারের দল। তাদের জার্নালিস্ট বলে সম্বোধন করলে চটে যাবে। ইংরেজিটা বিজাতীয় ভাষা।

দেশ এখন স্বাধীন। ইংরেজির ব্যবহার মানেই হিন্দীকে অপমান। শ্যামসুন্দর তাদের মনস্তত্ত্ব জানে। তাই তাদের আদর, আপ্যায়ন এবং কিশোরীলালের লাড্ডুসহকারে চা পরিবেশনের দায়িত্ব ওর ওপর। শুধু পত্রাকারের দলই নয়। সেখানে সমবেত হবে গ্রামের মুখিয়া থেকে শুরু করে নেতা তথা অভিনেতার দল। তারা পর্যায়ক্রমে আসবে জনসংযোগ বিভাগে। দেবে পদধূলি, সামান্য চা-জলযোগ গ্রহণে ধন্য করবে পিয়ারোকে। এজন্য একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ ধরা আছে। মাসের শেষে এপিয়ারো কি করে ভাউচার তৈরী করে, কোত্থেকে পেমেণ্ট নেয় সে খবর অশোক জানতেও চেষ্টা করে না। সে শুধু দেখেছে পত্রাকার বন্ধুদের অনুরোধ-পত্র। সামান্য চার-পাঁচশ টাকার একটা বিজ্ঞাপন পেলেই ওরা খুশী। যমুনাপ্রসাদ কিভাবে বিজ্ঞাপন বিতরণ করতো অশোকের তা জানা নেই।

রিপোর্টারদের খুশী করতেই হয়। নতুবা সমূহ বিপদ। শ্যামসুন্দর সদা সতর্ক থাকে। নতুন পিয়ারো কোথায় কি বেফাস বলে ফেলে সেই ভয়ে সে জড়সড়। পত্রকারদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেই একশ ষাটের প্রসঙ্গ এসেই যায়। সেই লোক নিয়োগের নাটক এবং হরিলুটের ভাগীদারদের কথা ওঠে। ওরা সবাই লিটল ম্যাগাজিনের মালিক তথা সম্পাদক। স্থানীয় চুটকী হিসেবে বারে বারেই ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের কাহিনী ওরা ব্যবহার করে। বিশেষ করে যারা ঐ একশ ষাটের তালিকায় নিজেদের ক্যান্ডিডেট ঢোকাতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের আক্রোশ সব থেকে বেশী। আক্রোশ থেকেই আক্রমন। মাত্র পঁচিশ হাজারের বিনিময়ে কে না চায় এমন একটি কামধেন ক্রয় করতে? পত্রকারদের ভীষণ রাগ নয়া-পিয়ারোর ওপর। সে সব সময় অংরেজিতে বাতচিৎ করে। হিন্দীকে এড়িয়ে চলে। হিন্দুস্থানে থাকবে অথচ হিন্দী বলবে না এ কি ধৃষ্টতা। পত্রাকারেরে দল পারে তো ওকে জেলুসিলের মতো চিবিয়ে খায়। অশোক হিন্দীমানচিত্রে গ-বিভাগের লোক তাই প্রাণটা ধরে থাকে।

*　　*　　*

যমুনাপ্রসাদ ছিল সত্যিকারের জনসংযোগের লোক। উপস্থিত পত্রকারেররা বারেবারেই ওর প্রসঙ্গ তুলে অশোককে হেয় করতে চায়। কিন্তু তারা জানে না যমুনা প্রসাদের বিদায়ের কারণ কি। নির্মলকুমারের ক্রোধের শিকার কি পরসাদজী? ঈশ্বর জানেন। একদিন হঠাৎই দিল্লী গেল আর ফিরে এলো না। ফিরে এলো না বলাটা ভুল হলো। রামনগরে ফিরেছিল, তবে বদলীর আদেশ পকেটে নিয়ে। আসলে নির্মলকুমারের অভিযোগের ভিত্তিতেই ওর বৃন্দবনে বনবাস। তৎসঙ্গে এই জটিল নাটকের মঞ্চে অশোকের আবির্ভাব। সম্পূর্ণ আকস্মিক। কোনো রিহার্সাল নেই। স্টেজে তুলে দেওয়া হয়েছে। অথবা পুরো দৃশ্যটি একটি ঘটনা-চক্রের ব্যাপার। এ ম্যাটার অফ কোয়েনসিডেন্স। রাশিচক্রের ফের কিনা তা বলা মুস্কিল।

কর্পোরেট অফিসের সেই মহা ধুরন্ধর লোকটি। বিপুল

বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ দিন চলে যাচ্ছিল ফাটকা বাজির ব্যবসা করে। চীফ পিয়ারোর ঠাণ্ডাঘরে বসে স্টক ব্রোকারদের সঙ্গে কথাবার্তা। টেলিফোনের খরচ কোম্পানীর। দরকার হলে দু-একটা এসটিডি, বম্বে অথবা কোলকাতায়। শেয়ারের ভাও জানাও জনসংযোগের কাজ। বলা তো যায় না। এম্ ডি যদি হঠাৎ জানতে চান কোন্ শেয়ারের কতো দাম। সুখে ছিল বিপুল। হঠাৎ কেন যে সাপের মাথায় পা দেবার দুর্মতি হল তা ঈশ্বর জানেন। সাপ বিষাক্ত জীব। অপমানের প্রতিশোধ নেবেই। অস্থায়ী সি এম্ ডি যদি বদলী করেই থাকেন তাতে আইনগত ত্রুটি কিছু নেই। দীর্ঘ একুশটি বছর এক কুর্শিতে বসে মোড়লাগিরি করেছ। এবার দুনিয়াটা দেখ। পানীটোলা ভারতবর্ষের বাইরে নয়। দেশের বাইরে তো পাঠানো হয়নি। একে শাস্তি হিসেবে মনে করার কি আছে ? এতো শান্তির প্রস্তাবও হতে পারে। অত লম্ফঝম্ফের কোনো প্রয়োজন নেই। ওখানে যারা কাজ করে তারা সবাই এদেশের নাগরিক। ভুললে চলবে কেন হ্যাম সব ভারতীয় হ্যায়।

পানীটোলায় রয়েছে হাজারিকা। সিনিয়ার পিয়ারো। বেশ সুখেই আছে দীর্ঘ পনের বছর। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরীতে ঢুকেও কেমন তরতর করে উঠে গেছে খ্যাতির উচ্চশিখরে। ও হলো জনপ্রিয় জনসংযোগ কর্তা। কারখানায় অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের যিনি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে আসুন হাজারিকা তাঁদের ত্রাণকর্তা। আসামের জঙ্গলে বুনোহাতী বশ করতে হলে ওর মতো মাহুতের খুবই দরকার। কর্তৃপক্ষকে শুধু সেবায় সন্তুষ্ট করে সিনিয়ার পিয়ারোর পদে পাকা হয়েছে। বছর বিয়ানো গাইয়ের মতো প্রতি বছরেই একটি করে প্রমোশন। অবশেষে সর্বঘটে কাঁঠালীকলা পিয়ারো করেছে কর্তৃপক্ষ। জনসংযোগ বিভাগের সর্বেসর্বা।

অধ্যাবসায়ে কী না হয় ? বেচারা এনজিনীয়ারগুলো বছরের পর বছর জুনিয়ার পোস্টে খাবি খাচ্ছে। কারখানায় তেমন উৎপাদন নেই। নেই পরিকল্পনার কোনো সম্প্রসারণ। শুধু টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন থাকলেই তো হবে না। প্রমোশন দিয়ে পাঠাবে

কোথায় ? অথচ দেখ ঐ হাজারিকাকে খুশীতে ডগমগ। জি এম্ সর্বক্ষণ ডেকে পাঠাচ্ছেন। গাড়ী চাই, গেস্ট হাউজ চাই। চাই চট জলদি বিমান-টিকিট। সব মুস্কিলের আসান হলো সিনিয়ার পিয়ারো। শুধু কি অফিসেই ওর প্রভাব ? নিশ্চয়ই নয়। অফিসের বাইরে ক্লাব-জীবনেও ও এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। দাবা, তাস, নেশা—সর্বত্রই ওর উপস্থিতি। জুয়োতে জমে গেলে জরুকে পর্যন্ত ভুলে যায়। জরু, মানে মিসেস্ হাজারিকার সঙ্গে এ ব্যাপারে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। ওরা উভয়েই সে চুক্তি মেনে চলে। সন্ধ্যার পর মিসেস্ হাজারিকা ক্লাবে এলে মিস্টার থাকে বাংলোয়। সে সন্ধ্যায় ওর ঘরে বসে ভ্যাট-৬৯ ধ্বংস করার পালা। হাজারিকা গিন্নী শুধু সুগৃহিণীই নয়, পটু খেলোয়ারও বটে। প্রায় সব ধরণের ইনডোর গেম্সেই পারদর্শী। তার প্রতিপক্ষ হবার বাসনায় অনেক যুবক অফিসারই আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করে। শোনা যায়, ওয়ান ইজটু ওয়ান খেলায় সে সবসময়ের চ্যাম্পিয়ান। দুষ্টু লোকেরা বলে, হাজারিকার আত্মপ্রকাশের মূলে আছে ওর ধর্মপত্নীর অসামান্য অবদান।

কর্পোরেট অফিসে চাকরী করে বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায় ভালভাবেই জানে পানীটোলা থেকে হাজারিকাকে সরানো শিবেরও অসাধ্য। তবে কেন ভার্মাসাহেব ওকে পাঠালেন ওখানে ? ভার্মা সাহেব দাবার চালে ওস্তাদ। কতো চেয়ারম্যান এলো, আবার চলেও গেল। কিন্তু তিনি একমেবম্ অদ্বিতীয়ম্ ! একেবারে মৈনাকের চূড়োর মতো সদাজাগ্রত। তাঁর ছক মতো বিপুলকে পানীটোলা পাঠানো মানেই পাঁঠা বলি শেষ। আর বাবা, বাঙালী হয়ে পানীটোলায় চাকরী করা কি সহজ কথা ? প্রাণের ভয়ে ব্যাটা ব্যানার্জি ওখানে যাবেই না। ঠ্যাঙ্গানীর ভয়ে হয়তো কাজে ইস্তফা দেবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হবে। কিন্তু বিপুলকে তাঁর জানা নেই পুরোপুরি।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের ভ্রূণপর্ব থেকে যে ব্যক্তি জনসংযোগের মন্ত্র পাঠ করে আসছে তার সব পুজোই জানা। সে জেনে গেছে অভিনন্দন আসছেন। তিনি আসছেন রণ-দামামা পিটিয়ে। স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ কপালে এঁকে। যুদ্ধ লাগলো বলে।

তাই দুর্যোধন বধে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়। জয় হবে সুনিশ্চিত! আসল নায়ক তো এলো বলে। রাত পোহালেই অন্ধকারের অবসান। পূর্বদিগন্তে দেখা দিয়েছে সূর্য রশ্মি।

*　　　　*　　　　*

রামনগরের পরম্পরা প্রতিপালনে কেউ ত্রুটি রাখে নি। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নির্মলকুমারের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো। জনসংযোগ বিভাগ এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। অশোক প্রথম জীবনে দয়াল সাহেবের কাছ থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষালাভ করেছে। ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট লেখা আর পিয়ারোর ফেয়ারওয়েল পার্টি পরিচালনা করা অতি সাধারণ ব্যাপার। নতুন পরিবেশে শ্যামসুন্দর সহযোগিতা করেছে। সভাশেষে ফুলের মালা গলায় পরে জি এম চলে গেলেন। সোজা বারাউনী স্টেশন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরতে হবে মিথিলা এক্সপ্রেস। পরদিনই নন্দীগ্রামে নতুন কার্যভার।

সন্ধ্যায় নির্মলকুমারের প্রস্থান। পরদিন ভোরে মোকামাতে নামলেন নতুন জি এম্ হুংকারনাথ ঠাকুর। মিস্টার এইচ্ এন্ ঠাকুর অফ নন্দীগ্রাম কারখানা। সেখানে কোনো কাজ নেই। অযথা একজন জি এম্ পুষে লাভ কি? তাই অভিনন্দন সাহেব টেলেক্স মাধ্যমে সব বন্দোবস্ত পাকা করে রেখেছেন। নির্মলের প্রস্থান মানেই হুংকারের আগমন। নন্দীগ্রাম কারখানায় কোনোদিন চিমনী থেকে ধোঁওয়া দেখা যায় নি। যন্ত্রপাতিগুলো কোটি কোটি বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে কখনো চালানো হয়নি। উৎপাদনের প্রশ্নই অবান্তর। তবুও প্রতি মাসে ওয়াকার্স ওটি সতের লক্ষ টাকা। মাস গেলে শুধু বেতন বণ্টনের জন্য একজন টেকনোক্র্যাটের দরকার নেই। সে কাজ পাশ করা একজন অ্যাকাউণ্টেণ্টই করতে পারে। হুংকারনাথকে তাই পাঠানো হলো রামনগর। তিনি এসেই গতানুগতিক মিটিং। পরিবেশিত হলো সেই একই পুরানো পানীয়। বোতলটা শুধু নতুন। একই উপদেশ, প্রতিশ্রুতি এবং দেশকে স্বনির্ভর করার অঙ্গীকার। সারা দেশের কৃষক--

ভাইয়েরা তাকিয়ে আছে এই কারখানার দিকে। পর্যাপ্ত সার উৎপাদন মানেই খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা। শুধু তাই নয়। খাদ্য রপ্তানীর সুযোগও আছে।

হুংকারনাথ ভাষণ দিলেন গড়ের মাঠের নেতার সুরে। আপনারা আমায় সহযোগিতা করুন। আসুন, আমরা সবাই মিলে ভারতের শিল্প মানচিত্রকে শক্তিশালী করে তুলি। তাঁর দার্শনিক কথা তেমন সাড়া জাগাতে পারলো না বিভাগীয় প্রধানদের। কনফারেন্স রুমে যারা সব উপবিষ্ট তাদের অনেকে ছিল আজকের প্রবক্তার বস্। শুধু তোষামোদের জোড়ে হুংকারনাথ আজ জেনারেল ম্যানেজার। আর অভিজ্ঞ এনজিনীয়ারগণ শুধু উপদেশ শোনার দলে ভীড় করেছে। ওরা সব বসে আছে নতুন জি এমের সামনে। কিন্তু মন চলে গেছে এই প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের ইতিহাসের পাতায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এর পরিণতি। জননেতারা সব অবগত আছেন। তবুও ভোটতরণী পার হতেই হবে। গণতন্ত্রের এই হল পরিহাস!

অশোকের অফুরন্ত সময়। কোনো কাজেই মন নেই। লোকসানী প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগের কোনো বাজেট নেই। সবাই জেনে গেছে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান হলো ফকোটিয়া কোম্পানী। জনগণের অর্থে বাবুগিরি করার বন্দোবস্ত। এর বর্তমান টলটলায়মান। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বর্তমান আছে তাই মাসান্তে মোটা টাকার পে-প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে। তবে যে-কোনো দিন তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভিক্ষা বন্ধ করা কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নয়। যে কোনো মুহূর্তে সরকার বলে দিতে পারে, অনেক দিয়েছি। আর নয়। দিয়েছি জামা। দিয়েছি জুতো। তোমরা জনগণকে দিচ্ছ সেই জুতো ফেরৎ। এই নড়বড়ে অবস্থায় পিয়ারোর পক্ষে জনসম্পর্ক বজায় রাখা বেশ কঠিন কাজ। ভিজিটার্স বলতে স্থানীয় পত্রকারের দল। তারা ভীড় করে। তবে খবরের জন্য নয়, খাবারের জন্য। দুপুরের অতিথিকে আপ্যায়ন করতেই হয়। আপ্যায়নের উপকরণ খুবই সামান্য। সেই লাড্ডু আর চা। অশোক হিন্দীতে কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। তারা জেনে গেছে ওঁকে দিয়ে কোনো উপকার হবে না। হিন্দী অফিসার তাদের উস্‌কে দেয়। নয়া পিয়ারোকে জব্দ করার রিহার্সাল চলে তার ঘরে। ঘরের শত্রু বিভীষণ এক

একজন। শ্যামসুন্দর কৌশল করে অনুপস্থিত থাকে। নয়া বাঙালীকে জব্দ করার নাটক জমে ওঠে।

দৈনিক পত্রিকায় শিরোনাম পায়, রামনগরে হিন্দীর অবজ্ঞা। সঙ্গে সঙ্গে পেপার ক্লিপিং চলে গেল দিল্লীতে। হিন্দী সম্প্রসারণ বিভাগের চূড়োয় বসে আছেন নামকরা পার্লামেণ্টারিয়ান। সেই খবর নিয়ে লোকসভায় হৈ চৈ। এতসব ঘটে গেছে দিল্লীতে অথচ অশোক কিছুই জানে না। হিন্দী সমাচার পাঠে ওর অজ্ঞতা আছে। পুরো ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলেছিল মহাবীর প্রসাদ। পি এর যথার্থ কর্তব্য সে পালন করেছে। রামনগরে বসে হিন্দীর অবমাননা গর্হিত এক অপরাধ। হুংকারনাথ নতুন কার্যভার নিয়েছেন। তাঁর আছে হাজারো সমস্যা। কোথাকার কোন্ পিয়ারো বধ হলো তাতে কিই বা এসে যায়? তাঁর কাছে জন-সংযোগ বিভাগ মানেই ব্রজবাসী দাস। ডাকো ওকে। তারপর ধমকে দাও একচোট। ব্যস্, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওসব ইউনিয়ন ফিউনিয়ন মানি না। আগে কাজ, তারপর মেজাজ। হুংকারনাথ জানিয়ে দিলেন তাঁর বক্তব্য ব্রজবাসীর মাধ্যমে। ট্রেড ইউনিয়ন লীডার পাশোয়ানজী তো রেগে আগুন।

এ কোই বাৎ হ্যায়। সালেকো জুত্তি মারকে ভাগায়েঙ্গে। রামনগর কো ক্যায়া সামঝ্তে হ্যায়।

ব্রজবাসী তখনো চাকরীতে পাকা হয়নি। কনফার্মেশন জি এমের হাতে। ওর হয়েছে উভয় সংকট। লীডারজীকে চটালেও বিপদ আবার জি এমের আদেশ অমান্য করলেও ঘোরতর বিড়ম্বনা। দুই বিপদের মাঝখানে পার্সোন্যাল ম্যানেজমেণ্ট হলো ক্যাটলিস্ট। ব্রজবাসীকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতেই হলো তারিকালীর কাছে। আরে ভাই তারিক, তুই থাকতে আমার এই বিপদ। তুই ভাই আমায় বাঁচা। আমার শিরে সংক্রান্তি। তারিকালী অফিসারের আবরণে এক ধুরন্ধর ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। মজদুর সংগঠনের মনোভাব ওর জানা। আবার কর্তৃপক্ষের দুর্বলতাও পরিমাপ করা আছে। এই মওকায় নিজের কাজ হাসিল করার পরিকল্পনা ওর মনে। যদি পাশোয়ানকে পাশ কাটাতে পারে

আর ব্রজবাসীকে জবাই করতে কৃতকার্য হয় তবে পরবর্তী প্রমোশন ওর পাকা। হুংকারনাথ নতুন এসেছেন। বিয়ের রাতেই বেড়াল মারতে হবে। ওকে প্রমাণ করতে হবে রামনগর কারখানার লেবার প্রব্লেম ও একাই সমাধান করতে সক্ষম। ব্যাটা ব্রজবাসী এক অকাজের গোঁসাই। একটা বড় পোস্ট দখল করে আছে। অথচ বুদ্ধির ঢেঁকি।

রামনগর সত্যিই রামরাজত্ব। পাশোয়ানজী প্রতিদিন কারখানা পরিদর্শনে আসে। মজদুর সংঘের অফিসে বসে। নানা আলাপ আলোচনা এবং খৈনী সেবনে সময় চলে যায়। কারখানায় তার কোনো কাজ নেই। সে ফুলটাইম লীডার। মজদুরের মহারাজা। মজদুর যদি দুগ্ধ দোহনে খুশী সে তবে সর সেবনে তৃপ্ত। এমন মজার সৌখিন মজদুরী আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তারিকালী বরিষ্ঠ আধিকারিক। সিনিয়ার পার্সোন্যাল অফিসার। অফিসে আসে সহকর্মীর ঘাড়ে চেপে অর্থাৎ স্কুটারের পেছনে বসে। মাসে আয় দুশ টাকা। স্কুটার অ্যালাউন্স। সারাদিন ফ্যানের নীচে বসে কর্তৃপক্ষের কোষ্ঠী খুলে গোষ্ঠী উদ্ধার। জি এমের ঘরে ডাক পড়লেই ভেজা বেড়াল। বিনয়ের অবতার।

স্যর, আমি থাকতে কোনো চিন্তা নেই। এখানকার কমরেড লীডারজী আমার বগলদাবায়।

হুংকারনাথ ওর কথা বিশ্বাস করে। কাজের দায়িত্ব ওকেই দেয়। মিস্টার আলী, ইউ প্লীজ গো টু ডেলহী। ওখানে যেয়ে এই একশ ষাটের জটটা ছাড়িয়ে এসো।

জি এমের কথা শেষ হওয়ার আগেই একখানা টিএ ফর্ম সই করিয়ে নেয় তাঁকে দিয়ে। যেন এক গণৎকার। সব ভবিষ্যৎই ওর জানা।

বেচারা ব্রজবাসী ভাবে, এ আমি কোথায় এলাম। ছিলাম ভাল মুর্গাসোলে। ওখানেও ইউনিয়নের হুমকি ছিল। কিন্তু ওরও ছিল বড় বড় রাঘববোয়াল খুঁটি। কি কুক্ষণে যে সার্বজনিকের স্বপ্ন দেখলাম। কল্যাণেশ্বরীর বাবাজী ঠিকই বলেছিলেন। যাচ্ছিস্ যা। তবে খুব সাবধান। ওখানে জাতপাতের লড়াই।

টিকতে পারবি তো? কিন্তু বিনা প্রতিযোগিতায় এমন একটা লোভনীয় পদ তো আর যা তা ব্যাপার নয়। মাত্র দশ হাজারের সেলামীতে চাকরীটা হয়ে গেল। চাকরী হলো বটে, সেই চাকরী টিকিয়ে রাখা মহা সমস্যা। ঘরের শত্রু বিভীষণ হলো এই ব্যাটা তারিকালী। সামনে দাদা দাদা, পেছনে বংশদণ্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাও আবার আছোলা। কখন যে কোথায় ঢুকিয়ে দেয় তা শুধু ঈশ্বর জানেন।

পাশোয়ানজী তারিকের স্তাবকতা করলেও সে ভালভাবেই জানে ও হলো ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড। কর্তৃপক্ষের মাথায় টুপি পরিয়ে হিল্লী-দিল্লী সফর করে। পকেটে রেখেছে লাল সাংসদের লেটার হেড। আবার কংগ্রেসের তেরঙ্গা পতাকাও পকেটে রাখে রুমালের ছদ্মবেশে। বলা তো যায় না। কখন, কোন্ পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। লীডারজী জানে, তারিকের অনেক তুক-তাক্ জানা আছে। তাদের কেচ্ছা যদি সংসদের সভাকক্ষে তুলে ধরে তবে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভর্তুকি বন্ধ হলে ভাত বন্ধ সবার। তাই নেতা তথা চামচেবাবুকে না চটিয়ে আখের গুছিয়ে নাও। চামচাকো তিন দাওয়াই—'লাথম্, জুত্তোম্, আউর পিটাই'। স্লোগান লেখা আছে কোম্পানীর ডিউটি বাসে যেমন কোলকাতার বাসে লেখা থাকে 'পকেটমার হইতে সাবধান।' কিন্তু চাম্‌চেকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না। পাশোয়ানজী জানে, আলী-সাব এক নম্বর লেক্‌চারবাজ। তার থেকেও ভয়ংকর কথা হলো, বড় সাহেবের কানে কথা তুলতে ওস্তাদ। উদ্দেশ্য নিজেকে জাহির করা এবং অবশ্যই ফয়দা তোলা। ধরিবাজ তারিক ভাবে, সে ছিল ভাল কোলকাতায়। ছিল নেতার সম্মান, ছিল সারা মাসের ট্যুর। তার মানে ট্যাক্‌স-ফ্রী ইন্‌কাম।

ভার্মা সাহেব কর্পোরেট অফিসে বসে রাজত্ব সামাল দেন। তাঁর সঙ্গে তারিকালীর আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিল খুব ভাল। ওঁর সোজা ফর্মুলা।

তুম্ আপনা ধান্দা দেখো, হাম দিল্লী সামাল লেঙ্গে। কোলকাতার ক্রাউডকে তুমি সামলে রাখো। ওদের স্লোগানকে লেনিন মূর্তির

পাশেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করো। আলী, তোমার দিল্লী ট্যুর পাকা। যখন ইচ্ছে চলে এসো। অ্যান ওপেন অফার টু ইউ।
এত সুবিধা, এত সুখ সহ্য হচ্ছিল না। অভিনন্দন সাহেব এমন ওস্তাদ সাপুড়ের মাথায়ও ছোবল মারলেন। পাঠালেন রামনগর। বদলী যখন করেছে কর্তৃপক্ষ তখন তার বদলা নিতেই হবে।

নতুন জায়গায় পেঁছেই তারিকালী রামনগর বিজয়ের ছক এঁকে ফেলল। এই জাতপাতের রাজত্বে তাকে প্রতিষ্ঠা পেতেই হবে। চলতে হবে সংগঠিত হয়ে। তৈরী করতে হবে মজদুর ভজনের জন্য এক কীর্তনীয়ার দল। দলের গায়কেরা কর্তৃপক্ষের কাছে ওয়ার্কারদের সুখ্যাতির সুর ভাজবে। তারিক অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছে কারখানার রাজনীতিতে ওয়ার্কাররাই সর্ব-শক্তিমান। ওদের হাতে রাখো। কনফারেন্স রুমের গোপন আলোচনায় কর্তৃপক্ষ যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তার দু-একটি চুট্‌কি কমরেড লীডারদের কাছে ছেড়ে দাও। সেইসব গুজবের খবর পেয়ে তারা আস্তাকুঁড়ের কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসবে। সে জানে ওদের ব্যস্ত রাখতে হবে নানা ইস্যু দিয়ে। তবেই তার হবে ফয়দা। কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠাবে। সমস্যা সমাধানের ভার পড়বে তার ওপর।

নয়া চেয়ারম্যান সাফ কথায় বলেছেন, ওসব ইউনিয়ন, অ্যাসো-সিয়েশন মানি না। সব ঘুঘুর বাসা আমি ভাঙ্‌বো।

তারিকালী কি ঘুঘুর বাসার বাসিন্দা? সে শেষ চেষ্টা করেছিল পলিটিক্যাল-দাদাকে পায়ে ধরে। প্রভাবশালী এম পি মশাই কড়া চিঠিও লিখেছিলেন। আলী মাস্ট নট বী ডিস্টার্বড। হী শুড স্টে ইন ক্যালকাটা ফর সামটাইম। কিন্তু অভিনন্দন সাহেব এইসব ঝোড়োচিঠির কোনো গুরুত্ব দেন নি। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ। আগে যাও নতুন কর্মস্থলে, তারপর শোনাও তোমার বেদনার ইতিহাস। অর্থাৎ পইলে গদী ছোড়ো, তারপর দেখাও চোপা। কোলকাতায় বসে সে অনেক ব্ল্যাক মেইল করেছে। সো হী শুড্ বী কীক্‌ড আউট ফার্স্ট। কথাটা দুটো প্রত্যয়ের সঙ্গে সমঝে

দিয়েছেন অভিনন্দন সাহেব। পুরো নব্বইদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাড়ীতে বসে থেকেও হয়নি মুশ্কিল আসান। রামনগরের অন্ন তাকে নিতেই হয়েছে। প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য বাহবা দিতে হয় অভিনন্দন সাহেবকে।

ব্রজবাসী দাস বড়ো বেকায়দায় পড়েছে। ওর ভাবমূর্তি ধূলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য সহকর্মী তারিকালী আদাজল খেয়ে লেগেছে। সে বুঝে ফেলেছে মোদ্দা কথা। রামনগরে তাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে। কর্তৃপক্ষকে দেখাতে হবে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাকে এখানে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন জাতপাতের লড়াইকে জিইয়ে রাখা। এই একটা স্থানীয় সমস্যা। সমস্যার বৃক্ষকে রোজ জলসিঞ্চনে বলিষ্ঠ করে রাখতে হবে। আর নাচাতে হবে ব্রজবাসীকে। ওর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের কাহিনীটা বেশ রসিয়ে প্রচার করতে হবে। সে জানে এক আকাশে চন্দ্র সূর্য শোভা পেতে পারে না। হুংকারনাথ নতুন দায়িত্বভার নিয়েছেন। রামনগরের আবহাওয়ায় তাকে মানিয়ে নিতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন পার্সোন্যাল ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করা। জি এমের কাছে ব্রজবাসীর স্বরূপ উদ্ঘাটন কিভাবে করতে হবে সে কৌশল তারিকের নখদর্পণে।

কর্মক্ষেত্র এক যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে প্রতিটি সহকর্মীই এক একজন শত্রু। এখানে সর্বদাই লড়াই। লড়াই বাঁচার, লড়াই মর্যাদার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার। এখানে মিত্রতার কোনো অবকাশ নেই। অরির শেষ কখনো রাখতে নেই। শাস্ত্রে তাই বলে। অল্পদিনের মধ্যেই তারিকালী সহকর্মীর নিন্দায় কর্তৃপক্ষের হৃদয় জয় করে ফেলল। হুংকারনাথ ব্রজবাসীকে বিশ্বাস করে না। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তারিককে ডেকে পাঠান। তাকে পরামর্শ দেন, আলোচনা করেন। ব্রজবাসী জগন্নাথের মতো নিজের ঘরে বসে সময় কাটায়। কোনো ফাইল আসে না ওর কাছে। পাশোয়ানজী সর্বদাই তারিকের কামরায় বসে খৈনী টিপছে।

ডিপার্টমেণ্টে ব্যস্ত অফিসার তারিকালী। ব্রজবাসীর তরপানি শুধু পান্থনিবাসের পনের নম্বর ঘরে। অশোক ওর একমাত্র

শ্রোতা। তাকে দেখলেই ওর গল্পের ফ্লো এসে যায়। শুরু হয় ওর অতীত বিচরণ।

বুঝলেন কিনা মিস্টার মিট্রা। সেবার লিচুবাগানে লাল্টু কারখানায় ধর্মঘট। সব ওয়ার্কাররা আমাদের টাউনশীপ ঘেরাও করে বসে আছে। নো নড়ন চড়ন। ঘরের খাবার দাবার সব শেষ। দুশ্চিন্তায় বাহ্যিপেচ্ছাপ বন্ধ।
এম্ ডি আমায় ডেকে বল্লেন, ব্রজবাবু, ইউ মাস্ট ডু সামথিং। কিছু একটা কর। এভাবে তো আর চলতে পারে না অনন্তকাল।

চলে গেলাম কোলকাতায়। ভোরের অন্ধকারে এক লুঙ্গি পরেই পালালাম। তারপর সেখানে যেয়ে পাকরাও করলাম দৈনিক আন্দোলন পত্রিকার নিউজ এডিটারকে। বেলা তখন বারোটা। বল্লাম, দাদা। কিছু একটা করতেই হবে। আমাদের লিচুবাগান লাট্টু কারখানায় স্ট্রাইক। অফিসারদের প্যাঁদাচ্ছে সংঘবন্ধ ওয়ার্কারের দল। নিউজ এডিটর ব্যস্ত লোক। লানচের টেবিলে সব খুলে বলতে হবে তাকে। নিয়ে এলাম পার্ক স্ট্রীটে। সূর্য কিরণ রেস্তোরাঁয় অফিসিয়াল লানচ। সঙ্গে তার আরো পাঁচজন সাংবাদিক। তারপর সেখানে গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়ালাম সবাইকে। ঘণ্টা দুয়েকের ভোজনপর্ব শেষে দাঁতে টুথ-পিক্ খোঁচাতে খোঁচাতে বার্তা সম্পাদক প্রসন্ন হাসিতে জানতে চাইলেন ঘটনাটা। বলুন ব্রজবাবু, কি করতে হবে?
দাদা, আমরা বড্ড বিপদে আছি। গত চোদ্দদিন একটানা ঘেরাও চলছে। খবরটা একটু বের করে দিতে হবে।

নো প্রব্লেম। হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। আজই যাবে ওটা। দরকার হলে পেজ-মেকাপ বদলে দেবো। উই আর অল ফর ইউ।

দৈনিক আন্দোলন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় খবরটা প্রকাশিত হয়েছে। লিচুবাগানে লালঝাণ্ডার আক্রমণ। বক্স করে সংবাদটাকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। পরদিন ভোরে কাগজ খুলে অবাক! সত্যিই, সে কি আনন্দ। চায়ের টেবিলে সি এম্ একমাত্র দৈনিক আন্দোলন পত্রিকাতেই চোখ বোলান। তাঁর চোখ তো ছানাবড়া।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন ডি এমকে। দেখুন তো, লিচু বাগানে হচ্ছেটা কি ? তারপর বেলা দশটার মধ্যে হুলুস্থুল ব্যাপার। এম্ ডি আমায় ডেকে বল্লেন, ব্রজবাবু ইউ আর গ্রেট !

লিচু বাগানের গল্প যেন আর শেষ হয় না। অশোকের হয়েছে মুস্কিল। এই গুলিখোরের গল্প শোনার ইচ্ছে নেই, আবার অভদ্রভাবে উঠে আসতেও পারে না। আফ্টার অল ব্রজবাসী ইজ হিজ বস্। ছুটি-ছাটা; এট-ওটা সই করাতে ওর কাছে যেতেই হয়। পান্থনিবাসেও পাশাপাশি ঘরের বাসিন্দা। অফিস আওয়ার্সের পর ব্রজদার কাঁদুনী শুনতে হয়। ঘরের মধ্যে বস্ একটু সংক্ষিপ্ত বস্ত্রে থাকতে ভালবাসে। খয়রাশোলের চাষা হয়েছে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের পার্সোন্যাল ম্যানেজার। পি এম্ অফ অ্যান আনপ্রডাক্টিভ কোম্পানী। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস যাবে কোথায় ? লেংটির বদলে লুঙ্গি। পরিবর্তন অথবা প্রমোশন সত্যিই চোখে পড়ার মতো। আরে বাবা, লুঙ্গি তো অনেকেই পরে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সামাজিক পোষাক। তাকে অবমাননা করলে চলবে কেন ? তবে অন্তর্বাস পরতে তো কেউ বারণ করেনি। সেখানেও ব্যয় সংক্ষেপ। ফকির রাজা হলেও তার মনটা পড়ে থাকে ঝোলার দিকে। অশোক ওর পাশে বসতেও ঘেন্না করে। কথায় কথায় থুথু ছিটোয়। আর সেই খরগোস দন্তের হাসি। সেই এক কাসুন্দি। বুঝলেন কিনা মিস্টার মিট্রা। সে ছিল একদিন।

ওর কথা শুনতেই হয়। ওর পাশে বসতেই হয় অশোককে। তবুও তো বস্। বস্ মানেই বাঁশ। যে কোনো মুহূর্তে চণ্ডাল মূর্তি ধারণ করতে পারে। অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে ওর কথায় সায় দিতে হয়। আর যাই হোক, মাতৃভাষায় কথা। সেটাই সান্ত্বনা। সারাদিনের খৈনী-কালচারের পর সন্ধ্যায় এসব খোসগল্প মন্দ লাগে না। সময়টা কাটাতে হবে তো। অশোক তাই ব্রজদার কীর্তন শ্রবণে ক্লান্তি অনুভব করে না। একঘেয়েমি এলেও তা প্রকাশ করে না। ব্রজবাসীর কীর্তনের পালা বদলের সময় তারিকালী প্রসঙ্গটা এসে যায়। তাতেই বেশ

কাজ হয়। আবার শুরু হয় ওর সেই রক্তাপচা কাহিনী। হোয়েন আই ওয়াজ ইন হ্যান্ড লক্‌ অ্যালিস জুট মিল।

জুটমিলের জীবন ছিল বেশ আনন্দের। তেমন কোনো দায়িত্ব নেই। মালিকই সব দেখেন। ডিসিশন নেন। আমাদের রেখেছিল শুধু লেবার অ্যাক্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখানোর জন্য। কাজের শেষে মাগীগুলো কতো ঢঙ্‌ করতো।

না, না হাসবেন না। ব্রজদা গল্পে ছেদ টেনে বলে ওঠে। কথাটা মোটেই অশ্লীল নয়। আপনি হয়তো জানেন না। পাটকলে মহিলা মজদুরকে মাগী বলে ডাকে। কোনো এককালে সাহেব ম্যানেজার হয়তো কোনো মহিলা কর্মীকে 'ম্যাগী' বলে সম্বোধন করেছিল। সেই ম্যাগী, মানে মার্গারেটের অপভ্রংশ হিসেবেই ব্যবহৃত 'মাগী' শব্দটি। ওসব ভাষাতত্ত্বের ব্যাপার আমার জানা নেই। তবে হ্যা, শালার মাগীগুলোও ছিল বেশ লোফালুফির জিনিস। ওদের কাজ ছিল দিনের বেলায় একটু হাল্কা ফাই ফরমাস করা। আর সন্ধ্যার পর ব্যাচেলার বাবুদের সেবা করা। ব্যবস্থাটা ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। বুঝলেন না মশাই। ওরা এসেছিল বাণিজ্য করতে। অল্প সময়ে উপলব্ধি করেছিল যে চটকলের এই নোংরা পরিবেশে কোনো ভদ্র পরিবারের ছেলে আসবে না। চাকরীর মোহ যদিও বা থাকে, কিন্তু থাকতে চাইবে না কারখানা প্রাঙ্গণে।

কারখানায় বাবু চাই। বাবুদের আকর্ষণ করার জন্য চাই বিবি। যেকোনো ফন্দি করেই হোক, রাখতে হবে লেবার অফিসার। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। আরে মশাই, ওখানেই তো তারিকের সঙ্গে আমার পরিচয়। ও ছিল ব্যাচেলার। আমি বিবাহিত হয়েও বাধ্যতামূলক চিরকুমার। বৌ থাকে পিত্রালয়ে। মাসে একবার হয়তো যাই। দুরাত থেকে আবার সেই গঙ্গার পার নৈহাটি। বাড়ী যেয়ে হয়তো দেখলাম বৌ-এর তখন চলছে লাল সংকেত। টেকনিক্যাল শাটডাইন। কি আর করা যাবে? আবার জুট মিল, অফিসার্স মেস্‌ এবং একটু নেশা করে মাগীগুলোর সঙ্গে ঢলাঢলি। চটকলের গ্যারাকলে পড়লে বেরিয়ে আসা মুস্কিল। সে এক গোলকধাঁধাঁ।

অশোক কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করেছিল।

আচ্ছা ব্রজদা, বেশ তো ছিলেন হ্যাভ লক অ্যালিস্ জুট মিলে। ওয়েলফেয়ার অফিসার। কাজ ছিল সপ্তাহান্তে ওয়ার্কার পেমেন্ট করা। নগদ পেমেন্ট আর আন ক্লেইমড পে-প্যাকেটগুলো পকেটে পুরে কোলকাতা এসে ফূর্তি করা। সেই সুখের চাকরী ছেড়ে এই মরাখেকো কোম্পানীতে এলেন কেন ?

সেসব অনেক কথা মিস্টার মিট্রা। আরেকদিন হবে। কি করে নৈহাটি থেকে গৌহাটি গেলাম। তারপর গৌহাটি ছেড়ে রামনগর। সে এক লম্বা সফর। তারপর আবার শুরু ব্রজদার নতুন গল্প।

গৌহাটিতে কোনোদিনই যেতে হয়নি আমাকে। ব্রজদা তার গল্পের নতুন দিগন্তে পারি দেয়। গৌহাটির কাছেই এক চা বাগানে ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরী নিতে হলো আমাকে। কাজের দায়িত্ব যতটুকু তার চেয়ে মাইনে অনেক বেশী। তবে থাকতে হবে নিতান্তই নির্জন পরিবেশে। নির্বান্ধন পরবাসে কে আর থাকতে চায় ? তাই চা বাগানের কর্তৃপক্ষ সঙ্কেতে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কোলকাতার দ্য ডেস্টিনী পত্রিকায়। ইণ্টারভিউও কোলকাতার এক হোটেলে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। শুধু তাই নয়। নিয়োগপত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি বিমান টিকিট। অর্থের লোভে আমার জীবনে প্রথম বিমান সফরের অভিজ্ঞতা। গৌহাটি বিমানবন্দরে রাখা ছিল কোম্পানীর গাড়ী। অবশেষে পৌঁছে গেলাম পানবাড়ী চা বাগানে। এক অজ্ঞাত অপরিচিত চা বাগানে। এখানে কাজ খুবই হাল্কা। কুলি-কামিনের সুযোগ সুবিধা দেখা। তাদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং শিশুদের শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ করে দেওয়া আমার প্রধান কাজ।

বাগিচা মালিক নতুন অফিসার নিয়োগ করেন কিন্তু কেউই ধোপে টেকে না। এখানে আসে বটে কিন্তু পালিয়ে যায়। নিরিবিলি নির্জন পানবাড়ীতে কেউ থাকতে চায় না। মন বসাতে পারে না। লোকজন খুবই কম। পাঁচজন বাবু আর পাঁচশজন কুলি। সবার ওপরে খবরদারী করার জন্য বসে আছেন ম্যানেজার সাহেব। বুঝলেন কিনা। ওখানে পৌঁছে দেখি আমার জন্য সব পাকা বন্দোবস্ত।

গেস্ট হাউজে থাকার বন্দোবস্ত। আর আহারের ব্যবস্থা খোদ ম্যানেজার কুঠীতে। সারাদিন দায়িত্ব বুঝে নেবার উত্তেজনা, সন্ধ্যায় ম্যানেজার বাংলোয় ডিনার আর রাতের শয়ন ব্যবস্থা গেস্ট হাউজে। রাত তখন নটা হবে। পানবাড়ীর বুকে অন্ধকারের প্রলেপ। ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলোও ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নেকড়েগুলো শিকারের অন্বেষণে ব্যস্ত। শেয়ালেরা হুক্কা-হুয়ার সমবেত সঙ্গীত গাইছে। হয়তো বা নতুন অতিথিকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। বুঝলেন কিনা। ম্যানেজার বাংলো থেকে ফিরে গেস্ট হাউজের, ঠিক আমার ঘরের পাশে, দেখছি একটি ষোড়শী কাণ্ডী দণ্ডায়মান। ভাবলাম হয়তো গেস্ট হাউজের দেখাশুনা করা ওর কাজ। ঘরে ঢুকে দেখি সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। এবার দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলানোর পালা। হঠাৎ দরজায় করাঘাত।

রাতের চৌকিদার জানতে চাইছে, সব ঠিক আছে তো? আউর কুছ লাগে। ম্যানেজার সাব বোলা হ্যায় ই কাণ্ডী রাত মে রহেগা। আপ একেলা হ্যায় না? এ ধন্ধ কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বিছানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এক গ্লাস জলও রাখা আছে সাইড টেবিলে। বিছানার পাশেই বেড সুইচ। মশারীও টাঙানো আছে। সবই ঠিকঠাক। তবুও কাণ্ডী ঘরের পাশে বসে। বুঝলেন মিস্টার মিটরা। হ্যাভ লক অ্যালিসে অনেক মাগী চড়িয়ে এসেছি। কিন্তু এ এক নতুন পরিস্থিতি। অস্বস্তিকর আবহাওয়া। লেবার ল, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট, ওয়েলফেয়ার অফ দ্য স্টাফ সব বিষয়েই পড়াশুনা করেছি। একজন সাচ্চা এক্স এল আরের কাছে তবুও এ এক বিচিত্র পরীক্ষা! ঘণ্টাখানেক পর চৌকিদার দ্বিতীয় বার এসে খোঁজ নিয়ে গেল।

সব ঠিক হ্যায় হুজুর?

রাতের প্রহর বেড়ে চলেছে অথচ ঘরের আলো নিভছে না দেখে কর্তব্যপরায়ণ চৌকিদারের আরেক চিন্তা। ম্যানেজার সাহেবের আদেশ পালনে কোনো ত্রুটি হলো না তো? চটকলের গোড়া সাহেবের কাছে সব শিখেছি কিন্তু সেই মুহূর্তে কিছুতেই মনে এলো না যে চা বাগানের ম্যানেজারের এটাও কৌশল। নতুন লেবার অফিসারকে ধরে রাখার এক জৈবিক আকর্ষণ। সরকারী বিধি

অনুযায়ী পাঁচ শ কুলির বাগানে একজন ফুলটাইম লেবার অফিসার চাইই। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কাউকে রাখা যাচ্ছে না। শহর থেকে দূরে, নির্জন পরিবেশে কাঞ্চনের লোভই যথেষ্ট নয়। কামিনীর বন্দোবস্তও তাই রাখা হয়েছে পাশাপাশি। মশাই সারাটা রাত একটা বই পড়ে কাটাতে হলো। আর বেচারী কাঞ্চী সেই একই প্রকোষ্ঠে সর্বতোভাবে প্রস্তুত থেকেও নতুন সাহেবকে খুশী করার সুযোগ পেল না। কে জানে ওর হাজিরা কাটা যাবে কিনা। যার যা করনীয় তা না করলে বেতন থেকে বঞ্চিত হওয়াই সহজ প্রতিবাদ্য। বুঝলেন কিনা। আমি শুধু রাত পোহানোর অপেক্ষা করছিলাম। প্রথম পাখীর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাক-ভোরে বেরিয়ে পড়েছিলাম পানবাড়ী থেকে। তারপর সাত মাইল হেঁটে, বিশ মাইল বাস জার্নি করে পেঁছিলাম আমিনগাঁও স্টেশনে। এবং তারপর কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ওখান থেকে মিটার গেজের ট্রেনে চেপে রীতিমতো আটচল্লিশ ঘণ্টার সফর শেষে ঘরের ছেলে ফিরেছিলাম ঘরে।

*　　　　*　　　　*

তারপর কেটে গেছে কয়েকটি মাস। ব্রজদা বেকার। তবে গ্রামের জমিজমা থেকে চালটা মুলোটা পাওয়া যায়। বাবা নরহরি দাস সে ব্যবস্থা রেখে গেছেন। অর্থাভাব থাকলেও অন্নাভাব নেই। দীর্ঘদিন নানা প্রতিষ্ঠানের কাজ করে স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিল সে। হাতে অফুরন্ত অবকাশ। স্ত্রীর উষ্ণতার জন্য আর উইক এন্ডের প্রতীক্ষা নয়। প্রতিরাতে শয্যাসঙ্গিনী সে। একদিন উখরায় পিসির বাড়ী যাওয়ার পথে সমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সমীর সরকার ব্রজবাসীর কলেজের বন্ধু। তেঁতুলতলায় এক্সপ্রেস বাসটা দাঁড়িয়েছে। ভীড়ের চাপে তার পেয়েছে হিসির বেগ। ভাগ্যিস তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়েছে বাসটা। না দাঁড়ালে যে কী কাণ্ড হোত তা ঈশ্বর জানেন। নেমে পড়েছি তেঁতুলতলায়। আর ঠিক ওখানেই দেখা বন্ধু সমীরের। জামসেদপুরের পুরানো বন্ধুকে দেখে হিসি উঠলো মাথায়।

এবে শালা বজুয়া কোথায় চললি ? বিরাট চিৎকার করে সমীর

এসে জড়িয়ে ধরলো তার এক্স এল আর সহপাঠীকে। কোথায় আছিস? কী করছিস?

আরে সমীর। তুই এখানে কি করছিস? ব্রজবাসী প্রতিপ্রশ্ন করলো।

আমি তো বিধাননগর কারখানার সি পি ও। চীফ পার্সোন্যাল অফিসার। আর তুই?

আমি ভাই বেকার। লিচুবাগানেও কিছুদিন ছিলাম। তারপর চটকল, চা-বাগান ঠেঙিয়ে এখন খয়রাশোলে খাবি খাচ্ছি।

কী, চাকরী করবি? আমাদের প্রতিষ্ঠানে লোক নেবে। কর্পোরেট অফিসে পার্সোন্যাল ম্যানেজারের পোস্ট। আরে শালা, আমার বন্ধু হয়ে তুই চুপচাপ বসে আছিস। একটা খবর দিবি তো? শোন্, তুই কি ইণ্টারেস্টেড? তাহলে বল্, এক্ষুনি ব্যবস্থা করি।

কিন্তু সে তো অ্যাপ্লাই করার লাস্ট-ডেট পার হয়ে গেছে।

লিভ্ ইট উইথ মী। তুই একটা সাদা কাগজে অ্যাপ্লিকেশন করবি। শুধু তাই নয়। সঙ্গে হাজার দশেক টাকা আনবি। হ্যাঁ, অবশ্যই নগদ টাকা। শোন্, দরখাস্তে তারিখ বসাবি না। জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার ভাণ্ডারী সামনের শনিবার কোলকাতায় আসছেন। উনি উঠবেন হোটেল রাই বিলাসিনীতে। তোকে নিয়ে যাব। সব ফিট হয়ে যাবে। চাকরীটা আগে হয়ে যাক। তারপর বসের মেয়ের বিয়ের প্রীতি উপহার হিসেবে একটা সোনার নেকলেস্ প্রেজেণ্ট করিস। কেমন? আরে বাবা, যে দেবতার যেমন পুজো। শিবকে তো সন্তুষ্ট করতে হবে আগে।

ব্রজদার গল্প চলেছে একটানা। ইতিমধ্যে বাহাদুর দু-কাপ চা রেখে গেছে সেণ্টার টেবিলে। চায়ে চুমুক দিয়ে এবার ডাবল্ স্পীডে শুরু করলো তার অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা। বুঝলেন কিনা? মাথায় উঠলো আমার পিসির বাড়ী। আমি আর উখরায় গেলাম না। পরবর্তী বাসে ফিরলাম খয়রাশোলে।

তারপর শনিবার। হোটেল রাই বিলাসিনী এবং ভাণ্ডারী সাহেব —সবকিছু এক বিন্দুতে মিলে গেল। চাকরীটা আমার হাতে এলো। স্বয়ং ঈশ্বর যেন সেদিন সমীররূপে আবির্ভূত হয়ে

ছিলেন। ওর পরামর্শেই সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে এনট্রি পেলাম। বাড়ীতে একটু অশান্তি হচ্ছিল। বৌ এক নাগারে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে নি কোনোদিন। তাই রোজ রাতের খোঁচাখুঁচি নিয়ে অশান্তি স্বাভাবিক। বেকার স্বামীকে কোন্ স্ত্রী সোহাগ করতে চায় বলুন? বিয়ের পর থেকে যে সাপ্তাহিক সঙ্গমে 'অভ্যস্ত তার কাছে বেকার সোয়ামীর আদিখ্যেতা খারাপ লাগার কথাই।

নতুন চাকরীটা শাপে বর হলো। কিন্তু কে জানতো ব্যাটা ভাণ্ডারী আমায় ঠেলবে রামনগরে। আসলে বৃন্দাবন প্লেসেরও একটা লবী আছে। ওখানে নতুন কাউকে ঢোকাতে চান না ভার্মা সাহেব। তাই পোস্টিং হলো রামনগরে। বলুন তো? আমার কেমন অবস্থা। আমার পূর্বসূরী তখন জেলে। ইউনিয়ন নেতারা রাগে ফুঁসছে। একশ ষাটের তালিকায় সবই ওদের লোক। ভাণ্ডারী সাহেব কৌশল করেই পাঠালেন আমাকে। আমার কর্মজীবনের অ্যাসিড টেস্ট। এখানকার লোকগুলো সব মাথা মোটা। কিচ্ছু বোঝে না। সেদিক থেকে বেশ শান্তিতেই ছিলাম। কিন্তু কাল হয়ে এলো তারিকালী। ও ব্যাটা এসেই সব গুবলেট করে দিল। চাকরীতে কনফার্মড হওয়া এখন বিশ বাঁও জলের তলে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে মানুষকে কতো বিচিত্র অভিনয়ই না করতে হয়। প্রতিদিনের কথাবার্তায়ও অভিনয়। কোনটা যে আসল, আর কোনটা যে নকল তা বোঝা মুস্কিল। অশোক শুধু ভাবে। ব্রজবাসী দাস আজ সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের পার্সোন্যাল ম্যানেজার। কিন্তু এতদিন কোথায় ছিল তার অস্তিত্ব? ভাগ্য তাকে কোথায় বসালো। একজন জনসংযোগ অফিসার হতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষাগত যোগ্যতা, সাহিত্যে দখল আর সর্বোপরি চালচলনে ধোপ-দুরস্ত। অপরদিকে এই প্রতিষ্ঠানে একজন কুলির সর্দারও পার্সোন্যাল ম্যানেজার হতে পারে। গণটোকাটুকির গ্র্যাজুয়েট কোনোরকমে একটা লেবার ওয়েলফেয়ার ট্রেনিং নিয়ে পার্সোন্যাল বিভাগের বড় সাহেব। স্বয়ং জি এম্ যার পরামর্শে কারখানায় ক্লোজার ঘোষণা করতে পারেন। একদা যার কাজ ছিল চটকলে কুলিদের ওপর সর্দারী তথা খবরদারী করা সে হয়ে গেল সবজান্তা। পিয়ারোকেও চলতে হবে তার নির্দেশ মতো।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার কোনো মর্যাদা নেই। কুশিক্ষাই এখানে কালচার। সত্যি, বিচিত্র এই দেশ! ব্রজবাসী যতক্ষণ পান্থনিবাসে থাকে ততক্ষণ সে ভেজা বেড়াল। অফিসের কুর্শিতে বসলেই অন্যরূপ। হুংকারনাথ ওকে বাইপাস করে সব জরুরী ফাইল পাঠায় তারিকালীর কাছে। ওর টেবিল ফাঁকা। হাতে কোনো কাজ নেই। তবুও সবজান্তার ভান করতে হয়। ব্যস্ততার অভিনয় করতে হয়। ও জানে তারিক ওর সর্বনাশটি করে রেখেছে। একটি নোটশীটে দশটি বানান ভুল। সেই নোটশীট হলো তারিকের তুরুপের তাস। ভুল বানানকে লাল-বৃত্তে চিত্রিত করে রেখে দিয়েছে টেবিলের ওপর। টেবল্-গ্লাসের তলায় তা শোভা পাচ্ছে মানপত্রের মর্যাদায়। সবাই ব্রজবাসীর হস্তাক্ষর চেনে। তাই বিনা ভূমিকায় তারিকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ। ওর উদ্দেশ্য বস্কে একটি অপদার্থ অফিসার হিসেবে প্রমাণ করা। ও ব্যাটা কিচ্ছু জানে না। ওকে ইগ্নোর করো। শুধু মামেকং শরণং ব্রজ। তারিক বোঝাতে চায় সেই ডিপার্টমেণ্টের সর্বেসর্বা। রামনগরে তার আগমন জাত-পাতের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা পালন করা। এই কারখানার পাপ স্খালন করতেই অভিনন্দন সাহেব ওকে পাঠিয়েছেন। তাই হে সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের বন্ধুগণ। তোমরা আমায় পুজো করো। মনে শান্তি আনায়ন করো। কারখানায় উৎপাদনের উৎপাত নেই। সরকার যেদেশে পরিবার নিয়ন্ত্রণের স্লোগান দিচ্ছে সেক্ষেত্রে উৎপাদন কথাটি ভয়ংকর মারাত্মক। শুধু কাফেরগণ এই পাপ কথা উচ্চারণ করে থাকে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আমি যতদিন আছি ক্ষমতায় ততদিন ওভারটাইমে থাকবে না কোনো কমতি। হুংকারনাথের সঙ্গে আলোচনা হয়ে গেছে। তোমরা সব পাবে। শুধু পরামর্শ মতো পথ চলো।

সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব পিয়ারোর। অশোক রামনগরের নয়া পিয়ারো। বসে আছে রাস্তার ধারে। রাস্তা দিয়েই তো জনগণের যাতায়াত। তাই যাত্রীবাহী ট্রেকারের চিৎকার মুখরিত রাজপথের পাশে জনসংযোগের দপ্তর। রাস্তার অপর পারে হনুমানজীর মন্দির। সেখানে একটানা পাঠ হচ্ছে তুলসীদাসী রামায়ণ। অদ্ভুত সেই সুর তরঙ্গ

অশোকের কানে ভেসে আসে। মন্দ লাগে না নিঃসঙ্গ দুপুরে রামকথা শ্রবণে। সহকারী সবাই বেরিয়ে পড়েছে অফিস থেকে। তাকে থাকতেই হয়। ডিপার্টমেণ্ট পাহারা দিতে হয়। কোনো ভিজিটার ঘুরে গেলে দুর্নাম হবে প্রতিষ্ঠানের। কর্তৃপক্ষ তাকে একটি বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মাইনে দিচ্ছে। সতর্ক থাকতেই হয়।

নিঃসঙ্গ জীবনও একধরণের শাস্তি। তিলে তিলে যন্ত্রণা। কথা বলার লোক নেই। এক গ্লাস পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। সেভাবে, তার চেয়ে মেইন গেটের ঐ সিকিউরিটি গার্ডদের তবু জব্ স্যাটিসফেকশন আছে। সে শুধু পল অনুপল গুণে চলে। কবে হবে এই গঞ্জনার অবসান। শব্দ তরঙ্গে ভেসে আসে রামায়ণের সুর। রাম চলত বনবাসঃ। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল ভ্রাতা লক্ষ্মণ, পত্নী সীতা। পিতার বিশেষ আজ্ঞা বহন করতেই তাঁর বনবাস। অশোক কার আজ্ঞা পালনে এই কঠোর জীবন বেছে নিল? হঠাৎই এক একজন উটকো ভিজিটার এসে যায়। তাদের প্রয়োজন শ্যাম-সুন্দরকে। হরমানজীকেও কেউ কেউ খোঁজ করে। কিন্তু কোথায় সেইসব সহকর্মীর দল। তারা তখন নিজগৃহে দিবানিদ্রায় মগ্ন। কি উত্তর দেবে সে? কাউকে না পেয়ে অশোকের সামনের চেয়ারে বসে পড়ে তারা। চেয়ারের ওপর পদযুগলকে আরামে রেখে শুরু হয় রামনগরের ইতিহাস চর্চা। হঠাৎই অ্যামোনিয়া প্লাণ্ট থেকে ফোন আসে।

আভি ফটোগ্রাফার রামবিলাস কো ভেজিয়ে। এক এল্‌বো-পাইপ ব্ল্যাক্ হো গিয়া। তুরন্ত ফটো খিচ্‌না হ্যায়। ইন্সিওরেন্স ক্লেম হোগা। তসবির জরুর চাহিয়ে।

অশোক কোথায় খুঁজে বেড়ায় রামবিলাসকে। সকাল থেকে ওর টিকি দেখা যায় নি। তবে হাজিরা খাতায় ঢ্যাঁড়া মেরে রেখেছে। বোধহয় গতকালই এই পরিশ্রমের কাজটি সম্পন্ন করেছে। অবশেষে রামবিলাসকে পাওয়া গেল। কিন্তু তার ক্যামেরায় ফিল্ম নেই। তাহলে উপায়? দেড় লাখ টাকার ক্লেম শুধু একটি ছবির অভাবে আনক্লেইমড থাক্‌বে? সমস্যা খুবই গম্ভীর। ঠিক আছে। ডাকো ভাড়া করা লোক। যত টাকা লাগে দিতেই হবে। ডিপার্ট-

মেণ্টে একজন ফটোগ্রাফার প‌ুষে কি লাভ ? শ্যামস‌ুন্দর জানালো অন্য এক উপাখ্যান।

সাব আপ তো নয়া আয়া। আপকো মাল‌ুম নেহি হ্যায়। এ রামনগর হ্যায়। ইধারমে এইসে হোতাই হ্যায়। আপনি যদি ফিল্ম কেনার জন্য ওকে পাটলীপ‌ুত্র পাঠাতেন তবে এই সমস্যা হতো না।

ব্যাটা ব‌ুড়ো বলে কি ? ছত্রিশ টাকার এক ফিল্ম কিনতে সাড়ে তিন শ' টাকার ট্যুর। অশোক কিছ‌ুতেই ব‌ুঝতে চায় না। ওকেও তো প'চিশ হাজার তুলতে হবে। তিল তিল জমিয়ে তৈরী করতে হবে তাল। শ্যামস‌ুন্দরের বীজমন্ত্র ওর কানে বারে বারেই বাজে, ইধারমে এইসা হোতাই হ্যায়! অনিয়মই এখানকার নিয়ম। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। স্টুডিও ফ্লিক্ থেকে লোক আনতে গেছে রামবিলাস। হয়তো বা এসেও যাবে কিছ‌ুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু অ্যামোনিয়া প্ল্যাণ্টের এনজিনীয়ারের যেন সব‌ুর সয় না। সে অভিযোগ করেছে জি এমকে।

স্যর, পিয়ারো হ্যাজ ফেইল্ড টু সেণ্ড আ ফটোগ্রাফার। হোয়াট টু ডু ?

তৎক্ষণাৎ ইণ্টারকামে ডাক পড়লো অশোকের। পি এস ভেন‌ুগোপাল অপরপ্রান্ত থেকে বলছে, মিস্টার মিট্রা। প্লীজ মীট জি এম। আভি, তুরন্ত।

জেনারেল ম্যানেজার হ‌ুংকারনাথ ঠাকুর। বসে আছেন তাঁর বাতান‌ুকূল কামরায়। সামনের প্যারাবোলা টেবিলের দ‌ু-প্রান্তে উপবিষ্ট দ‌ুই বিভাগীয় প্রধান। ব্রজবাসী দাস আর পঞ্চানন নন্দী। অশোকের উপস্থিতিতে ওরা উভয়েই প্রস্থান করলো। এবার হ‌ুংকারনাথের পালা। অশোকের সামনে সাড়ে তিন হাজার টাকার একটি বিল রেখে তিনি রীতিমতো উগ্র মেজাজে বল্লেন।

মিস্টার মিট্রা, এসব হচ্ছেটা কি ? ডিপার্টমেণ্টে ডার্করুম, ফটো ডেভলপার, প্রিণ্টিং অ্যারেঞ্জমেণ্ট থাকা সত্বেও সাড়ে তিন হাজারের বিল। বাইরের লোক দিয়ে কেন ছবি তুলেছ ? হোয়াট ওয়াজ রঙ ইউথ আওয়ার ফটোগ্রাফার ?

স্যার, কাজটা আমি বাইরের লোক দিয়ে করাতে বাধ্য হয়েছি। ইউ মে প্লীজ আস্ক আওয়ার এম পি এ। ওর মত নিয়েই আমি ফটোগ্রাফার আনিয়েছি। তাছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। রামবিলাস হঠাৎ ডুব মেরেছিল। স্বাধীনতা দিবসের মতো একটা বড়ো অনুষ্ঠান। ছবি তুলতেই হবে। আমি ওর পাটলীপুত্র ট্যুর বন্ধ করেছিলাম। এটা তারই বদলা। আপনি স্যার জোয়ানদের কাছ থেকে গার্ড অফ অনার নেবেন। সে দৃশ্য কখনো মিস করা যায়? সেখানে থাকবেন মিসেস জি এম। তিনি সবার সঙ্গে হাসি বিনিময় করবেন। রোগীদের হাতে তুলে দেবেন ফলের ঝুড়ি। হাসপাতালের ওয়ার্ডে বছরে একটি দিনই জ্বলে উঠবে ফ্লাশগান। এইসব মূল্যবান মুহূর্তগুলো ধরে রাখাই তো জনসংযোগের কাজ। স্যার, অনেক কষ্টে যোগাড় করেছিলাম এই ফটোগ্রাফারকে। আপনি জিজ্ঞাস করতে পারেন ব্রজবাসী দাসকে।

হায় অশোক মিত্র! হায় ব্রজবাসী দাস! সে তখন কর্তৃপক্ষের লোক। সে কেন সায় দেবে একজন খুঁদে পিয়ারোর কথায়। তাছাড়া শুধু কথায় তো সরকারী কাজ হয় না। অ্যাপ্রুভাল কই? কথা লোকে ভুলে যায়। বাট পেপার রিমেইনস। এ হলো সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান। এখানে কাগজই সব থেকে বড়ো বাঘ। তাকে সবাই ভয় করে। অশোকের হাতে ব্রজবাসীর সইকরা কোনো নোটশীট নেই। সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। খোদ জি এম্ যেখানে প্রশ্ন তুলেছেন সেখানে পরিস্থিতি বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। গুণে অষ্টরম্ভা হলেও তার পরিচয় ম্যানেজার পার্সোন্যাল। অশোক দ্বিতীয়বার চেষ্টা করলো এই বিল রহস্য উদ্ঘাটনের।

স্যার, বিলটা হয়তো এরকম হতো না। কিন্তু আমার করার কিছুই নেই! এ ব্যাপারে স্বয়ং শ্যামসুন্দর জড়িত। ফটোগ্রাফারের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে ওর। পুরো পেমেণ্টের সিকিভাগ দিতে হবে ওকে। লোকটা ওর গ্রামের। যাদবজীর হিস্যা মেটানোর জন্য একটা ফ্যাট-বিল পুট আপ করেছে। বিলটা তৈরী করিয়েছে হিন্দীতে। আমি এর কিছুই বুঝি না। আমায় বললো, আপকো ক্যায়া? পয়সা আপকা ঘরসে জায়েগা? একঠো সই মার দিজিয়ে। আমি নতুন লোক। স্থানীয় লোককে সমীহ করে চলতেই

হয়। আমাকে ভয় দেখিয়েছে। যদি সাতদিনের মধ্যে পেমেণ্ট না পায় তবে গায়ের চামড়া খুলে নেবে।

হুংকারনাথ সবই অবগত আছেন। তবুও শুনতে চান পুরো ঘটনা।

আত্মপক্ষ সমর্থনে অশোক আবারো বলতে চেষ্টা করে।

স্যর, সবথেকে নগ্ন কথাটা না বলাই ভাল। তাতে অনেক বিপত্তি। এখানে সর্বত্র বখরার ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে ওরা ক্যালকাটা কর্পোরেশনকেও ছাড়িয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলা যাবে না। সেই পুরানো বাণী, ইধারমে এইসা হোতাই হ্যায়। তবে জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছে। কৌশলে আমার সই নিয়ে রেখেছে শ্যামসুন্দর যাদব। ও জানে পিয়ারোর এই হস্তাক্ষরটি হবে ওর রক্ষাকবচ। ওকে কেউ ছুঁতে পারবে না। অথচ কমিশনের বখরা পেঁছে যাবে গ্রামের বাড়ীতে।

অশোক বুঝতে পারে জি এম তাকে শাসন করতে চায়। যাদবজীকে হাতে রাখতেই হবে। ও স্থানীয় নেতা। ব্রজবাসী এ ব্যাপারে ইন্ধন যোগায়। সে নতুন জি এমকে তুষ্ট রেখে প্রবেশন পিরিয়ডটা শেষ করতে চায়। হুংকারনাথেরও চাই একজন কাছের মানুষ। নতুন কার্যভার নিয়েছেন। ভরসা করার মতো লোক চাইই একজন। কারখানার কোথায় কি হচ্ছে সেইসব খবর গোপনে পেঁছে দেবার জন্য একজন গুপ্তচর। পি এমরা সর্বদাই ভদ্রবেশী বিশ্বাস ঘাতক। ছদ্মবেশী ষড়যন্ত্রকারী। তিনি অল্প সময়েই বুঝে গেছেন ব্রজবাসীর কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। ওকে দিয়ে একাজ হবে। ওকেও তো চাকরীতে কনফার্মড হতে হবে। পুরো ব্যাপারটাই রেসিপ্রোকাল্।

*　　　*　　　*

অশোকের মনে পড়ে সেইসব দিনের কথা। দেশে ফেরার জন্য কি দারুন উত্তেজনা। নিজের দেশে সেবা করাও ধর্ম। অর্থ কখনো জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। লণ্ডন থেকে রওনা দেবার দুদিন আগে ওর এক বন্ধু মিস্টার দত্ত বলেছিল।

যাচ্ছ যাও। তবে দেখবে ওখানেও খেয়োখেয়ি। প্রতিটি মানুষ

হিংসায় জর্জরিত। ঈর্ষায় কাতর। অ্যাডজাস্ট করতে পারলেই মঙ্গল।

বিধান নগরে কাজে যোগদান করার পর দয়াল সাহেবও একই কথা সমস্বরে উচ্চারণ করেছিলেন। ছিলেন ভাল। কেন মরতে এলেন এই পোড়ার দেশে? সর্বত্র কুকুর বেড়ালের ঝগড়া। এসেছেন যখন, লড়ে যান। দেখুন আপনার জীবনীশক্তি কতোটা প্রখর।

সেই থেকে সে শুধুই লড়াই করে গেছে জীবনযুদ্ধে। কিন্তু আর বোধহয় সম্ভব নয়। তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। সময় সীমাবদ্ধ। অভিনন্দ সাহেব তাঁকে কৌশল করে রামনগর পাঠিয়েছেন। বদলী তো নয়, এ যে বনবাস! যে অশোক লণ্ডন, কোলকাতার ব্যস্ত জীবনে অভ্যস্ত তাকে পাঠানো হয়েছে বনে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমিতে সভ্যতার আলোক পেঁছিতে হয়তো লেগে যাবে আরো কয়েকটি দশক। সতীদাহ নেই। তবে জাতপাতের তীব্র লড়াই গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অচ্ছুৎ লোকের ছায়াস্পর্শে এখনো এখানে স্নান করতে হয়। ব্রাহ্মণ, বানিয়া, কায়স্থ, ভূমিহার, উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে সমাজ কি আজ এগোতে পারবে?

অশোকের কঠিন পরীক্ষা। অভিনন্দন সাহেব কি ইচ্ছা করে ওকে বদলী করেছেন? না, কোনো লোকের প্ররোচনায় এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। হয়তো নতুন সি এম ডি আসার আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ছিল। ও বুঝতে পারে না ওর বনবাসের মূলে কোন্ শক্তি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। লালতু চক্রবর্তী? না, সে অতি সাধারণ স্তরের ম্যানেজার। তবে কি বিকিরিণ ভট্টাচার্য? কিন্তু তিনি তো অত্যন্ত ভদ্র এবং কোনো এক সময়ে অশোককে উপকার করেছেন। তাঁর তৎপরতা ব্যতিরেকে ও কোনোদিনই কোলকাতায় আসতে পারতো না। তাঁর প্রতি বরং কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে ওঠে। তবে কি প্রবীর বোস? দ্য গ্রেট জাগলার অফ পাবলিক রিলেশনস্। নিজের স্বার্থের খাতিরে, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সে জীবনের যে কোনো স্তরে অবতরণ করতে প্রস্তুত।

লিচুবাগানে লালতুর চায়ের দোকান বেশ ভালই চলে। কোলকাতা থেকে ট্রান্সপোর্টাররা পেটি পেটি চা পেঁছে দেয় দোকানের

দরজায়। সেজন্য কোন ভাড়া লাগে না। অশোক এসব ঘটনা জানতো। কিন্তু কাউকে বলে নি। তবে কি লালতু নিজেই ভয় পেয়েছিল। চক্রান্ত করেছিল প্রবীরের সঙ্গে। দশচক্রে ভগবান ভূত। সবার চক্রান্তে স্বয়ং দেবতাও অসহায়। অশোক কেন যে সহকর্মীদের আক্রোশের শিকার হলো সে প্রশ্ন বারে বারেই জিজ্ঞাসা করে নিজেকে। কোন্ অপরাধে তার এই বনবাস? শান্ত জীবনের স্বাদ কি সে কোনোদিনই পাবে না? ঈশ্বর জানেন।

পান্থনিবাসের দিনগুলো বড়ই একঘেয়ে! সকালে বেড-টী। তারপর সারাদিনের মতো তৈরী হয়ে সংক্ষিপ্ত প্রাতরাশ। ডিউটি বাসে কারখানায় অভিযান। রাস্তার ধারে সেই গুমটি ঘর, 'হিন্দী মে বলিয়ে'র স্লোগান। শ্যামসুন্দর পলিটিকস্। এই নির্জন দুপুর। শুধুই প্রহর গোনা। সঙ্গী নেই, সহকর্মী নেই, আশা নেই, নেই কোনো প্রত্যাশা। শুধু হতাশার মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া। দুপুরে আহার নেই। রাতে নেই নিদ্রা। প্রতিরাতে কামপোজ একমাত্র সঙ্গী। পান্থনিবাসে অতিথি আসে। আবার চলেও যায়। পাশের ঘরেই ব্রজদা। কিন্তু ওর ঐ একই সুরের কীর্তন শুনতে অশোকের আর ভাল লাগে না। ব্রজদার পাশেই তারিকালী। সেই চর্বিত চর্বন। ওর ওই আত্মম্ভরি লেকচার আর ব্রজবাসী বধ পালায় কোনো নতুনত্ব নেই। আর আছে দেবুদা। সে রামকৃষ্ণ ভক্ত। তাকে দেখেও শান্তি। সে জীবনের সব অভিব্যক্তিকেই ঠাকুরের লীলা হিসেবে দেখে। যত দিন বাঁচা, ততদিন শেখা। শেখার শেষ নেই। অশোক ভাবে, এরা সবাই অভিনন্দন ফর্মুলার আউটকাম। সে দিশেহারা হয়ে যায়। তবুও দিন গোনে যেমনভাবে দিন গোনে যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী। শুধু দিন গোনে। পট পরিবর্তন কি কখনো হবে না?

*　　　*　　　*

হাইব্যারী হিল্‌সের কেভিন ম্যাডক্‌স অশোকের বন্ধু। কিছুদিন আগে ওকে চিঠি লিখেছিল অশোক। পুরনো বন্ধু। একই কলেজে পড়াশুনা করেছে লণ্ডনে। ওয়েস্ট হিলস্ কলেজ অফ্ এডুকেশনের সহপাঠী। কুইন্স পার্কের একটা স্কুলে দু'জনেরই

টিচিং প্র্যাকটিস্‌ করতে হয়েছিল। ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল রাসেলস্‌ স্কোয়ারের কাছে গাওয়ার স্ট্রীটে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওয়েস্ট হিলস্‌ থেকে পাশ করে অশোক শিক্ষকতা করেছিল ইলিয়াতে। মাত্র কয়েক বছর। তারপর বৃত্তি বদল করে অনুপ্রবেশ করেছে সাংবাদিকতায়। আর কেভিন বরাবরই লেগে ছিল শিক্ষকতায়। শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে সে। সে জেনেছে, কর্মজীবনে অনাবিল আনন্দ পেতে হলে বিদ্যালয় হলো মন্দিরসম। অর্থ হয়তো পর্যাপ্ত নেই সেখানে তবে আনন্দ আছে অফুরন্ত। সে শিক্ষাবৃত্তির অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে এডুকেশন অফিসার হয়েছে। ইজ্‌লিংটন বরো কাউন্সিলে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা। অশোক ওকে চিঠি লিখেছিল। জানতে চেয়েছিল বর্তমান ব্রিটেনে শিক্ষকতার সম্ভাবনা কেমন? তিন সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর এসেছে সে চিঠির, কেভিন্‌ লিখেছে।

অশোক যদি শিক্ষকতায় ফিরে আসতে চায় তবে সে ব্যবস্থার দায়িত্ব সে নেবে। ইজ্‌লিংটন বরোতে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। আজকাল তরুণ-তরুণীরা এই বৃত্তিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। অথচ সকলের জন্য শিক্ষার দায়িত্ব বরো কাউন্সিলের। হাইগেট হিলস্‌-এ একটা ভেকেন্সি আছে। অশোক ইচ্ছা করলে সেখানে যোগদান করতে পারে। ওখানকার হেড টীচার মিস হেনশ তার বিশেষ পরিচিত। সে রাজী ওকে গ্রহণ করতে। অশোকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, লণ্ডন স্কুলে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা সবই তার জানা আছে। ও লণ্ডনে গিয়ে পেঁছলেই চাকরীতে যোগদানের নিয়ম কানুনগুলো মানা হবে। ওর চাকরী হবেই। যে দেশ ওকে শিক্ষিত করেছে সে দেশ সেই শিক্ষার মর্যাদাও দিতে জানে।

কেভিনের চিঠি পেয়ে অশোক একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। জীবনের এই পর্যায়ে আবার নতুন করে ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে? পরবর্তী মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে হায়নার লোলুপ দৃষ্টি। সেই ক্ষুধার্ত হায়না যেন ওকে গিলতে চাইছে। হুংকার নাথের দুর্ব্যবহার, ব্রজবাসীর নির্লজ্জ স্বার্থচিন্তা ওকে সততই

বিব্রত করে। অপরদিকে রয়েছে শ্যামসুন্দরের অর্থলিপ্সা আর তারিকালীর বিষাক্ত মনোভাব। সব মিলিয়ে অশোক যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পায়, ওর পরমায়ু পরিমিত। সহকর্মিরা প্রত্যেকেই এক একটি হিংস্র হায়না। ছলে, বলে অথবা কৌশলে—যে করেই হোক অশোককে এরা বধ করবেই। শারীরিক মৃত্যু না হলেও মানসিক অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ও আর ভাবতে পারে না। ভাবতে চায় না। প্রত্যেকের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ওর সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

তারিকালী শ্যামসুন্দরের সামনে মোয়া ধরে আছে। অশোকের প্রস্থান মানেই তার জুটবে হেড পিয়ারোর চেয়ার। যমুনা প্রসাদ চলে গেছে বেশ কিছুদিন। এবার অশোকের পালা। শ্যামসুন্দর দিন গুনছে কবে অশোক হবে বিদায়। বিদায় অথবা বিতাড়িত। স্থানীয় পত্রকারদের রিহার্স করা আছে। নয়া পিয়ারোকে জব্দ করতেই হবে। তারা ষড়যন্ত্র করেছে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে। পত্রকারদের সঙ্গে বিজাতীয় ভাষায় কথা বলা তারা সহ্য করবে না। মহাবীর প্রসাদ খবর এনেছে। পত্রকারেরা সর্বতো-ভাবে তৈরী। স্থানীয় এম·পিকে ওরা লিখিত অভিযোগ জানাবে। রামনগরে বসে অংরেজি বাৎচিৎ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। বিলাইতি সাবকো দরিয়ামে ডালেগা।

রামনগরের বিষাক্ত আবহাওয়া অসহনীয়। অশোক যেন প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসরমান। কে যেন কানের কাছে এসে বলে যাচ্ছে, তুই মর। তুই মর। এ দারুণ যন্ত্রণা। মনের ওপর এত চাপ আর সহ্য হয় না। অবশেষে মানসিক মৃত্যু অপেক্ষা স্বেচ্ছা মৃত্যুকেই বরণ করবে কিনা এ চিন্তা ওকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছে। মানুষ যেমন আত্মহত্যার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে অশোকও তেমনি এই চক্রান্তের কর্মভূমি থেকে বিদায় নেবে স্থির করে ফেলেছে। এই দুর্যোগের দুনিয়ায়, দুর্মূল্যের বাজারে, লক্ষ লক্ষ বেকারের দেশে আরেকজন বেকার হয়ে যাবে। যে প্রতিষ্ঠানে ও বারোটি বছর কাজ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ওর ইস্তফাপত্র গ্রহণে বারো মিনিটও সময় নেয় নি। ওরা অপেক্ষা করছিল এই মুহূর্তটির। অশোকের বিদায়ে ওদের আশা পূর্ণ হলো। ওর

রেসিগ্‌নেশন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। রিলিজ অর্ডার যেন সই করাই ছিল। শুধু নামটা টাইপ করতে বাকী ছিল। ও আর কারো সমস্যা নয়। কোনো সংঘাতে নেই। বিদায় রামনগর।

*　　　　*　　　　*

আজ শনিবার। ৩০২২ ডাউন মিথিলা এক্সপ্রেস এলেই অশোকের যাত্রা শুরু। কেভিনকে সে জানিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবারই সে রওনা দেবে। এস ইউ ফাইভ থ্রি এইট এয়ারোফ্লোট ফ্লাইটের টিকিট তার কনফার্মড। কম দামের টিকিট। পথে একবার স্টপ ওভার আছে মস্কোভাতে। তবুও বেলা বারোটার মধ্যেই হীথরো পেঁছে যাবে। আর সময়ের অপচয় নয়। শিল্প জগত থেকে শিক্ষা জগতে আবার সে জীবন শুরু করতে চায়। শত শত শিশুর কল কোলাহলে নিজের বেদনাকে বিলীন করে দিতে হবে তাকে। সেইসব শিশুর প্রাণ চাঞ্চল্যের সান্নিধ্যে থেকে তাকে বাঁচতে হবে। একজন মানুষের জীবনে বারোটি বছর দীর্ঘ সময়। তবুও বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে নিজবাসে। প্রবাসে।

এইমাত্র মাইক্রোফোনে ঘোষণা হলো। মিথিলা এক্‌সপ্রেস মজঃফরপুর স্টেশন থেকে সন্ধ্যা সাতটায় ছেড়েছে। যাত্রীগণ কৃপয়া করকে ধেয়ান দে : আর তিন ঘন্টার মধ্যেই বারাউনীতে ট্রেন এসে যাবে আশা করা যাচ্ছে। যাত্রীগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করেন। নমস্কার !

—X—